চোরাপথে চিড়িয়াখানায়

রূপক সাহা

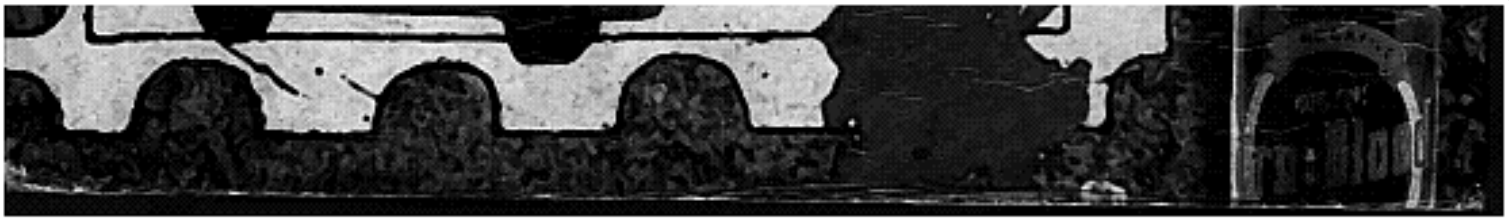

১

অফিসে পৌঁছতেই নন্দিনী বলল, 'কী রে অর্ক, তোর এত দেরি হল ? বস তোকে অনেকক্ষণ ধরে খুঁজছে কিন্তু ।'

বস মানে দিব্যদা। কাগজের নিউজ এডিটর। অর্ক বলল, 'করবটা কী বল । রাসবিহারীর কাছে বড় একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। মারাত্মক ট্র্যাফিক জ্যাম। অনেক ঘুরে আসতে হল।'

'তখনই আমার সন্দেহ হয়েছিল। একটা কিছু হয়েছে। তুই তো দেরি করার ছেলে না। যাক গে, তোর দু'টো ফোন এসেছিল। নম্বর লিখে রেখেছি। এই নে, রিং ব্যাক করিস।'

কথাগুলো বলেই একটা চিরকুট এগিয়ে দিল নন্দিনী। তার পর শান্তিনিকেতনি ঝোলা কাঁধে ঝুলিয়ে উঠে দাঁড়াল। কথায় কথায় 'তখনই আমার সন্দেহ হয়েছিল' বলাটা নন্দিনীর বদভ্যাস। বেশির ভাগ সময়ই ওর সন্দেহটা মেলে না। এ নিয়ে ঠাট্টা করলে চটে যায়। ওর বাবা রুলিং পার্টির বড় নেতা এবং মিনিস্টার।

অফিসে তাই কেউ নন্দিনীকে ঘাঁটায় না। একটু দিদিমাগিরি করার অভ্যেস আছে বলে অর্ক নন্দিনীর নাম দিয়েছে ন্যানি। অফিসে একমাত্র ওর সঙ্গেই অর্কর সম্পর্কটা খুব ভালো। দু'জনে একই দিনে চাকরি পেয়েছিল। চিরকুটটা হাতে নিয়ে অর্ক জিজ্ঞেস করল, 'বস ডাকছে কেন রে?'

'কী করে বলব ? গেলেই টের পাবি। বোধহয় কোথাও তোকে পাঠাবে।' বলেই দরজার দিকে এক পা এগোল নন্দিনী। তারপর কী মনে হওয়ায় ঘাড় ঘুরিয়ে বলল, 'আজ রাতের ব্যাপারটা মনে আছে তো? দেখিস, আমাকে কিন্তু ডোবাস না।'

রাতের ব্যাপারটা কী, অর্ক ঠিক বুঝতে পারল না। জানতে

চাইলে নন্দিনী চটে যাবে। নিশ্চয় ইম্পর্ট্যান্ট কিছু আছে। পরে কায়দা করে জেনে নেওয়া যাবে। কিন্তু ও 'গেলেই টের পাবি' কথাটা বলল কেন?

দিব্যদা কি কোনও কারণে রেগে আছে? উত্তরের আশায় নন্দিনী দাঁড়িয়ে রয়েছে দেখে অর্ক ঘাড় নাড়ল।

হ্যাঁ, রাতের কথা ওর মনে আছে। তারপরই বোকার মতো জিজ্ঞেস করে বসল, 'ন্যানি, তুই যাচ্ছিস কোথায় রে?'

শুনে নন্দিনী কড়া চোখে তাকাল। প্রশ্নটা ও পছন্দ করেনি। নিজেকে শুধরে নিয়ে অর্ক তাই বলল, 'মানে ... তুই ফিরছিস কখন রে?'

'সন্ধ্যা তিনেকের মধ্যে।'

উত্তরটা দিয়েই নন্দিনী আর দাঁড়াল না। করিডোর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। পাঁচ ফুট আট ইঞ্চি লম্বা একটা শরীর। হিলহিলে, একেবারে মডেলদের মতো। ন্যানি দেখতেও খুব সুন্দর। বয়স তিরিশের কাছাকাছি। কিন্তু বোঝা যায় না। অর্ক ছাড়া অফিসের খুব কম লোকই জানে, ন্যানি প্রেম করে বিয়ে করেছিল। কিন্তু এখন আর স্বামীর সঙ্গে থাকে না। থাকে বাবার কাছে, চাকুরিয়ায়। ভালো রিপোর্টার। ওর বিট রাইটার্স বিল্ডিংস। মন্ত্রীরা, আমলারা সবাই ওকে চেনে। ও অফিসে আসে বেলা ঠিক দশটায়। কিন্তু দেড়টা দুটোর আগে কোনও অ্যাসাইনমেন্টে যায় না। এখন বেলা এগারোটা। আজ যাচ্ছে কোথায়?

কাগজের অফিসে কে কোথায় কোন খবর করতে যাচ্ছে, কেউ তা জানতে চায় না। রিপোর্টারদের মধ্যে এমনই আকচা আকচি। কেউ কাউকে সত্যি কথাটা বলেও না।

'কোথায় যাচ্ছিস' এই প্রশ্নটা নন্দিনীও পছন্দ করে না। চুলোয় যাক নন্দিনী, নিজের সিটে বসে অর্ক দ্রুত চিন্তা করতে লাগল, দিব্যদার ঘরে ওর ডাক পড়ল কেন? কোন রিপোর্টার কোন খবর কভার করতে যাবে, সেটা সকালের দিকে এডিটোরিয়াল মিটিংয়েই ঠিক করে দেয় দিব্যদা। সেই মিটিংয়ে সব রিপোর্টারকে হাজির থাকতে হয়। জ্যামে আটকে পড়ায় অর্ক মিটিংয়ে পৌঁছতে পারেনি। কোনও রিপোর্টারকে গরহাজির দেখলে দিব্যদা মারাত্মক চটে যায়। তার জের কাটতে অন্তত দু'তিনটে দিন লাগে। নিউজ এডিটরের হাতে প্রচুর ক্ষমতা। অর্ক জানে, ইচ্ছে করলে দিব্যদা ওর কেরিয়ারের বারোটা বাজিয়ে দিতে পারে।

সিটে বসেই অর্ক কম্পিউটারের সুইচ অন করল। মেল চেক করার জন্য। আজকাল খবরের কাগজের অফিস কর্পোরেট স্টাইলে চলে। পাশের ঘর থেকে কেউ কিছু জানাতে চাইলেও, মেল মারফত জানায়। নানা জায়গা থেকে ইনভিটেশন আসে। কম্পিউটারের পর্দায় দ্রুত চোখ বোলাতে লাগল অর্ক। আরে, নন্দিনীও তো একটা মেল পাঠিয়েছে। 'তেইশে ডিসেম্বর আমার বাড়িতে ডিনার। আসবি কিন্তু।' মেলটা ও পাঠিয়েছে গতকাল। নিশ্চয়ই ডিপার্টমেন্টের আর কাউকে ডাকেনি। তাই মেল করেছে। এই রে, আজই তো তেইশ তারিখ। হ্যাঁ, আজই ওর জন্মদিন। ছি, ছি, একদম মনে ছিল না। একটু আগে ওর সঙ্গে দেখা হল। মনে করিয়েও দিল, ডিনারের কথা। কিন্তু উইশ করা হল না। কী মনে করল, কে জানে? রাতে ন্যানির বাড়িতে যেতেই হবে। না গেলে ভীষণ চটে যাবে। অর্ক ঠিক করল, অফিস থেকে বেরিয়ে, নিউ মার্কেটে গিয়ে, ন্যানির জন্য অবশ্যই একটা গিফট কিনবে।

রিপোর্টার্স রুমের ফোনটা বাজছে। এই মুহূর্তে ঘরে কেউ নেই। যে যার বিট কভার করতে বেরিয়ে গেছে। উঠে গিয়ে অর্ক রিসিভারটি তুলে বলল, 'কাকে চাই?'

'অর্ক সান্যাল আছেন?'

মহিলার গলা, অর্ক চিনতে পারল না। ও বলল, 'কথা বলছি।'
'আমি সাঁঝেলি। চিনতে পারছেন?'

সঙ্গে সঙ্গে চিনতে পারল অর্ক। মাই গুডনেস, সেই মেয়েটা। মিস ঝামেলি? দিন দুয়েক আগে যে ভীষণ ভয় পাইয়ে দিয়েছিল? অর্ক সেদিনই মনে মনে মেয়েটার নাম দিয়েছিল ঝামেলি। সেটা তো আর মুখের ওপর বলা যায় না। তাই বলল, 'চিনব না কেন? বলুন, আবার কি প্রবলেম?'

ও প্রান্তে মেয়েটা খিলখিল করে হাসল। তারপর বলল, 'যদি খুব ভুল শুনে না থাকি, তাহলে কথায় কথায় সেদিন বলেছিলেন, আপনি একজন রিপোর্টার। সত্যি কী না, সেটাই যাচাই করে নিলাম।'

কী মেয়ে রে বাবা! অর্ক বলল, 'যাচাই করা তো হয়ে গেল, দয়া করে ফোনটা এ বার ছাড়ুন।'

'আরে এত চটছেন কেন? আপনি তো অদ্ভুত লোক মশাই। আপনি রিপোর্টার, সেটা তো জানলাম। কিন্তু কী দরের রিপোর্টার, সেটা যাচাই করব না?'

অর্ক চটল, 'আপনি কি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছেন?'

'বিশ্বাস করুন, এখনও পর্যন্ত করিনি। কিন্তু যে কারণে ফোনটা করতে বাধ্য হলাম,সেটা যদি না শোনেন, তা হলে হয়তো ঠাট্টাই করতে হবে।'

মেয়েটার গলা শেষের দিকে একটু সিরিয়াস শোনাল। বিরক্তি চেপে অর্ক বলল, 'প্লিজ, চটপট বলে ফেলুন, কী বলার আছে। আমার অন্য কাজ আছে।'

'কাজ? কী কাজ করেন আপনারা? আসল খবরটাই তো বের করতে পারেন না।' মেয়েটা ফের প্রগলভ, 'সারাটা দিন কাটান এয়ারকন্ডিশনড ফ্লোরে। ফোন করে করে লোকের কাছ থেকে খবর

নেন আর রাজা উজির মারেন কাগজের পাতায় পাতায়। এই যে নন্দরাম মার্কেটে চার দিন আগে আগুন লেগেছে, সব থেকে ইম্পর্ট্যান্ট খবরটাই তো আপনারা কেউ পাননি। কাজ করলে তো পাবেন।'

মেয়েটা বড্ড বাড়াবাড়ি করছে। অর্ক গম্ভীর গলায় বলল, 'আপনার ইম্পর্ট্যান্ট খবরটা কি শুনি?'

'নন্দরাম মার্কেটের সাত তলায় যে গোটা দশেক বদ্রিকা পাখি আগনে পুড়ে মারা গেছে, সে খবরটা কি পেয়েছেন?' মেয়েটির গলায় ক্ষোভ, ' মাত্র তিনটে পাখিকে আজ আমরা জ্যান্ত উদ্ধার করেছি। এর থেকে বড় খবর আর কী হতে পারে ।'

'নন্দরাম মার্কেটে কি পাখিরও আড়ত ছিল না কি?' অর্কর প্রশ্নে নিশ্চিত ব্যঙ্গ, খবরটা শুনে ওর হাসিই পাচ্ছে। দিব্যদাকে বললে নির্ঘাত হাসবে।

'সার্টেনলি নট।' ব্যঙ্গটা গায়েই মাখল না মেয়েটা, বলল, 'ওই বাড়ির সাততলায় এমন একটা পরিবার ছিল, যাঁরা পাখি পুষতেন। সেই পরিবারেরই বাচ্চা একটা ছেলে কাঁদতে কাঁদতে আমাকে ফোন করেছিল কাল রাতে। আন্টি, পাখিগুলোকে নিয়ে আমরা বেরিয়ে আসতে পারিনি। ওদের বাঁচাও। আজ সকালে তাই ঘুম থেকে উঠেই বড়বাজারে চলে গেলাম। দমকলের লোকদের ম্যানেজ করে, সাততলায় উঠে দেখি, একটা ঘরের খাটের তলায়, খাঁচায় তিনটে পাখি তখনও বেঁচে আছে। আগুনের ওই তাত সহ্য করে কীভাবে ওরা বেঁচেছিল, সেটা ভেবেই আমরা অবাক হয়ে গেছি। সত্যি কী না, সেটা জিজ্ঞেস করতে পারেন দমকলের লোকদের। যাক গে, শেষ পর্যন্ত তিনটে পাখি যে বাচ্চাটার হাতে তুলে দিতে পেরেছি, তাতেই আমার আনন্দ।'

মেয়েটাকে থামানোর জন্য অর্ক বলল, 'সামান্য এই খবরটার জন্য আমাকে ফোন করেছেন? ধন্য আপনি। আপনাকে পক্ষীশ্রী খেতাব দেওয়া উচিত।'

'এ বার কিন্তু ঠাট্টাটা আপনি করছেন। তা করুন। আপনার কাছে

খবরটা সামান্য হতে পারে, কিন্তু আমরা যারা পশুপাখি ভালোবাসি, তাদের কাছে এই খবরটা অসামান্য। অর্কবাবু, আপনাকে জানিয়ে রাখি, আমাদের মতো অ্যানিম্যাল লাভারের সংখ্যা কিন্তু পৃথিবীতে দিনকে দিন বাড়ছে। সরি, কাকেই বা বলছি। আপনি তো কোনও ইন্টারেস্টই দেখালেন না। যাক গে, আমাকে অন্য কথা ভাবতে হবে। এই খবরটা যদি আপনার রাইভাল কাগজের মনোময় ব্যানার্জিকে দিই, তা হলে কিন্তু উনি লুফে নেবেন।'

মনোময়ের নাম শুনেই মাথা গরম হয়ে গেল অর্কর। কী কুক্ষণেই না মেয়েটার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। সে দিন তো ওকে পাগল বলে মনে হয়েছিল। অর্ক এখন বুঝতে পারছে, ওর ধারণা ভুল। মেয়েটা যথেষ্ট বুদ্ধিমতী এবং খবরের কাগজের লোকজন সম্পর্কে খোঁজ খবর রাখে। কথা বাড়িয়ে কোনও লাভ নেই। অর্ক বলল, ' সেই ভালো, আপনি বরং আমাদের রাইভাল কাগজেই খবরটা দিয়ে দিন। আচ্ছা সাম্বালি... না কী যেন আপনার নাম... এখন ছাড়ি। আমার হাতে অনেক কাজ আছে।'

ফোনটা ক্রেডলে রেখে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল অর্ক। আর তারপরই মুখ তুলে দেখতে পেল, দিব্যদাকে।

বিরক্তিভরা মুখ, চোখাচোখি হতেই জিজ্ঞেস করল, 'কী ব্যাপার রে অর্ক, অফিসটাকে কি বৃন্দাবন বানিয়ে ফেলবি? ফোনে এতক্ষণ ধরে তোকে ট্রাই করে যাচ্ছি, খালি এনগেজড। পি বি এক্স থেকে বলল, তুই না কি কোন এক মহিলার সঙ্গে গল্প করছিলি? তোদের মতো সিনিয়ররা যদি ফোনটা এভাবে আটকে রাখিস, তা হলে কাজ চলবে? যে কোনও সময় তো একটা ইম্পর্ট্যান্ট কলও আসতে পারে।'

না থামালে দিব্যদা বলেই যাবে। অর্ক বলল, 'আমি গল্প করিনি দিব্যদা। এক ভদ্রমহিলা ফোন করে একটা খবর দিচ্ছিলেন, সেটাই জানতে চাইছিলাম।'

দিব্যদার ভ্রূ সোজা হয়নি। জিজ্ঞেস করল, ' কী খবর দিচ্ছিল শুনি ?'

নন্দরাম মার্কেট... বদ্রিকা পাখি... পুরো খবরটা অর্ক বলতেই দিব্যদা লাফিয়ে উঠল, ' বাঃ, এ তো ভালো খবর রে। চেজ কর। দেখলি না, এই ক'দিন আগে, চিড়িয়াখানার খাঁচা থেকে বেরিয়ে আসা শিম্পাঞ্জির খবরটা লোকে কী রকম খেয়েছিল। শীতকালে এ সব খবর লোকে খুব পছন্দ করে।

মেয়েটাকে ফোনে ধর। ওই বাচ্চা ছেলেটাকে কোথায় পাওয়া যাবে, জেনে নে। আর হ্যাঁ, যে কারণে তোকে খুঁজছিলাম, আজ তুই একবার চিড়িয়াখানায় যাবি। কোন একটা নিউজ চ্যানেলে বলল, আজ নাকি এত লোক হয়েছে, চিড়িয়াখানার ইতিহাসে কখনও হয়নি। কলকাতার পেজ-এ এই খবরটাই লিড হবে। ফোটোগ্রাফার তপন দাস ভিড়ের ছবি তুলে এনে অলরেডি আমার টেবলে দিয়ে গেছে। তোর কপি বিকেল চারটে- সাড়ে চারটের মধ্যে পেলেই হবে। আর কিছু জানার আছে?'

অর্ক বলতে চাইল, 'না দিব্যদা। আর কিছু জানার নেই।' তার বদলে বলে ফেলল, 'না দিব্যদা, আমার কিছু বলার নেই।' খবরটা যে দিব্যদা করতে বলবে, ও আশাই করেনি। একে তো মেয়েটার ফোন নাম্বার ও রাখেনি। তার

pathagar.net

ওপর ওর নামও ভালো করে জিজ্ঞেস করেনি। সবথেকে বড় কথা, খবরটা একটু আগে ও তাচ্ছিল্য করে, উড়িয়ে দিয়েছিল। এখন ফের সেই খবর নিতে গেলে মিস ঝামেলি পাল্টা এক হাত নিতে পারে। মেয়েটার সঙ্গে পরিচয়টা তো খুব সামান্য সময়ের। ইস্টার্ন বাইপাসে সেদিন ওর গাড়িতে লিফট নিয়েছিল। কোলে একটা জ্যান্ত শকুন! পিছনের সিটে বসা মেয়েটার সঙ্গেও মাত্র দু'চারটে কথা বলেছিল। শেষে সাত তাড়াতাড়ি ওকে নামিয়ে দিয়েছিল গোবিন্দপুরের মোড়ে। মেয়েটাকে দেখে সেদিন মনে হয়েছিল, সাত চড়ে রা কাড়ে না। আজ তো কথাবার্তায় মারাত্মক অ্যাগ্রেসিভ। দিব্যদা আচ্ছা ফাঁসিয়ে দিল বটে! বদ্রিকা পাখির খবরটা ও করবে কী করে, বসে বসে সেটাই ভাবতে লাগল অর্ক।

হঠাৎ ওর চোখে পড়ল, নন্দিনী যে চিরকুটটা দিয়ে গেছে, তাতে দু'টো নাম আর নাম্বার লেখা আছে। তার মধ্যে একটা সাঁঝেলি মিত্রর। ওহ, মেয়েটা তা হলে আগেও একবার ফোন করেছিল। অর্ক হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

২

লেক গার্ডেন্সের মোড় থেকে বাসে উঠেই সাঁঝেলি টের পেল, অনভ্যাসের ফোঁটা চড়চড় করে। প্রায় বছর দশেক ও প্রাইভেট বাসে চড়েনি। আসলে চড়ার দরকার হয়নি। বাড়িতে দু'দুটো গাড়ি। ওর বাবা সুব্রত মিত্র নামকরা ইউরোলজিস্ট। একটা গাড়ি নিয়ে বাবা চেম্বারে গেছে। বেলা দশটার সময় মা হঠাৎ মাসিমণির বাড়ি গেল অন্য গাড়িটা নিয়ে। সেই সল্টলেকে। যাওয়ার আগে মা জিজ্ঞেস করেছিল, 'লিলি, তুই কি আজ আর কোথাও বেরোবি?' সাঁঝেলি তখন বলে, না কোথাও যাবে না।

আসলে সক্কালবেলায় বড়বাজার থেকে বদ্রিকা পাখিগুলো উদ্ধার করে ফেরার পর ওর আর বেরোতে ইচ্ছে করেনি। চিড়িয়াখানা থেকে শিউচরণ ফোনটা না করলে ও শুয়ে বসে, টুকি আর টাকির সঙ্গে দিনটা কাটিয়ে দিত। টুকি আর টাকি হল ওর পোষা দুই লাব্রাডর

মা যদি শোনে, ও প্রাইভেট বাসে চিড়ে চ্যাপ্টা হয়ে চিড়িয়াখানায় গেছে, তা হলে রেগে যাবে। শুনলে বাবাও হয়তো বলবে, 'লিলি, তুই বোধহয় মাঝে মধ্যে ভুলে যাস, কোন বাড়ির মেয়ে।' কিন্তু কী

করতে পারে ও? ওর যে মাঝে মাঝে আর সবার মতো হতে ভালো লাগে। গাড়ি করে বেরোলে কি সেই সুযোগটা পাওয়া যায়? বাড়ির লোকজনের মধ্যে ওর পছন্দ-অপছন্দ, চিন্তা ভাবনা সব কিছুই আলাদা। এমনকী, নামটাও। ওর সাঁঝেলি নামটা দিয়েছিল মেসোমণি। এই ভেবে যে, একবার শুনলে সবাই মনে রাখবে। মেসোমণির কোনও সন্তান নেই। সাঁঝেলিকেই ওরা সন্তান বলে মনে করেন। বাড়িতে আদর করে সবাই ওকে ডাকে, লিলি। বন্ধুবান্ধব আর পরিচিতরাও। কিন্তু ঘটনা হল, অর্ধেক লোকই ওর ভালো নামটা মনে রাখতে পারে না। অদ্ভুত উচ্চারণ করে। এই তো আজই যেমন রিপোর্টার অর্ক সান্যাল ওর নামটা ঠিক মতো বলতে পারল না। কী যেন বলল? সাঙ্খালি। তখন ভীষণ রাগ হয়েছিল সাঁঝেলির।

যারা পশুপাখি ভালোবাসে না, তাদের পছন্দ করে না সাঁঝেলি। গত কয়েকটা বছরে ও একটা কথা [illegible] বুঝে গেছে। মানুষ দু'ধরনের। এক, পশুপাখি, কীট পতঙ্গকে ভয় পায়। দুই, ওদের ভালোবাসে।

[illegible] ভালোবাসার লোক অবশ্য কম। ইদানীং কয়েকটা টিভি চ্যানেলের দৌলতে সেই সংখ্যাটা [illegible] বাড়ছে। অ্যানিম্যাল প্ল্যানেট, ডিসকভারি, ন্যাশন্যাল জিওগ্রাফিক— এইসব চ্যানেল লোকে খুব [illegible]। বাড়িতে সাঁঝেলি কখনও টিভি-তে সিরিয়ালের প্যানপ্যানানি দেখে না। যখন দেখে, তখন শুধু অ্যানিম্যাল প্ল্যানেট আর ডিসকভারি চ্যানেল খুলে বসে থাকে। জীববিজ্ঞান নিয়ে ও নিজে প্রচুর পড়াশুনো করেছে। তবুও টিভি তে কিছু প্রোগ্রাম দেখে মাঝে মাঝে অবাক হয়ে

যায়। জগতে যে এত ধরনের প্রাণীর অস্তিত্ব আছে, বিশেষ করে, সমুদ্রের নীচে, তা ও নিজেও জানত না।

সাঁঝেলির আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে, ওর মতোই আরেকজন অ্যানিম্যাল লাভার আছে। সে হল ওর আপন পিসতুতো ভাই সাগ্নিক। শ্যামবাজারে থাকে। মাত্র দশ বছর বয়স। কিন্তু এই বয়সেই পশুপাখিদের ও খুব ভালোবাসে। আসলে ওকে দেখেই সাগ্নিক ভালোবাসতে শিখেছে। অ্যানিম্যাল প্ল্যানেটে ভালো কোনও প্রোগ্রাম দেখলেই বাড়ি থেকে সাগ্নিক ফোন করে জানিয়ে দেয়, 'দিদিভাই, এখুনি এ পি খোল।' পশুপাখি নিয়ে মাঝে মাঝেই অদ্ভুত সব প্রশ্ন করে ও। এবং তার উত্তর দিতে গিয়ে একেক সময় বেশ মুশকিলে পড়তে হয় সাঁঝেলিকে। এই যেমন, কিছুদিন আগে হঠাৎ সাগ্নিকের মাথায় ঢুকেছিল, মারা গেলে আরশোলা সব সময় চিত হয়ে পড়ে থাকে কেন? সত্যি বলতে কী, উত্তরটা সাঁঝেলি জানত না। পরে প্রোফেসর অরিন্দম বাসুকে জিজ্ঞেস করে ও জানতে পারে, মারা যাওয়ার পর আরশোলাদের

পাগুলো শক্ত হয়ে যায়। ওদের শরীরের ওপরের অংশটা মসৃণ ও সরু। তাই ব্যালান্স রাখতে পারে না, মরার পর উল্টে যায়।

গত দু'তিন দিন হল সাগ্নিক ওদের লেক গার্ডেন্সের বাড়িতে বেড়াতে এসেছে। দু'জনে বসে মজা করে টিভি দেখছে। জীবজগৎ নিয়ে সাগ্নিক কোনও প্রশ্ন করলে সাঁঝেলি অবশ্য বিরক্ত হয় না। উল্টে, আরও উৎসাহ দেয়। নন্দরাম মার্কেট থেকে বদ্রিকা পাখিগুলো উদ্ধার করে এনে, আজ সকালেই ও সাগ্নিককে দেখিয়েছিল। তখন কথায় কথায় সাগ্নিক হঠাৎ প্রশ্ন করে বসে, 'অত গরমের মধ্যে ছিল, পাখিগুলো ঘামেনি? আচ্ছা দিদিভাই, পাখিরা কি ঘামে?' সাঁঝেলি তখন উত্তর দিতে পারেনি। বাসে একটা সিট

পেয়ে, বসার পর হঠাৎই ওর ওই প্রশ্নটা মনে পড়ল। ও তখনই ঠিক করে নিল, চিড়িয়াখানায় তো যাচ্ছেই। ওখানে পিয়ালি ম্যাডামের কাছ থেকে উত্তরটা আজই জেনে দেবে। পিয়ালি ম্যাডাম চিড়িয়াখানার ডেপুটি ডিরেক্টর।

'ম্যাডাম, আপনি বাসে?'

প্রশ্নটা শুনে সামনের দিকে তাকিয়ে সাঁঝেলি ছেলেটাকে চিনতে পারল। আগে প্রায়ই বাড়িতে আসত,তবে বাবা, না দাদার কাছে, ও মনে করতে পারল না। ছেলেটার দিকে তাকিয়ে ও স্মিত হাসি হাসল।

pathagar.net

'ম্যাডাম, প্রোজ্জ্বলবাবু আজই ইতালি থেকে ফিরলেন।'

প্রোজ্জ্বলবাবু মানে দাদা। তার মানে দাদার সঙ্গেই এই ছেলেটার সম্পর্ক। দাদা অবশ্য এখন ওদের সঙ্গে লেকগার্ডেন্সে থাকে না। বিরাট বাড়ি কিনেছে বালিগঞ্জ প্লেসে। তবে প্রায়ই লেক গার্ডেন্সে আসে। সবার সঙ্গে বসে ডিনার করে যায়। আগে দাদা বিদেশে গেলে সাঁঝেলি টের পেত। ওর জন্য নানা রকম গিফট আনত। এখন দাদা এত কাজে ব্যস্ত, নাকি কেনাকাটার সময়ই পায় না। সাঁঝেলি অবশ্য নিজেও দাদাকে বারণ করে দিয়েছে। কলকাতায় এখন প্রচুর শপিং মল। সেখানে হাল ফ্যাশনের বিদেশি জিনিস পাওয়া যায়। বাইরে থেকে আনার দরকার কী? আগের প্রশ্নটার উত্তর দেয়নি। এ বার না দিলে অভদ্রতা করা হবে। সাঁঝেলি তাই বলল, 'দাদা কি লেক গার্ডেন্সে এসেছে?'

'না ম্যাডাম। সল্টলেকে আপনাদের কে এক রিলেটিভ থাকেন। উনি তাঁর বাড়িতেই গেলেন।'

শুনে একটু অবাকই হল সাঁঝেলি। মা মাসিমণির বাড়িতে গেছে, দাদাও সেখানে হাজির। ব্যাপারটা কী? এই চিন্তাটা অবশ্য ও বেশিক্ষণ মাথায় রাখল না। বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখল, বাস মুদিয়ালির মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। চিড়িয়াখানায় পৌঁছতে আর কতক্ষণ লাগাবে, কে জানে? বাসে করে কোথাও যাওয়ার সমস্যা হল, বড্ড বেশি সময়

লাগে। ইচ্ছেমতো বাস যেখানে সেখানে দাঁড়ায়, লোক তুলতে তুলতে যায়। এই প্রথম সাঁঝেলির মনে হল, বেলা দু'টোর পর বাড়ি থেকে বেরোলেই ভালো করত। ততক্ষণে মা হয়তো ফিরে আসত। গাড়িটা পাওয়া যেত। অবশ্য গাড়ি নিয়ে চিড়িয়াখানায় যাওয়ার একটা সমস্যাও আছে। সেটা পার্কিংয়ের।

'ম্যাডাম, কাগজে আপনার সম্পর্কে রিপোর্টটা পড়ে খুব ভালো লাগল।'

মুখ ফিরিয়ে সাঁঝেলি বলল, 'কোন রিপোর্টটা?'

ছেলেটা বলল,' ওই যে গোবিন্দপুরে আপনারা যে একটা অ্যানিম্যাল হসপিটাল করেছেন, সেই রিপোর্টটা। অ্যাদ্দিন জানতাম, কলকাতায় মাত্র একটাই ভেটেরেনারি হসপিটাল আছে— বেলগাছিয়ায়। কাগজে না বেরলে জানতেই পারতাম না, সাউথের দিকেও ওইরকম একটা হসপিটাল হয়েছে। যেখানে নামে পয়সায় কুকুর-বেড়ালের চিকিৎসা করা যায়। ইস্, এই খবরটা যদি আগে জানতাম, তা হলে আমার পেট ডগ মারা যেত না। আর আপনি যে এত অ্যানিম্যাল লাভার, সেটাও জানতে পারতাম না।'

ছেলেটা সম্পর্কে এ বার আগ্রহ জাগল সাঁঝেলির। ও বলল, 'কুকুরটা মারা গেল কেন?'

' পেটে টিউমার। অনেক দেরিতে ধরা পড়ল। বেলগাছিয়ায় নিয়ে গেলাম। ভেট সার্জেন বললেন, অপারেশন করিয়ে আর কষ্ট দেবেন না। ম্যাডাম, খুব কষ্ট পেয়েছিলাম কুকুরটা মারা যাওয়ায়। তখন আরও একটা প্রবলেমে পড়লাম, ডেড বডিটা নিয়ে। কোথায় নিয়ে যাব, বুঝতে পারছিলাম না। শেষে কর্পোরেশনের ময়লা তোলার গাড়িতে ফেলে দিলাম। তারপর থেকে ঠিক করেছি, আর কখনও কিছু পুষব না।'

পশুপাখি যারা পোষেন, তাঁদের এই এক সমস্যা। এত বড়

শহরে অ্যানিম্যালদের জন্য কোনও বেরিয়াল গ্রাউন্ড নেই। অথবা ক্রিমেশনের ব্যবস্থা । বছর দুয়েক হল, গোবিন্দপুরের একটা পশুপ্রেমী

সংস্থা—কেয়ার ফর অ্যানিম্যালস- এর হয়ে কাজ করেছে সাঁঝেলি। সেক্রেটারি আশিষ ভট্টাচার্য মানুষটাকে খুব ভালো লেগে গেছে ওর। পশুপাখিদের জন্য ভদ্রলোক সত্যিই কিছু করার চেষ্টা করছেন। কয়েক দিন আগে, অনেক চেষ্টা করে মনোময় ব্যানার্জি বলে একজন রিপোর্টারকে দিয়ে সাঁঝেলি কাগজে একটা লেখা বের করেছিল, কেয়ার ফর অ্যানিম্যালস-এর হাসপাতাল সম্পর্কে। সেই আর্টিকেল এই ছেলেটা পড়েছে। ওকে আক্ষেপ করতে দেখে সাঁঝেলি বলল, 'পেট অ্যানিম্যালসের জন্য আমরা একটা বেরিয়াল গ্রাউন্ড করেছি বেহালার দিকে। জানলে, আপনারা কুকুরটাকে সেখানে কবর দিতে পারতেন।'

'আরে বাঃ', ছেলেটার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল,'আপনারা সত্যিই খুব ভালো কাজ করছেন। আমি কিন্তু আপনাদের হসপিটালটা একদিন দেখতে যাব ম্যাডাম। আচ্ছা, আসি তা হলে। হাজরার মোড়ে নামব । যাওয়ার আগে একটা কথা বলি, যদি আপনাদের কোনও কাজে লাগি, বলবেন। আমার নাম রাজা সেন। প্রোজ্জ্বলবাবুকে জিজ্ঞেস করলেই, আমার খোঁজ পেয়ে যাবেন।'

সাঁঝেলি ঘাড় নাড়ল। রাজা নেমে যাওয়ার পর ওর মনটা খুব ভালো হয়ে গেল । এই তো, হাতে- নাতে প্রমাণ, পৃথিবীতে ওর মতো আরও কত পশুপ্রেমী আছে । এই রাজা ছেলেটার সঙ্গে অর্ক সান্যালের কত তফাত । দু'জনে একই বয়সী। অথচ একজন এইমাত্র বলে গেল, পশুপাখিদের কল্যাণে সময় দিতে চায়। আর অন্যজন। সেদিন প্রায় ঘাড় ধাক্কা দিয়ে গাড়ি থেকে নামিয়ে দিয়েছিল মাঝ রাস্তায়। বাইপাসে অর্ক সান্যাল যা করেছিল, তা সাঁঝেলি ভুলতে পারেনি। সন্ধেবেলায় মাসিমণির বাড়ি ও গাড়ি ফিরছিল। বাইপাসে কিছু লোকের জটলা দেখে ট্যাক্সি

থেকে নেমে পড়ে। ভিড়ে উঁকি

দেখে একটা শকুন ঘাসে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। কেউ লাঠির খোঁচা মারছে। কেউ ঢিল ছুঁড়ছে।

শকুন রোগার স্পেসিস। ওদের সংখ্যা হঠাৎই খুব কমে গেছে। কেন কমেছে, সেটা জানার জন্য [illegible] কারোভিল অ্যান্ড সোসাইটি অব ইন্ডিয়া। তখনই জানা যায়, চতুষ্পদ জন্তু অর্থাৎ গরু-ঘোড়াদের

ডাইক্লোফেনেক বলে এক ধরনের ওষুধ খাওয়ানো হত, ব্যথা কমানোর জন্য। সেই ওষুধটা ক্ষতিকারক। জন্তু মারা যাওয়ার পরও, তার শরীরে বিষটা থেকে যাচ্ছিল। শকুন মূলত, স্ক্যাভেঞ্জার বার্ড। মরা জন্তু খেয়েই বেঁচে থাকে।

ফলে মৃত গরু-ঘোড়া খাওয়ার জন্য তার শরীরেও বিষ ঢুকেছিল। ডিম নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল। জন্মহার ভীষণ কমছিল। ওরা প্রায় বিলুপ্তির মুখে এসে দাঁড়ায়। এদিকে, শকুনের সংখ্যা কমে যাওয়ায় ইকোলজিকাল ব্যালান্স নষ্ট হচ্ছিল।

কেন্দ্রীয় সরকার আমেরিকা আর আফ্রিকা থেকে শকুন আমদানি করে দেশের তিনটে জায়গায় প্রজনন কেন্দ্র খুলেছে। ডাইক্লোফেনেক ওষুধটা ব্যান করে দিয়েছে। শকুনদের মেরে ফেলা এখন শাস্তিযোগ্য অপরাধ। বাইপাসের কাছেই ধাপার মাঠ। সেখান থেকে হয়তো কোনও কারণে শকুনটা শহরের দিকে এসেছিল। চোট

পেয়েছে। ওকে দেখেই সাঁঝেলি বুঝতে পারে, হাসপাতালে নিয়ে না গেলে বাঁচানো যাবে না। তাই ভিড়ের মাঝে ঢুকেই সাঁঝেলি চিৎকার করে উঠেছিল, 'এই... কেউ তোমরা শকুনটাকে মারবে না। মারলে পুলিশ ডাকব।'

সাঁঝেলির হুমকি শুনে ভিড় পাতলা হতে শুরু করে। শেষে অবস্থাটা এমন দাঁড়ায়, কাছাকাছি ট্যাক্সি ডাকারও লোক নেই। সাঁঝেলি ঠিক করে নেয়, শকুনটাকে নিয়ে গোবিন্দপুরে ওদের পশু হাসপাতালে যাবে। ভর সন্ধেবেলায় ওখানে আর কাউকে পাওয়া যাক বা না যাক, অন্নপূর্ণা সামন্তকে নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। ভেট সার্জেন, হাসপাতালের কাছেই ওর বাড়ি। তেমন হলে লোক পাঠিয়েও ওকে বাড়ি

থেকে ডেকে আনা যাবে। রুবি হসপিটালের মোড় থেকে গোবিন্দপুরে ওদের অ্যানিম্যাল হসপিটাল এমন কিছু দূরেও না।

একে অন্ধকার রাস্তা। তার ওপর কুয়াশার হালকা আস্তরণ। বাইপাস দিয়ে হুস করে গাড়ি চলে যাচ্ছে হেডলাইট জ্বালিয়ে। মিনিট কয়েক গাড়ি থামানোর চেষ্টা করেছিল সাঁঝেলি। কিন্তু কেউ থামে না। হঠাৎই পিছন ফিরে ও দেখল, শকুনটা হ্যাঁচড়াতে হ্যাঁচড়াতে রাস্তার পশ্চিম দিকে চলে যাচ্ছে। সর্বনাশ, যে কোনও সময় গাড়ি চাপা পড়তে পারে। ওই দিকে তাকিয়ে সাঁঝেলি তখন দ্রুত একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। গায়ের শালটা খুলে শকুনটাকে জড়িয়ে ও কোলে তুলে নিয়েছিল। গা থেকে দুর্গন্ধ বেরোচ্ছে, ওজনেও যথেষ্ট ভারী। শালের ভেতর থেকে লম্বা গলাটা বের করে ফেলেছে। আত্মরক্ষার জন্য যে কোনও সময়ে ঠুকরে দিতে পারে। তা সত্ত্বেও, আহত শকুনটাকে আরও আঁকড়ে ধরেছিল সাঁঝেলি।

pathagar.net

ওকে চিৎকার করতে দেখে একটা ট্যাক্সি দাঁড়াল বটে, কিন্তু কোলের মধ্যে বিকট প্রাণীটা দেখেই ড্রাইভার সভয়ে চম্পট দিয়েছিল। মিনিট দশেক চেষ্টার পর প্রেস লেখা একটা স্যান্ট্রো গাড়িতে শেষ পর্যন্ত উঠতে পেরেছিল সাঁঝেলি। গাড়িটা চালাচ্ছিল ওরই বয়সী একটা ছেলে। 'কোথায় যাবেন' বলার সময় ছেলেটা বোধহয় আর কিছু খেয়াল করেনি। ওর মনোযোগ সরিয়ে দেওয়ার জন্য, সাঁঝেলি ইচ্ছে করেই কথা বলতে শুরু করেছিল। 'আপনি কোন কাগজে আছেন, 'থাকেন কোথায়', 'আপনাকে ট্রাবল দিলাম,' ইত্যাদি ইত্যাদি।

তখনই নামটা জানতে পারে অর্ক। কিন্তু শকুনটার গা থেকে বিশ্রী গন্ধ বেরোনোর জন্যই হোক বা অন্য কোনও কারণে, খানিকটা রাস্তা যাওয়ার পর, অর্ক হঠাৎ জানতে চায়,

আপনার কোলে ওটা কি বলুন তো?

সাঁঝেলি সত্যি কথাই বলেছিল। শোনামাত্র অর্ক গাড়িটা রাস্তার ধারে দাঁড় করিয়ে দেয়। খুব রুঢ় গলায় বলে ' প্লিজ, নেমে যান।'

অনেক অনুরোধ করার পর অর্ক সেদিন গোবিন্দপুরের মোড়ে নামিয়ে দিয়েছিল। এমন ভাব

েছিল, যেন গাড়িটা নোংরা হয়ে গিয়েছে। পশুপাখি যারা ভালোবাসে না, সাঁঝেলি তাদের মানুষ

মনে করে না। অর্ককে ও সহবত শেখাবে, ঠিকই করে ফেলেছিল। পরে ও জানতে পারে,

টা ওর রিপোর্টার বন্ধু নন্দিনীর কলিগ। তারপর থেকে রাগ একটু কমেছে। নন্দিনীই ওকে বলেছিল, 'অর্কর সঙ্গে ঝগড়া করতে যাস না। বরং ওর মতো সাংবাদিকের সঙ্গে একটু যোগাযোগ রাখ। সমাজের সর্বস্তরে ওর কনট্রাক্ট আছে। সেটা পরে কাজে লাগাতে পারবি।'

শকুনটাকে পরদিনই সাঁঝেলি দিয়ে এসেছে চিড়িয়াখানায়। এটাই নিয়ম। রেয়ার স্পিসিস বলে কোনও ঝুঁকি নিতে চায়নি আশিসদা। মারা গেলে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের কাছে অনেক কৈফিয়ত দিতে হত। সেই শকুনটা কেমন আছে, তা দেখার জন্যই আজ সাঁঝেলি বাড়ি থেকে বেরিয়েছে। চিড়িয়াখানায় শকুনটাকে যে দেখাশুনো করছে, সেই শিউচরণ ফোনে বলল, 'ম্যাডাম, নিজের চোখেই দেখে যান। অনেক দিন এদিকে আসেননি। আর হ্যাঁ, কাল ডিরেক্টর সাহেব আপনার খোঁজ করছিলেন। আজ আসুন না।' শিউচরণের কথায় সাঁঝেলি বুঝতে পেরেছিল, শকুনটা ভালোই আছে। কিন্তু ডিরেক্টর কেন ওর খোঁজ করছিলেন, সেই কৌতূহলটা চিড়িয়াখানায় গিয়ে ও মেটাবে।

'চিড়িয়াখানা', 'চিড়িয়াখানা।' কনডাক্টরের গলা শুনে সাঁঝেলি বাইরে তাকিয়ে দেখল, বাস ন্যাশন্যাল লাইব্রেরি থেকে ডান দিকে বাঁক নিচ্ছে। সিট ছেড়ে ও উঠে পড়ল, উঁকি মেরে দেখল, চিড়িয়াখানার গেট-এর সামনে মারাত্মক ভিড়। আজ তেইশে ডিসেম্বর, রবিবার। ভিড় বেশি হওয়াটাই স্বাভাবিক।

দর্শকদের লাইন চলে গেছে জিরাট ব্রিজ পর্যন্ত। জানুয়ারির শেষ সপ্তাহ পর্যন্ত চিড়িয়াখানায় ঢোকা যাবে না। বাস থেকে নেমে গেটের সামনে দাঁড়িয়ে সাঁঝেলি একবার চিন্তা করল, শিউচরণকে ফোন করবে কী না। ও এখন চিড়িয়াখানার হাসপাতালে, না চিড়িয়াখানার বাগানে—আগে সেটা জেনে নেওয়া দরকার। বাগানে থাকলে এই ভিড়ে ওকে খুঁজে পাওয়া মুশকিল হবে।

চিড়িয়াখানার হাসপাতালটা ঠিক উল্টোদিকে। তাজ বেঙ্গল হোটেল আর অ্যাকোরিয়াম বিল্ডিংসের মাঝখানে। শিউচরণ যদি ওখানে থাকে, তা হলে টিকিট কেটে কোনও লাভ নেই। কেননা, হাসপাতালে বিনা টিকিটেই যাওয়া যায়। ব্যাগ থেকে মোবাইল সেটটা বের করার সময়, গেটের সামনে একজনকে দেখে সাঁঝেলি অবাক হয়ে গেল। আরে... অর্ক স্যান্যাল না? এই তো ঘণ্টা খানেক আগে ফোনে ওর

সঙ্গে কথা বলল। অফিসে বসে তখন কত ব্যস্ততা দেখাল। বদ্রিকা পাখির খবরটা নিয়ে কত ব্যঙ্গ করল। হঠাৎ চিড়িয়াখানায়? কী করতে এসেছে? শিউচরণকে ফোন করার কথা ভুলে সাঁঝেলি এগিয়ে গেল অর্কর দিকে।

৩

'অর্ক'। এখানে আপনি? হোয়াট আ সারপ্রাইজ।'

ভিড়ের মাঝে নিজের নামটা শুনে অর্ক ঘুরে তাকাল। মিনিট পাঁচেক হল ও চিড়িয়াখানায় এসেছে। এত মানুষ দেখে সত্যিই অবাক হয়ে গেছে। চিড়িয়াখানার আশপাশ দিয়ে বহুবার আসা যাওয়া করেছে। কিন্তু প্রায় বছর পনেরো ভেতরে ঢোকেনি। গেটের সামনে দাঁড়িয়ে ও খানিকটা নস্টালজিক হয়ে পড়েছিল। দাদুর কথা খুব মনে পড়ছিল। কেননা শেষবার ও এসেছিল ওই দাদুর সঙ্গে।

ডাক শুনে, অর্ক ঘুরে তাকাল। আরে, ইস্টার্ন বাইপাসের সেই মেয়েটা না? হ্যাঁ, এই তো সাঁঝেলি মিত্র। গাড়িতে সেই সন্ধ্যায় খুব ভালো করে মেয়েটাকে দেখার সুযোগ পায়নি। তবে নেমে যাওয়ার সময় যতটুকু দেখেছে, তাতে মনে আছে, ওর পরনে ছিল জিন্‌স। আজ স্কার্ট, তাই অন্য রকম লাগছে। একটু আগে ফোনে মেয়েটাকে একটু গায়ে পড়া বলে মনে হচ্ছিল। কিন্তু চোখে দেখার পর অর্কর ধারণা বদলে গেল। বেশ ব্যক্তিত্বময়ী। বয় কাট চুল, তবুও গোলমুখটায় অদ্ভুত লাবণ্য মাখানো। এক

নজরেই অর্কর মনে হল,

অনেক দেখেছে। ওর মুখ

বড়লোকের খেয়ালি মেয়ে। কলেজে পড়ার সময় এই ধরনের মেয়ে ও থেকে বেরিয়ে গেল, 'ওহ আপনি। আশ্চর্য, জানলেন কী করে আমি এখানে আসছি?'

'থট রিডিং।' বলেই সাঁঝেলি হাসল।

মুক্তোর মতো ওর দাঁতগুলো ঝলসে উঠল। টুথপেস্ট কোম্পানির ভালো মডেল হতে পারত। অর্ক দ্রুত এই সিদ্ধান্তে এল। ও কিছু বলার আগেই সাঁঝেলি বলল, 'চলুন, ভেতরে যাবেন, না কি এখানে ভিড়ের মাঝে শুধু ধাক্কা খাবেন?'

অফিস থেকে বার পাঁচেক ফোন করেও অর্ক সাঁঝেলিকে পায়নি। ভাগ্যিস, ওর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। না হলে দিব্যদার কাছে প্রেস্টিজ যেত। বদ্রিকা পাখির খবরটা ডিটেলে নিতে হবে। অর্কর মন বলল, আজ দিনটা খারাপ যাবে না। একেই বলে ভাগ্য। সত্যি, ভাগ্য সহায় না থাকলে বড় খবর পাওয়া যায় না। ছ'বছরের কেরিয়ারে অর্ক বুঝে গেছে, সেনসেসনাল খবর পাওয়ার জন্য দরকার, এইট্টি পার্সেন্ট লাক। দিব্যদা চিড়িয়াখানায় আসতে বলায়, ও একটু মনঃক্ষুণ্ণ হয়েছিল। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, এখানেই ও ভালো একটা খবর পাবে। তার আগে সাঁঝেলির ফোন নাম্বারটা ভালো করে জেনে নেওয়া যাক। তাই বলল, 'আপনার ফোন নাম্বারটা একবার বলুন তো? এতবার করলাম, অথচ পেলাম না কেন?'

কাঁধে ঝোলানো ব্যাগ থেকে একটা নেম কার্ড বের করে মেয়েটা বলল, 'এখুনি মুখস্থ করে নিন, না হলে আমি কিন্তু উল্টো দিকে হাঁটব।'

কার্ডটাতে ভালো করে চোখ বুলিয়ে অর্ক মনে মনে নামটা উচ্চারণ করল, সাঁঝেলি। মনে মনে বলার সময় ওর অদ্ভুত ভালো লাগল। তারপর হেসে ও বলল, 'চলুন, এ বার ভেতরে ঢোকা যাক।'

সাঁঝেলি বোধহয় প্রায়ই চিড়িয়াখানায় আসে। সিকিউরিটির লোকজন ওকে চেনে। গেট দিয়ে ঢোকার সময় অর্ক লক্ষ করল, বটল গ্রিন রঙের পোশাক পরা সিকিউরিটির লোক সাঁঝেলিকে দেখে বলল, 'ভেতরে যাবেন ম্যাডাম? ডিরেক্টর সাহেব অফিসে নেই। এখুনি কোথায় যেন বেরিয়ে গেলেন।'

সাঁঝেলি বলল। 'পিয়ালি ম্যাডাম অথবা প্রশান্ত স্যার— কেউ আছেন?'

'ম্যাডাম আজ ছুটিতে। প্রশান্তবাবু টিকিট কাউন্টারে বসে আছেন। ডান দিকে যান, দেখতে পাবেন।'

অর্ক জিজ্ঞেস করল, 'এই ম্যাডাম আর স্যারটি কে?'

'পিয়ালি ম্যাডাম হলেন চিড়িয়াখানার ডেপুটি ডিরেক্টর। আর প্রশান্ত চ্যাটার্জি অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর। আসুন, আপনার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। পশুপাখির মধ্যে বাস করেও যে কবিতা লেখা যায়, প্রশান্তবাবু তার নজির।'

গেটের ডান দিকেই পর পর কয়েকটা টিকিট কাউন্টার। আদ্যিকালের রিভলভিং গেট দিয়ে ক্রমাগত লোক ভেতরে ঢুকছে। সাঁঝেলি কাউন্টারের ভেতর ঢুকে গেল। বাইরে দাঁড়িয়ে অর্ক এক বার চার পাশে নজর বোলাল। পশ্চিম দিকে বিরাট একটা হোর্ডিং। তাতে ছবি এঁকে বুঝিয়ে দেওয়া আছে, চিড়িয়াখানার কোথায় কী আছে। অবশ্য ওই হোর্ডিং দেখার তাগিদ কারও নেই। গেট দিয়ে ঢুকে লোকেরা ডান আর বাঁ দিকে চলে যাচ্ছে। রেলিং ঘেরা পার্কগুলোতে একটু জায়গাও খালি নেই। বউ-

গাছা নিয়ে অনেকে বসে পড়েছে সতরঞ্চি বা চাদর পেতে। একেবারে পিকনিকের মেজাজে। দূরদূরান্ত থেকে এসেছে, সারা দিনের প্রোগ্রাম। বাড়ি থেকে টিফিন কেরিয়ার ভর্তি খাবার এনেছে। কাগজের প্লেটে খাওয়া দাওয়া চলছে। ওই প্লেট, পলিথিনের ব্যাগ, আরও কত কী ফেলে যাবে চলে যাওয়ার সময়। সাইনবোর্ডে বারণ করা আছে। তা সত্ত্বেও কেউ মানে না।

টিকিট কাউন্টার থেকে সাঁঝেলি বেরিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে অর্ক দেখতে পেল, ওর সঙ্গে ছিপছিপে শরীরের মাঝবয়সী এক ভদ্রলোক হেঁটে আসছেন। পরনে স্যুট-টাই। ইনিই তা হলে অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর। সাঁঝেলি পরিচয় করিয়ে দিতেই, অর্ক লক্ষ্য করল, হঠাৎই ভদ্রলোকের মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে গেল। অস্বস্তির সঙ্গে উনি বললেন, 'আপনি কি আমার সঙ্গে কথা বলতে এসেছেন? সরি, আমি কিছু বলতে পারব না। যা বলার ডিরেক্টর সাহেবই বলবেন।'

অর্ক বলল, 'কী ব্যাপার বলুন তো?'

প্রশ্নটা শুনে ভদ্রলোক যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। তারপর দ্রুত নিজেকে সামলে নিয়ে গলায় ঝাঁঝ এনে বললেন, 'আমাদের এখানে একটা নিয়ম আছে। প্রেসের লোকদের সঙ্গে যা কথা বলার, বলবেন ডিরেক্টর সাহেব। আপনাদের সঙ্গে কথা বলা মানেই ঝামেলা ডেকে আনা। আপনার কাগজের বিরুদ্ধে আমাদের একটা কমপ্লেন আছে মশাই। এই ক'দিন আগেই, না জেনে আপনারা একটা বাজে খবর ছেপেছেন আমাদের এগেনস্টে।'

ওর কাগজের বিরুদ্ধে কেউ বললে অর্ক তাঁকে ছেড়ে দেয় না। তবুও মাথা ঠাণ্ডা রেখে ও জানতে চাইল, 'কোন খবরটার কথা বলছেন?'

'মাসখানেক আগেকার। কালীপুজোর পরদিন বেরিয়েছিল। কালীপুজোর দিন জু দেখার জন্য নাকি শহরের লোক এসেছিল। এসে তারা দেখে, গেট বন্ধ। অনেক অনুরোধ করা সত্ত্বেও, তাদের না কি ঢুকতে [illegible]। এই নিয়ে দর্শকদের বিক্ষোভ। শেষে পুলিশ লাঠি চার্জ করে এবং তাদের তাড়িয়ে দেয়।

অভিযোগ শুনে সাঁঝেলি মিটিমিটি হাসছে। ওর দিকে তাকিয়ে অর্ক প্রসঙ্গ ঘোরাল। প্রশান্তবাবুকে জিজ্ঞেস করল, 'আজ নাকি আপনাদের এখানে রেকর্ডসংখ্যক লোক হয়েছে?'

'এই খবরটা আবার কার কাছ থেকে পেলেন? এটা তো কোনও ভিড়ই না মশাই। গতবার পঁচিশে ডিসেম্বর চুয়াত্তর হাজার লোক এসেছিল। চিড়িয়াখানার ইতিহাসে এত লোক আর কখনও হয়নি।'

'আপনাকে কি রোজ টিকিট কাউন্টারে বসতে হয় নাকি?'

'না মশাই। আজ হাইকোর্টের এক জজসাহেবের আসার কথা। সপরিবারে জু দেখতে আসবেন। তাঁকে রিসিভ করার জন্যই আমি কাউন্টারে বসে আছি। প্রোটোকল, বুঝতেই পারছেন। জু-এর তরফ থেকে কাউকে রিসিভ করতে হবে তাঁকে। না হলে জজ সাহেবের মাথা আবার গরম হয়ে যেতে পারে। আমি যাই। অন্য একদিন আসবেন, তখন বসে এক কাপ চা খাওয়া যাবে।' কথাগুলো বলেই আর দাঁড়ালেন না প্রশান্তবাবু। হনহন করে হেঁটে গেলেন কাউন্টারের দিকে

অর্কর মনে হল, ভদ্রলোক যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। ওর সাংবাদিক সত্তা বলতে লাগল, চিড়িয়াখানায় নিশ্চয়ই আজ কিছু একটা ঘটেছে। না হলে ওকে দেখে প্রশান্তবাবুর মুখটা অত ফ্যাকাশে হয়ে যেত না। চিড়িয়াখানায় অর্কর কোনও কন্ট্যাক্ট নেই। ফলে, কী ঘটেছে, তা জানার উপায়ও নেই। সাঁঝেলি এতক্ষণ কোনও কথা বলেনি। এ বার বলল, ' দিলেন তো সব মাটি করে। টিকিট কাউন্টার থেকে ভদ্রলোককে পটিয়ে পাটিয়ে বের করে আনলাম। আপনাকে দেখে উনি পালিয়ে গেলেন। আচ্ছা,

সাংবাদিকদের কেউ বিশ্বাস করে না কেন, বলুন তো?'

অর্ক ঝটপট উত্তর দিল, 'সাংবাদিকরা কাউকে বিশ্বাস করে না বলে।'

'আপনাদের এই প্রফেশনে আসার জন্য কি ছোটবেলা থেকেই ট্রেনিং নিতে হয়?'

'না।' অর্ক ঠাট্টা করল, ' সাংবাদিকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশলেই ট্রেনিংটা হয়ে যায়।'

গ্রীবা তুলে ওর দিকে তাকাল সাঁঝেলি। বলল, 'যাঃ, এমন হয় না কি?'

সে দিকে তাকিয়ে ক্ষণিকের জন্য অর্ক ভুলে গেল, ও কী জন্য চিড়িয়াখানায় এসেছে। আগে তো কখনও কোনও মেয়েকে দেখে এমন হয়নি? চিরদিনই ও রাফ টাফ গোছের মানুষ। নিজে কখনও প্রেমে পড়েনি। দু' মিনিটের বেশি কোনও মেয়ের সঙ্গে একান্তে কথা বলার ইচ্ছেও ওর হয়নি। সেই অর্ক হঠাৎই সাঁঝেলিকে বলে বসল,

'আলবাত হয়। পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। যাক গে, পার্সোনাল কথা ছাড়ুন। এসেছি যখন, চলুন চিড়িয়াখানাটা একটু ঘুরে দেখি। আপনাকে এক্সপার্ট বলে মনে হচ্ছে। আপনার সঙ্গে ঘুরলে হয়তো কোনও স্টোরি পেলেও, পেয়ে যেতে পারি।'

সাঁঝেলি অদ্ভুত মুখভঙ্গি করে বলল, ' হাতে হঠাৎ অনেক সময় আছে বলে মনে হচ্ছে।'

'সময় থাকে না। সময় বের করে নিতে হয়।'

'তা হলে চলুন, আপনাকে একটা নতুন জায়গায় নিয়ে যাই। রাস্তার ও পারে, তাজবেঙ্গলের পাশে। আমি ডেফিনিট, সেখানে আপনি আগে কখনও যাননি।'

কথাগুলো বলেই সাঁঝেলি ফের গেটের দিকে এগিয়ে গেল। ওর পিছনে পিছনে অর্কও। গেটের সামনে ফেরিওয়ালা। পুলিশ আর দর্শনার্থীদের পাশ কাটিয়ে রাস্তার উল্টো দিকে পৌঁছতে ওদের মিনিট

পাঁচেক লেগে গেল। অ্যাকোরিয়াম হল-এর বাঁ দিকে একটা লোহার গেট পেরোনোর সময় সাঁঝেলি বলল, 'এটা জু-র হসপিটাল। এখানেই সেই শকুনটা রেখে গেছি, সে দিন যেটাকে বাইপাস থেকে কুড়িয়ে এনেছিলাম। শকুনটা কেমন আছে, আসুন সেটা একবার দেখে যাই।'

অর্ক দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, 'মাফ করবেন, ওই বিকট প্রাণীটি ফের দেখার ইচ্ছে আমার নেই। আপনি মহান পক্ষীপ্রেমী। আপনি যান। আমি বরং বাইরে দাঁড়িয়ে আছি।'

'আরে, আসুনই না। শকুন দেখতে ভালো নয় বলে অপছেন্দা করছেন। কিন্তু এত উপকারী প্রাণী কটি বললেই চলে। সে দিন আমাকে গাড়ি থেকে এমনভাবে নামিয়ে দিলেন, এ সব বলার সুযোগই আমি পেলাম না। সরকারের কাছে এই প্রাণীর কতটা কদর, তা কি আপনি জানেন? আপনার আমার থেকে অনেক বেশি।'

'সরি সাঁঝেলি, সেদিনকার কথাটা তুলে আমায় লজ্জা দেবেন না। সেদিন গাড়ি চালাতে চালাতে আমার ভয় হচ্ছিল, যদি শকুনটা পিছন থেকে ঠুকরে দেয়?'

'দিলে দিত। একটা টিটেনাস ইনজেকশন নিলেই ঠিক হয়ে যেত। অত ভয়ের কী আছে? আমাদের তো প্রায়ই নিতে হয়।'

সাঁঝেলির সঙ্গে হাঁটার সময় অর্কর হঠাৎ মনে হল, চিড়িয়াখানায় যদি অন্য কোনও খবর না পায়,
তা হলে বদ্রিকা পাখি আর শকুনের খবরটা মিশিয়ে একটা স্টোরি করবে। সাঁঝেলির বদ্রিকা পাখি আর শকুন উদ্ধার পর্বের কথা লিখবে। স্টোরিতে একটা হিউম্যান অ্যাঙ্গেল থাকলে পাঠকরা খুব

খায়। একটা উচ্চবিত্ত পরিবারের শিক্ষিত মেয়ে আগুনের মধ্যে ঢুকে, নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে, কীভাবে ছোট্ট কয়েকটা পাখির জান বাঁচিয়েছে, তাও আবার একটা বাচ্চা ছেলের কথা রাখতে গিয়ে, সেটা সত্যি লেখার মতো বিষয়।

পকেট থেকে ডিক্টাফোনটা বের করে, রাস্তায় দাঁড়িয়েই ও চট করে সাঁঝেলির ইন্টারভিউ নিয়ে

ফেলল। সাঁঝেলির একটা ছবি দরকার। অর্ক ভেবে রাখল, শকুনের খাঁচার সামনে সাঁঝোলিকে দাঁড় করিয়ে, সেই ছবিটা তুলবে।

কথা বলতে বলতেই সাঁঝেলির সঙ্গে, ইংরেজির 'এল' আকারের একটা দোতলা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল অর্ক। 'এল' আকারেই বারান্দা। সারি সারি ঘর। জায়গাটা গাছ গাছালিতে ভর্তি। মাত্র একশো গজ দূরে রাস্তার ওপারটা গমগম করছে, অথচ এ দিকটা অদ্ভুত শান্ত, ছমছমে। লোকজন বিশেষ যাতায়াত করে বলে অর্কর মনে হল না। হঠাৎই এক ধরনের কটু গন্ধ ওর নাকে জ্বালা ধরিয়ে দিল। ল্যাবরেটরিতে গেলে যেমন গন্ধ পাওয়া যায়। পকেট থেকে রুমালটা বের করে ও নাকের সামনে ধরল।

কাউকে দেখতে না পেয়ে সাঁঝেলি হাঁক মারল, 'শিউচরণ। তুমি কোথায়?'

ডানদিকের একটা ঘর থেকে মাঝবয়সী লোক বেরিয়ে এসে বলল, 'এখানে ম্যাডাম, এই ঘরে। চলে আসুন।' কথায় আদিবাসীদের মতো টান। দেখতে সার্কাসের রিং মাস্টারের মতো। পরনে সাদা টি শার্ট আর নীল জিনস্-এর ট্রাউজার্স। শার্টের ভেতর থেকে পেশি ফুটে বেরোচ্ছে। লোকটার হাতে জলের বড় একটা মগ। চোখের দিকে তাকিয়ে অর্ক বুঝতে পারল, শিউচরণ ওকে দেখে খুশি হয়নি।

শিউচরণের সঙ্গে ঘরে ঢুকেই অর্ক হতভম্ব হয়ে গেল। এক দেড় হাত দূরে লোহার খাঁচার মধ্যে আস্ত একটা বাঘ। ওদের দেখে গরগর

করে উঠল। ভাঁটার মতো দু'টো চোখ, বড় শ্বদন্ত, টকটকে লাল জিভ। সামনের দু'টো পা খাঁচার শিকের ওপর তুলে ধরেছে। যেন এখুনি ঝাঁপিয়ে পড়বে। দেখে অর্কর [illegible] উঠল। ঘরের ভেতর তীব্র রাসায়নিক গন্ধ নাকে ঢুকতেই, হঠাৎ ওর বমি পেয়ে গেল।

'[illegible] করে না, লক্ষ্মী সোনা।' শিউচরণ বাঘটাকে শান্ত করার চেষ্টা করছে। খাঁচার ভেতর একটা

[illegible] পাত্রে জল ঢেলে দিতে দিতে ও বলল, 'এই বাঘটার নাম রুদ্র। রোজ ঠিক বেলা দু'টোর

[illegible] জল খাইয়ে যাই। আজ এক ঘণ্টা দেরি হয়ে গেছে। তাই এত রাগ।'

সাঁঝেলি জিজ্ঞেস করল, 'আজ তোমার দেরি হল কেন?'

'কী করব ম্যাডাম, ওই গয়ালের জন্য,' বলেই শিউচরণ পাশের খাঁচায় রাখা মোষের মতো একটা জন্তুর দিকে আঙুল দেখাল, 'সকালে ওর জন্য একটা মিসহ্যাপ হয়ে গেছে।'

একই ঘরে বাঘের পাশে মোষ। তারও পাশে ছোট খাঁচায় শকুন। আশ্চর্য সহাবস্থান। বাঘের নাম রুদ্র, মোষের নাম গয়াল? শিউচরণ কি শকুনটারও কোনও নাম দিয়েছে? অন্য সময় হলে অর্ক জিজ্ঞেস করত। কিন্তু 'মিসহ্যাপ' কথাটা শুনে ওর মাথায় কে যেন ঘণ্টা বাজাতে শুরু করল। একটা বড় খবর। হয়তো লাখে এক। ও নির্লিপ্ত মুখে বাঘের দিকে তাকিয়ে রইল। শিউচরণ যাতে বুঝতে না পারে, মিসহ্যাপ নিয়ে ওর আগ্রহ আছে।

'সকাল সাতটার সময় গয়ালটাকে খেতে দেওয়ার জন্য বাগানে ঢুকেছিল আমাদের এক কলিগ রামভজন।' শিউচরণ বলতে লাগল, 'বাগানে একটাই গয়াল। রোজ নিজের হাতে করে রামভজন একে খাওয়াত। এত ভালো র‍্যাপোঁ। আজ এর কী হয়েছিল কে জানে? হঠাৎ খেপে গেল। ওই যে দেখছেন, এর দেড় ফুট সোজা শিং। রামভজনের পেটে ওই শিং সিধা ঢুকিয়ে, ওপরে তুলে, ছুঁড়ে ফেলে দিল। ম্যাডাম, রামভজনের পেটের নাড়ি ভুঁড়ি বেরিয়ে এসেছিল।'

সাঁঝেলি জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় নিয়ে গেছ রামভজনকে? পি জি হসপিটালে?'

'না, না। হাজরা মোড়ে একটা নার্সিংহোমে ভর্তি আছে। অবস্থা খুব খারাপ। ডাক্তারবাবু বললেন,

বাঁচবে বলে মনে হয় না। কী কপাল ম্যাডাম, ওর বউ-বাচ্চা দেশের বাড়িতে গেছে। আজ সকালে আমার বাড়িতে ও আর আমি একসঙ্গে ব্রেকফাস্ট করে বাগানে এসেছিলাম। আর দেখুন, এখন ও মর-মর অবস্থায় নার্সিংহোমে শুয়ে।' শেষের দিকে শিউচরণের গলাটা ভারি। ও ফের বাঘের খাঁচায় জল ঢালায় মন দিল।

সাঁঝোলি ফিসফিস করে ইংরেজিতে বলল, 'আপনার স্টোরি কিন্তু হয়ে গেল।'

চাপা গলায় অর্ক বলল, 'এই গয়াল জন্তুটা কি মোষ জাতীয়?'

'আসলে বুনো গরু। নর্থ বেঙ্গলে ডুয়ার্সের দিকে পাওয়া যায়। পরে ডিটেল বলছি।'

'নার্সিংহোমের নামটা কায়দা করে জেনে নিন।'

আধ ঘণ্টা পর দু'জনে যখন তাজ বেঙ্গলের সামনে দাঁড়িয়ে, তখন সাঁঝেলি বলল, 'আমার জন্য এত বড় একটা খবর পেয়ে গেলেন, অথচ একটা থ্যাঙ্কসও দিলেন না।'

অর্ক গম্ভীর গলায় বলল, 'খবরটা ছাপা হওয়ার পর, জানাব। তার আগে না। মনে হচ্ছে, আপনার সঙ্গে এটাই আমার শেষ দেখা নয়। ভবিষ্যতেও দেখা হবে।'

'ভবিষ্যতে কেন, ভগবান চাইলে আজ সন্ধ্যাতেই আপনার সঙ্গে আমার দেখা হতে পারে। কোথায়, তা অবশ্য জানতে চাইবেন না

।'

হেঁয়ালিটা অর্ক বুঝতে পারল না। সন্ধেবেলায় ও অফিসেই থাকবে। সাঁঝেলি কি ওর অফিসে আসার প্ল্যান করছে? না, না, তার কোনও দরকার নেই। দেবদূত, কমলেন্দুরা কী মাল, সে তো সাঁঝেলি জানে না। একজন সুন্দরী মেয়ে কারও সঙ্গে দেখা করতে গেলে, ওরা নানা রকম গসিপ শুরু করে দেয়। তাই ও বলল, সন্ধেবেলায় অফিসে খুব ব্যস্ত থাকি। কেউ গেলে কথা বলারও সময় পাই না। যাক গে, আপনার কাছে একটা রিকোয়েস্ট আছে। এই খবরটা যেন আবার মনোময়ের কানে না যায়।'

শুনে সাঁঝেলি দুষ্টুমি করে বলল, 'গ্যারান্টি দিতে পারছি না।'

৪

অফিসে ঢুকেই ইন্টারকমে প্রাইভেট সেক্রেটারি রিমিতাকে ডেকে প্রোজ্জ্বল মিত্র বললেন, 'মিস গাঙ্গ
লি, আজ ক'টা মিটিং ফিক্স করেছেন, আমাকে জানান তো?'

'চারটে স্যার'। রিমিতা গাঙ্গুলি একটা ফাইল এগিয়ে দিয়ে বলল, 'লাঞ্চের আগে অফিসের কনফারেন্স রুমে প্রথম মিটিং। শিল ংয়ের এক পার্টির সঙ্গে। বেলা একটায় সেকেন্ড মিটিং হোটেল সোনার বাংলায়। ঝাড়খন্ড গভর্নমেন্টের থ্রি মেম্বর ডেলিগেশন-এর সঙ্গে স্যার। পোস্ট লাঞ্চে আরও দুটো...'

রিমিতাকে থামিয়ে দিয়ে প্রোজ্জ্বল বললেন, 'শিলং পার্টির সঙ্গে মিটিংটা ক্যানসেল করে দিন। রাজাকে বলুন আমি বলেছি, ওদের স্ফূর্তি টুর্তির ব্যবস্থা করতে। একদিন থাকা-খাওয়ার বাড়তি খরচা

আমরাই করব। বেলা এগারোটার সময় রথীন সর আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবেন। কে জানেন তো? সাউথ চব্বিশ পরগনার ওয়ান অ্যান্ড ওনলি লিডার। মোস্ট পাওয়ারফুল। উনি এখানে এলে, সেই সময় কেউ যেন আমাদের ডিস্টার্ব না করে।'

'ও কে স্যার।'

'আর হ্যাঁ, শুনুন। রথীন সরকে সসম্মানে ওপরে নিয়ে আসার জন্য অমিতকে নীচে ফিট করে দিন। আপনি পার্সোন্যালি ক্যাশ কাউন্টারে গিয়ে জীবনবাবুর কাছে জেনে নেবেন, লাখ পাঁচেক টাকা আছে কি না। না থাকলে ব্যাঙ্ক থেকে তুলে আনতে বলুন। হারি আপ, রথীন সর আসার আগেই যেন টাকাটা অ্যাটাচি কেস-এ ভরে রাখা হয়।'

'ইয়েস স্যার'।

'ফাইন, এখন যান। কেউ যেন টাকার কথাটা না জানে।'

পার্টির উদ্যোগে জেলায় সাংস্কৃতিক মেলা হবে। রথীন সর সেই কারণে ডোনেশন নেওয়ার জন্য মিত্র কনস্ট্রাকশনের অফিসে আসবেন। উনি কারও কাছে হাত পাততে যান না। অন্যরা পার্টি অফিসে গিয়ে ডোনেশন দিয়ে আসে। কিন্তু প্রোজ্জ্বল মিত্রের সঙ্গে রথীন সরের অন্য সম্পর্ক। একবার অনুরোধ করার পরই উনি অফিস 'দেখে যাওয়ার' নেমন্তন্নটা, রাখতে রাজি হয়েছেন।

ইস্টার্ন বাইপাস-যাদবপুর কালেক্টরের কাছেই কালীতলায় মিত্র কনস্ট্রাকসনের বিরাট অফিস। চার তলা বিল্ডিংস। কিন্তু ধবধবে সাদা রঙের বাড়িটা অভিসিক্তা নামে একটা হাউসিং কমপ্লেক্সের আড়ালে পড়ে গেছে। বাইপাসের আশপাশে এখন নতুন নতুন কমপ্লেক্স আর অফিস গজিয়ে উঠছে। শপিং মল, মাল্টিপ্লেক্সও। রাস্তার ধারে বিরাট বিরাট হোর্ডিং, নিয়ন আলোয় উদ্ভাসিত বিজ্ঞাপনের ফ্লেক্স। পনেরো বছর আগে এই অঞ্চলে ছিল শুধু ভেড়ি। লোকজনও তেমন বসবাস করত না। বাংলায় রাজনৈতিক পালাবদলের পর ভেড়িগুলো দখল হয়ে গেল। বাইপাস হওয়ার পর তো এই অঞ্চলের জমির দাম হু হু করে বাড়তে লাগল। এখন দ্রুত নগরায়নের চিহ্ন সর্বত্র।

একটা সময় রথীন সরের পরামর্শেই কালীতলায় দু'বিঘে জমি জলের দরে কিনে রেখেছিলেন প্রোজ্জ্বল মিত্র। বছর পনেরো আগেকার কথা। সবে আর্কিটেক্ট ডিগ্রি নিয়ে লন্ডন থেকে ফিরেছেন। কলকাতায় তখন নামকরা আর্কিটেক্ট বলতে তেমন কেউ নেই। সরকারি অথবা বেসরকারি— সব - স্তরেই বড় কোনও প্রোজেক্ট-এর কথা ভাবলে লোকে তখন দিল্লি অথবা মুম্বইয়ে ছোটে। সেই সময়ই প্রোজ্জ্বল মিত্র একটা মন্ত্র তাঁর মনের কোঠায় লিখে ফেলেন, 'কেন আমি নয়'। রাজারহাট, সল্ট লেকে যে বেশ কয়েকটা বড় প্রোজেক্ট হবে, তখনই তিনি আন্দাজ করে ফেলেছিলেন।

'আমি কেন নয়' এই আত্মানুসন্ধান করতে করতেই রাস্তাগুলো ঠিক ঠিক চিনে নিতে পেরেছেন প্রোজ্জ্বল মিত্র। দশ বছরের মধ্যে আর্কিটেক্ট হিসাবে কলকাতায় তিনি সামনের সারিতে চলে আসেন। বাইপাস দিয়ে যাতায়াত করার সময়, তখন পশ্চিম দিকে তাকিয়ে মাঝে মধ্যে আত্মপ্রসাদ অনুভব করতেন তিনি। হাই রাইজ সব বিল্ডিং কমপ্লেক্স-এর সুন্দর সুন্দর সব নকশায় যে তাঁরই হাতের ছোঁয়া আছে। ঠিক ওই সময়ই প্রোজ্জ্বল মিত্রের মনের গভীরে ফের সেই মন্ত্রটা তাগাদা দিতে থাকে। 'কেন আমি নয়'। ওই সব প্ল্যান কেন তিনি ভুতুরিয়া, শরাফ বা কেজরিওয়ালাদের জন্য তৈরি করে দেবেন। তিনি নিজেও তো উদ্যোগ নিতে পারেন। কেন নয়?

জমি দেওয়ার জন্য আছেন রথীন সর আর তাঁর পার্টি। টাকা দেওয়ার জন্য বসে আছে ব্যাঙ্ক। শুধু

জয়পুর আর বিকানীরের লোকেরা কেন কলকাতা লুটেপুটে খাবে? কেন মিত্র, বসু বা চ্যাটার্জি, ব্যানার্জিরা নয়? মনে এই ভাবনা উদয় হতেই কালীতলায় মিত্র কনস্ট্রাকশনের বাড়িটা বানিয়ে ফেলে প্রোজ্জ্বল মিত্র রিয়েল এস্টেট আর প্রোমোটিংয়ের ব্যবসায় নেমে পড়েন। তাঁর কর্মদক্ষতার জন্যই হোক, অথবা রথীন সরের

টাকা।

দাক্ষিণ্যে, মিত্র কনস্ট্রাকশনের বার্ষিক টার্ন ওভার এখন প্রায় পাঁচশো কোটি

'স্যার রথীন সর এসে গেছেন। এই মাত্র গাড়ি থেকে নামলেন।' ইন্টারকমে ফোন করে জানাল রিমিতা। শুনেই চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন প্রোজ্জ্বল মিত্র। লম্বা করিডোর দিয়ে হেঁটে, পৌঁছে গেলেন লিফটের দোর গোড়ায়। ওখান থেকেই রথীন সরকে আপ্যায়ন করে আনবেন। ভদ্রতা দেখানোয় যাতে কোনও ত্রুটি না থাকে। যেন ধারণা না হয়, আর্থিক প্রতিপত্তি হওয়ার জন্য মাথা ঘুরে গেছে। প্রোজ্জ্বল জানেন, এই একটাই মানুষ, যিনি যে কোনও সময় ভাগ্যের চাকা দ্বিগুণ ঘুরিয়ে দিতে পারেন।

মিনিট খানেকের মধ্যেই লিফটের দরজা খুলে গেল। বেরিয়ে এলেন রথীন সর। চারপাশে নজর বুলিয়ে হাসিমুখে বললেন, 'আমার ছেলেরা বলত, আপনার অফিসটা নাকি খুব সুন্দর। কিন্তু এসে তো দেখছি, বিদেশি ব্যাঙ্কগুলোর থেকেও ভালো।'

প্রোজ্জ্বল হাসলেন। ফ্লোরে নানা কিউবকিউলসের মধ্যে, কাজ করতে ব্যস্ত তিরিশ পঁয়ত্রিশ জন কর্মী। সবাই রথীন সরকে চেনে। কাগজে ছবি দেখে, টিভিতে বক্তব্য শোনে। বক্তা হিসাবে ওঁর খুব সুনাম আছে। বয়স প্রায় ষাটের কাছাকাছি। পরনে নিপাট সাদা ধুতি পাঞ্জাবি। দীর্ঘদেহী, ভিড়ের মাঝেও চেনা যায়। করিডোরে পাশাপাশি হেঁটে, খুব খাতির করেই রথীন সরকে নিজের চেম্বারে নিয়ে এলেন প্রোজ্জ্বল।

'কী খাবেন দাদা, ঠাণ্ডা, না গরম।'

'চা হলেই চলবে। স্রেফ লিকার। চিনি যেন না দেয়।' চেয়ারে বসে বললেন রথীন সর।

ইন্টারকমে রিমিতাকে চায়ের নির্দেশ দিয়ে প্রোজ্জ্বল এ বার

বললেন, 'আপনাকে যত দেখি দাদা, [illegible] নিজের ওপর রাগ হয়। এত ছিপছিপে আছেন কী করে?'

রথীন সর হাসলেন, 'কিছুই খাই না। শরীরকে যত দেবেন, শরীর ততই পুঁজি করে রাখবে। এ এক [illegible]চ্ছিরি জিনিস। আপনি তো জানেনই, আমারা পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে।'

'আমিও তো খাওয়া কমিয়ে দিয়েছি দাদা। ডায়েটিং করছি। সকালবেলা লেকের মাঠেও গিয়ে হাঁটছি। কিছুতেই ওজন কমছে না।'

'শরীরের ভেতরের কলকব্জাগুলো ঠিক আছে তো? যদ্দিন, সে সব ঠিকঠাক থাকবে, তদ্দিন ভয়ের কিছু নেই।'

'এখনও পর্যন্ত তো ঠিকঠাক আছে। ক'দিন রাখতে পারব, জানি না।'

'ব্যস, ব্যস। শুধু টেনশনটা কমিয়ে দিন।'

'কমাতে পারছি না দাদা। আপনি তো জানেন, কনস্ট্রাকশন লাইনে টেনশন কী রকম।'

' কেন, আপনার ওই ব্যাপারটা এখনও সলভ্ড হয়নি? অজয়নগরের ছেলেদের ডেকে তো আমি [illegible]লে দিয়েছিলাম, আপনার কনস্ট্রাকশনের ব্যাপারে কেউ যেন বাধা না দেয়। এখনও হুজ্জুতি করছে [illegible]কি?'

'ঠিক সে রকম কিছু নয়। তবে টাকা পয়সা নিয়ে এখনও প্রবলেম করছে।'

শুনে ভ্রুঁ কুচকে রথীন সর বললেন, 'ঠিক আছে, আমি দেখছি। আমার অনুষ্ঠানটা হয়ে যাক।

তারপর ওদের ডেকে পাঠাচ্ছি।'

'আপনার অনুষ্ঠানটা কবে দাদা?'

'এই তো ... ফেব্রুয়ারির থার্ড উইকে। প্রায় এসে গেল। ছেলেরা ধরেছে, বোম্বাই থেকে এ বার হেমা মালিনীকে নিয়ে আসতে হবে। ওঁর নাকি নাচের ট্রুপ আছে। আমার তেমন ইচ্ছে-টিচ্ছে ছিল না। [illegible]কে উনি অন্য পার্টি করেন, তার ওপর শুনলাম দু'ঘণ্টার প্রোগ্রামের জন্য নাকি সাত-আট লাখ টাকা

pathagar.net

নেন। টাকা কি খোলামকুচি নাকি? তবুও ছেলেরা নাছোড়। লাস্ট ইয়ার নাকি করিনা কপুর নেচে গেছিলেন হলদিয়ায়। এ বার আমাদের হেমা মালিনীকে আনতেই হবে। এই টেক্কা দেওয়ার ব্যাপারটাই আমার ভালো লাগে না ভাই।'

রিমিতা চায়ের ট্রে নিয়ে ঢুকেছে। কাপ তুলে দিচ্ছে রথীন সরের হাতে। সে দিকে তাকিয়ে মনে মনে কত হিসাবটা কষে নিলেন প্রোজ্জ্বল। কত খরচা হতে পারে। নাচের প্রোগ্রামের জন্যই শুধু আট লাখ টাকা। তারপর প্লেনে মুম্বই থেকে হেমা মালিনীদের নিয়ে আসার জন্য সব মিলিয়ে লাখ দশেকের ধাক্কা। এই টাকাটা দিতে হবেই। প্লাস, নগদ পাঁচ লাখ, যা নেওয়ার জন্য রথীন সর নিজে এসেছেন। কোনও বিনা কারণে হেমা মালিনীর কথা তোলেননি পার্টির দাদাদের হ্যান্ডেল করার অভিজ্ঞতা আছে প্রোজ্জ্বলের। রথীন সর চাইছেন, হেমা মালিনীকে আনার আগ্রহটা তিনিই দেখান।

ইঙ্গিতটা লুফে নিয়ে প্রোজ্জ্বল বললেন, 'ছেলেদের ব্যাপারে না করবেন না দাদা। হেমা মালিনী ডান্স ট্রুপের নাচ আমি দিল্লির মবলঙ্কর হলে দেখেছি। করিনা কপুরদের মতো ছ্যাবলামি নয়, রীতিমতো ক্লাসিক্যাল নাচ। আপনার কালচারাল ফেস্টিভ্যাল-এ মানানসই। ছেলেদের আপনি বলবেন, আমার সঙ্গে যোগাযোগ করে। খরচ সব আমার।'

চোখে চশমা দিয়ে রথীন সর বললেন, 'ছেলেরা বলছিল, আপনার বোন সাঁঝেলি না কি ভালো গাইতে পারে। সত্যি?'

প্রোজ্জ্বল বললেন, 'আগে তো দক্ষিণীতে সিরিয়াসলি শিখত টিখত। ইদানীং সম্পর্ক আছে বলে মনে হয় না। কেন দাদা?'

'না... মানে মিটিংয়ে কথা হচ্ছিল, তখন ছেলেরা আব্দার করল, সাঁঝেলি মিত্রকে দিয়ে উদ্বোধনী সংগীত গাওয়াতে হবে। ফেস্টিভ্যালের উদ্বোধন করবেন চিফ মিনিস্টার।'

লিলি গাইলে ওই দিন চিফ মিনিস্টারের কাছাকাছি যাওয়ার আরও একবার সুযোগ পাবেন প্রোজ্জ্বল। সেই সুযোগটা নষ্ট করা ঠিক হবে না। মুখটা চিনিয়ে রাখা আর কী। পার্টি সূত্রেই প্রোজ্জ্বল খবর পেয়েছেন, মাস দু'য়েকের মধ্যেই চিফ মিনিস্টার লন্ডন যাবেন অনাবাসী ভারতীয় শিল্পপতিদের সঙ্গে মিটিং করার জন্য।

লগ্নি টানার লক্ষ্যে কলকাতার বেশ কয়েকজন বিজনেসম্যানকে উনি সঙ্গে নিয়ে যাবেন। ওই ডেলিগেশনে ঢুকে পড়তে পারলে প্রেস্টিজ এক লাফে অনেকটা বেড়ে যাবে। ইচ্ছে করলে রথীন সর এই কাজটা করে দিতে পারেন। চিফ মিনিস্টারকে মুখ ফুটে একবার বললেই হল, দু'জনের সম্পর্ক এতটাই ভালো। এই মুহূর্তে ওঁর কোনও অনুরোধই ফেলে দেওয়া চলবে না।

পরক্ষণেই মনে প্রশ্ন জাগল, রথীন সর জানলেন কী করে, লিলি গান গাইতে পারে? লিলি যা নাক উঁচু মেয়ে, তাতে বাইরে কোথাও গান গেয়েছে বলে মনে হয় না। তা হলে? প্রশ্নটা মুখ ফুটে বেরোতেই রথীন সর বললেন, 'আরে... আমার এক কমরেডের স্ত্রীর সঙ্গে নাকি আপনার বোন প্রেসিডেন্সিতে পড়তেন। সেই মেয়েটি থাকে গোবিন্দপুরে। এ দিকে আপনার বোনও তো রোজ ওই গোবিন্দপুরে যায়

একটা এনজিও তে। কী নাম যেন... কেয়ার ফর অ্যানিম্যাল। দু'জনের মধ্যে প্রায়ই দেখা সাক্ষাৎ হয়। সেই কমরেডই মিটিংয়ে ছেলেদের বলেছে, তোরা শ্রেয়া ঘোষালকে নিয়ে লাফালাফি করিস। লেক গার্ডেন্সের আমার এক বন্ধু আছে, সে শ্রেয়া ঘোষালের থেকেও ভালো গায়। আমি তো ভাই, কে

শ্রেয়া ঘোষাল, তাও জানি না। আমাদের সময়ে ছিলেন সন্ধ্যা আর হেমন্ত মুখার্জি। এদের গান এখনও শুনি।'

প্রোজ্জ্বল একটু লজ্জা পাওয়ার ভঙ্গিতেই বললেন, 'আমার বোন লিলি ভালো গায়। তবে খুব মুডি। মেয়েটার অনেক গুণ, তবুও কোনও কিছুতে স্টিক করে থাকে না। দেখুন না দাদা, আমার বিজনেসে ওকে জয়েন করতে বললাম। করল না। পশুপাখি নিয়ে ফালতু সময় নষ্ট করছে আজকাল। আমার সঙ্গেই কদাচিৎ সাক্ষাৎ হয়।'

'ফালতু ব্যাপার কী বলছেন ভাই,' রথীন সর সিরিয়াস, 'বলুন, প্রশংসা করার মতো কাজ। এ দেশে কটা লোক পশুপাখিদের নিয়ে ভাবে বলুন তো? আফটার অল, ওরাও তো ঈশ্বরের সৃষ্টি। আপনাকে বলি, আলিপুরের চিড়িয়াখানার একটা ম্যানেজিং কমিটি আছে। আমি তার মেম্বার। মাসে এক বার করে সেই কমিটির মিটিংয়ের জন্য আমাকে চিড়িয়াখানায় যেতে হয়। ও খানেই আপনার বোনের সঙ্গে আমার আলাপ। কথা বলে দেখেছি, সাঁঝেলি সত্যিকারের অ্যানিম্যাল লাভার। একদিন গেছিলামও, গোবিন্দপুরে ওদের অ্যানিম্যাল হসপিটালে। অ্যারেঞ্জমেন্ট দেখে আমার বেশ ভাল লাগল।'

রথীন সর লিলিকে চেনেন ? এটা একটা খবর প্রোজ্জ্বল মিত্রের কাছে। কই, লিলি তো কোনও দিন কিছু বলেনি। আচ্ছা মেয়ে তো !
রথীন সর চুপ করে আছেন দেখে প্রোজ্জ্বল বললেন, ' ছোটবেলা থেকেই ও ওই রকম দাদা। রাস্তা থেকে কুকুর কুড়িয়ে আনত। নিজের হাতে চান করানো, খাওয়ানো। একবার আমাদের ড্রাইভার পাড়ায় একটা কুকুরকে চাপা দিয়েছিল বলে, কান্নাকাটি করে বোন নিজে খাওয়া দাওয়াই বন্ধ করে দিয়েছিল। ড্রাইভার কেন কুকুরটাকে হসপিটালে নিয়ে গেল না ? ওই স্বভাবটা এখনও ওর যায়নি। কিন্তু, জু-তে গিয়ে ও করছেটা কী দাদা?'

'আন্দোলন। চিড়িয়াখানায় নাকি পশুপাখিদের ঠিক মতো রাখা হয় না। জন্তু জানোয়ারদের ছোট্ট খাঁচায় আটকে রাখা যাবে না। ওদের প্রাকৃতিক পরিবেশে রাখতে হবে। এই সব দাবি আর কী।'

'দাবিগুলো কি ভ্যালিড?'

'কিছু দাবি তো বটেই। আমরাও বুঝতে পারছি, জু আর আলিপুরে রাখা যাবে না। চিফ মিনিস্টারের সঙ্গে আমার কথা হয়ে গেছে। ভগবানপুরে প্রায় আড়াইশো একরের একটা জমি দেখে রেখেছি। ওখানে একটা বায়ো ইকোলজিকাল পার্ক করার কথা ভাবছি। টাকা পয়সা দেবে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট। দু'হাজার নয় সালের মধ্যে, আলিপুর থেকে পুরো চিড়িয়াখানাটা আমার জেলায় তুলে নিয়ে যাব।'

দরজা খুলে ভেতরে এসে দাঁড়িয়েছে রিমিতা। ওর হাতে একটা অ্যাটাচি কেস। যাক, পাঁচ লাখ টাকার ব্যবস্থাটা তা হলে হয়ে গেছে। ইঙ্গিতে অ্যাটাচি কেসটা টেবলের ওপর রাখতে বললেন প্রোজ্জ্বল। ঠিক তখনই মাথায় দ্রুত একটা প্রশ্ন খেলে গেল। রথীন সরকে সরাসরি জিজ্ঞেস করলেন তিনি, 'চিড়িয়াখানা শিফট হয়ে যাওয়ার পর অলিপুরের ওই জায়গাটার কী হবে দাদা।?'

'হাউজিং আর শপিং কমপ্লেক্স। চিফ মিনিস্টার অবশ্য চাইছেন, জায়গাটা পাখিরালয়ের জন্য রাখা থাক। কেউ মাথায় ঢুকিয়েছে আর কী। কিন্তু ওঁকে বোঝাতে হবে, শুধু পাখির জন্য অতটা জায়গা নষ্ট করার কোনও মানেই হয় না। অবভিয়াসলি। প্রায় পঁয়তাল্লিশ একর প্রাইম ল্যান্ড। হাউজিং হলে, আন্দাজ করতে পারছেন, কী ধরনের ডিমান্ড হবে?'

'কেন আপনি কি ইন্টারেস্টেড?'

লোভে চকচক করে উঠল প্রোজ্জ্বল মিত্রের মুখ। তবুও নিজেকে সংযত করে তিনি বললেন, 'কী যে বলেন দাদা, হাজার-দেড় হাজার কোটি টাকার প্রোজেক্ট। আমাদের কপালে কি আর জুটবে?'

রথীন সর উৎসাহ দিলেন, 'অসুবিধে তো কিছু নেই। সরকারের সঙ্গে জয়েন্ট ভেঞ্চারে নামুন। জমিটা পেয়ে যাবেন। বাকি খরচ আপনার। প্রবলেম কোথায়? ব্যাঙ্ক লোন নেবেন। প্রফিটের একটা পারসেন্টেজ সরকারকে দেবেন। কী রাজি? তবে একটা কাজ কিন্তুগোপনে আপনাকে করে যেতে হবে।'

'কী দাদা?'

'যতটা সম্ভব পারেন, আপনার বোনের আন্দোলন সাপোর্ট করে যান। চিড়িয়াখানাটা আলিপুরে রাখার বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলুন। তা হলে আমার পক্ষে চিফ মিনিস্টারকে কনভিন্স করা সহজ হবে। গোপনে সাঁঝেলিদের এনজি-ও,কে টাকা দিন। কেন দিচ্ছেন, যেন কেউ আন্দাজ করত না পারে। কথাটা মনে থাকে যেন ভাই। আচ্ছা, তা হলে উঠি। দেখুন, ছেলেদের আবদার রাখতে পারেন কী না।'

কথাগুলো বলেই রথীন সর উঠে দাঁড়ালেন। টাকা ভর্তি অ্যাটাচি কেসটা হাতে ঝুলিয়ে।

রাত আটটার সময় বাড়ি ফিরে সাঁঝেলি শুনল, মা খুব রেগে আছে। কথাটা ও শুনল শোনপুরির মুখ থেকে। ওদের বাড়িতে চার পাঁচজন কাজের লোক। মা ওর জন্য বরাদ্দ করেছে শোনপুরিকে। বয়স সতেরো-আঠারো, কিন্তু ইতিমধ্যে মেয়েটার বিয়ে হয়ে গেছে। ওর আসল নাম অনেকেই জানে না। সাঁঝেলি জানত, তবে ভুলে গেছে। শোনপুরির বর বিহারের শোনপুরের ছেলে। তাই বস্তিতে ওর নাম হয়ে গেছে শোনপুরি। ক্লাস সেভেন অবধি পড়াশোনা করেছিল। সাঁঝেলির টুকটাক কাজ করতে পারে। কেউ ফোন করলে, নম্বর জিজ্ঞেস করে টুকে রাখতে পারে। বাইরে থেকে ঠিকঠাক জেরক্স করে আনতে পারে। সারদিন টুকি আর টাকির দেখাশুনা করে, নানা কাজে ব্যস্ত থাকে। ওর কাছ থেকে বাড়ির সব খবর পায় সাঁঝেলি।

পোশাক বদলানোর ফাঁকে সাঁঝোলি জিজ্ঞেস করল, 'মা কখন ফিরেছে রে?'

'বেলা দেড়টা নাগাদ।' শোনপুরি বলল, 'তুমি বেইরে যাওয়ার ঠিক দশ মিনিট পর।'

সাঁঝেলি ধমক দিল, 'আবার বলছিস, বেইরে যাওয়ার পর। তোকে বলেছি না, ওইসব ভাষা এ বাড়িতে ব্যবহার করবি না?'

'কী করব দিদিমণি, মুখথেকে বেইরে যায়। মনে থাকে না।'

রাগ করতে গিয়ে সাঁঝেলি হেসে ফেলল। সোফার ওপর স্কার্ট আর টপটা খুলে ফেলে ও চট করে ম্যাক্সি গলিয়ে নিল। ওর ঘরে এখন আর কেউ আসবে না। ওপরের ঘরে মা সিরিয়াল দেখতে বসে গেছে। বাংলা আর হিন্দি সিরিয়াল মিলিয়ে মিশিয়ে দেখে। উঠবে সাড়ে ন'টার পর। বাবা চেম্বারে রোগীদের নিয়ে ব্যস্ত। টুকি আর টাকিও ঘুমিয়ে পড়েছে। সাঁঝেলি নিশ্চিন্ত, ঘণ্টা দেড়েক এখনও যা ইচ্ছে, তাই করতে পারে। মা নীচে নামার আগেই ও ঘরের আলো নিভিয়ে দেবে। যাতে মায়ের ধারণা হয়, ও ঘুমিয়ে পড়েছে। তখন আর

pathagar.net

বকাবকি করতে পারবে না। রাত দশটায় অ্যানিম্যাল প্ল্যানেট চ্যানেলে ভালো একটা প্রোগ্রাম ছিল পেট অ্যানিম্যালদের নিয়ে। মাঝখান থেকে সেটা দেখা হবে না। এটা ভেবেই একটু বিরক্ত হল সাঁঝেলি। ধুত, এর থেকে পশুপাখি হয়ে জন্মানো অনেক বেটার ছিল। ওদের জগতে বাবা-মায়েরা অন্তত এত খবরদারি করে না। একটু বড় হয়ে গেলে, সন্তানদের আর কোনও খোঁজই রাখে না। ততদিনই নিজের কাছে রাখে, যতদিন তার সন্তান নিজের খাবার নিজে সংগ্রহ করতে না পারে।

'দিদিমণি কিছু খাবে?' শোনপুরি জানতে চাইল।

সাঁঝেলি বলল, 'দ্যাখ তো, কিচেনে শশা আর ঠাণ্ডা টক দই আছে কী না। থাকলে নিয়ে আয়। আর দু'টো টোস্ট। রাতে আর কিছু খাব না।'

খাওয়ার ব্যাপারে সাঁঝেলি ভীষণ খুঁতখুতে। ও মাছ, মাংস, ডিম খায় না। এ সব খাওয়া মানে আরেকটা প্রাণী হত্যা করা। আরও একটা কারণ আছে। যারা নিরামিষ খায়, তারা অনেক বেশি সুস্থ থাকে। অনেক বেশি দিন বাঁচে। শুধু মানুষই নয়, গোটা প্রাণীজগতে এর নজির সর্বত্র। কারমেল স্কুলে ক্লাস সিক্সে পড়ার সময়, পিকনিকে এক বার সাঁঝেলি মুরগি কাটতে দেখেছিল। কাজটা ওর কাছে খুব নিষ্ঠুর বলে মনে হয়েছিল। তার পর থেকেই ও মাছ-মাংস খাওয়া ছেড়ে দেয়।

শোনপুরি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার পরই সাঁঝেলি টিভি-র রিমোট কন্ট্রোল হাতে তুলে নিল।

চ্যানেল সার্ফ করার সময় ও চমকে উঠল পর্দায় একটা ছবি দেখে। রেল লাইনের ধারে ঝোপের কাছে একটা হাতি পড়ে রয়েছে। ট্রেনে

ধাক্কা খেয়েছে নিশ্চয়ই। সম্ভবত বেঁচে নেই। সাইজ দেখে মনে হচ্ছে না, হাতিটার খুব বেশি বয়স হয়েছিল। এক বা দেড় বছরের বেশি তো নয়ই। সত্যি কী নির্মম ট্রেনের ওই ড্রাইভারগুলো। ওরা কি অন্ধ? চোখ বুজে ট্রেন চালায়? হাতি তো আর কাঠবেড়ালি নয়, যে কখন লাইনের ওপর দিয়ে যাচ্ছে, দেখতে পাবে না?

প্লেটে শশার টুকরো আর টক দই এনে দিয়েছে শোনপুরি। এমন সময় সাগ্নিক ঘরে ঢুকল। 'আয় বোস, একটু পরেই ভালো একটা প্রোগ্রাম আছে' বলে সাঁঝেলি টিভির পর্দায় চোখ রাখল। অ্যানিম্যাল প্ল্যানেটে পাইথন নিয়ে একটা প্রোগ্রাম দেখাচ্ছে। মন দিয়ে দু'জনে সেটা দেখতে লাগল। খুব ছোটবেলায় জন্মদিনে বাবা ওকে একটা বই উপহার দিয়েছিল। জীবজন্তুদের নিয়ে লেখা একটা গল্পের বই। কতবার যে ও বইটা পড়েছে, তার ইয়ত্তা নেই। এখনও লেখকের নাম ওর মনে আছে। রিচার্ড ম্যাককুইন।

ক্লাস টেন পর্যন্ত রিচার্ড ম্যাককুইনই ছিলেন সাঁঝেলির আইডল। কিন্তু অ্যানিম্যাল প্ল্যানেটে স্টিভের কাণ্ডকারখানা দেখার পর থেকে আইডল পাল্টে গেছে সাঁঝেলি। ওর জীবনে আর একটা প্রিয় জিনিস ছিল গান। সবাই বলত, গান গেয়ে একদিন নাকি ও খুব নাম করবে। ইচ্ছেও ছিল তাই। কিন্তু গানের জগতে যা রাজনীতি, বিরক্ত হয়েই সাঁঝেলি একটা সময় গান গাওয়া ছেড়ে দেয়।

টিভি দেখতে দেখতেই খাওয়া শেষ করে ফেলল সাঁঝেলি। খালি প্লেট শোনপুরির দিকে এগিয়ে দেওয়ার সময় ওর মোবাইল ফোনটা হঠাৎ বেজে উঠল। টেবল থেকে হাত বাড়িয়ে ফোনটা নিয়ে সুইচ অন করতেই 'বলুন আশিসদা।'

'একটা ভালো খবর আছে সাঁঝেলি। পুলিশ থেকে ওরা চিঠি পাঠিয়েছে। এই মাত্র পেলাম। আমাদের টার্মস-এ ওরা রাজি হয়ে গেছে।'

শুনে সাঁঝেলি উচ্ছ্বসিত, 'বাঃ, দারুণ খবর। ঘোড়াগুলো ওরা কবে থেকে পাঠাবে?'

'আমাদের স্টেবল তৈরি হতে আর দিন সাতেক লাগবে। তার পরই ওদের গ্রিন সিগনাল দেব। তোমার মাথা থেকেই আইডিয়াটা প্রথম এসেছিল। তাই সবার আগে তোমাকেই খবরটা দিলাম।'

'থ্যাঙ্ক ইউ আশিসদা। আপনি অনেকদিন বাঁচবেন। এই মাত্র আপনাকে ফোন করতে যাচ্ছিলাম।'

'কী বললে? অনেকদিন বাঁচব? আমার তা মনে হয় না।' একটু চুপ করে থেকে আশিসদা ফের বললেন, 'যাক গে, কী জন্য ফোন করতে চাইছিলে বল।'

'ডুয়ার্সে ফের একটা হাতি ট্রেনের ধাক্কায়...'

'খবরটা আমিও পেয়েছি। একটা কিছু করা দরকার। শিলিগুড়িতে অনিমেষকে আমি ফোন করেছিলাম। অনিমেষ বসু, তুমি তো চেনো ওকে। ওই যে, হিমালয় নেচার অ্যান্ড অ্যাডভেঞ্চার ফাউন্ডেশন-এর সেক্রেটারি। ওকে বলেছি, ডুয়ার্সে গিয়ে একবার সব দেখে এসে রোববারের মধ্যেই আমাকে একটা রিপোর্ট দিতে। তারপর ভেবে চিন্তে সবাই মিলে একটা ডিসিশন নেওয়া যাবে। আচ্ছা, গুড নাইট। ছাড়ছি। কাল গোবিন্দপুরে একবার এস তা হলে।'

টিভির খবরটা শুনে মেজাজ খিঁচড়ে গেছিল। আশিসদার খবরটা পেয়ে মন ফের চাঙ্গা হয়ে গেল সাঁঝেলির। মাস ছয়েক আগে কাগজে ও একটা খবর পড়েছিল, পুলিশে যে সব ঘোড়া কাজ করে, অবসর নেওয়ার পর নাকি তাদের গুলি করে মেরে ফেলা হয়। খবরটা পড়ে সাঁঝেলির খুব খারাপ লেগেছিল। মানুষ যদি রিটায়ার করার পর বেঁচে থাকতে পারে, তা হলে ঘোড়াদেরও সেই অধিকার আছে। পুলিশ ডিপার্টমেন্ট থেকে রিটায়ার করার পর ওরাই বা পেনশন পাবে

না কেন মানুষের মতো ?
আশিসদার সঙ্গে এ নিয়ে আলোচনা করেছিল সাঁঝেলি।

এর পর কলকাতার মাউন্টেড পুলিশের কাছে ওরা একটা চিঠি পাঠায়। ওরা মানে ওদের সংস্থা কেয়ার ফর অ্যানিম্যালস। ওরা লিখেছিল, গোবিন্দপুরে আমাদের প্রচুর জায়গা রয়েছে। সেখানে রিটায়ার্ড ঘোড়াদের জন্য আমরা একটা স্টেবল বানিয়ে দেব। বৃদ্ধাবাসের মতো আর কী। ঘোড়াদের যত্ন আত্তির কোনও ত্রুটি হবে না। যতদিন বাঁচবে খুব আরামেই থাকবে। তবে ওদের জন্য পেনশন বরাদ্দ করতে হবে।

ঘোড়া পিছু ওরা কত টাকা পেনশন দিতে রাজি হয়েছে, ইস, আশিসদার কাছে সেটাই জানা হল না। কাল জেনে নিতে হবে। টাকার পরিমাণটা যা-ই হোক না কেন, সাঁঝেলির মন খুশিতে ভরে উঠল এই ভেবে যে, ঘোড়াদের জন্য শেষ পর্যন্ত ওরা পেনশন আদায় করতে পেরেছে। এবং সেটা দিচ্ছে একটা সরকারি দফতর। এটা একটা নজির হয়ে রইল। পরে কুকুর বা অন্য প্রাণীদের জন্যও আদায় করা যেতে পারে। নিশ্চিন্তে ও মন দিল টিভি-র পর্দায়।

'তোর ব্যাপারটা কী বল তো লিলি?'

মায়ের গলা শুনে বিপদ গুনল সাঁঝেলি। সিরিয়াল দেখা ছেড়ে কখন ঘরে ঢুকে এসেছে, ও টেরও পায়নি। বলল, 'কিছু বলবে?'

'বলব মানে ? সারাটা জীবন তুই কি নিজের ইচ্ছেতেই চলবি? গাড়ি নিয়ে বেরুসনি। আজ নাকি বাসে করে কোথায় গেছিস ? সন্ধেবেলায় কতক্ষণ তোর জন্য বসে রইল সাগ্নিক। ওর সঙ্গে কোথায় যাবি, তুই নাকি কথা দিয়েছিলি।'

ইস, সাগ্নিকের সঙ্গে সাউথ সিটির শপিং মল-এ যাওয়ার কথা ছিল। প্যান্টালুন থেকে ওকে কিছু কিনে দেওয়ার ইচ্ছে ছিল সাঁঝেলির। ইস, বেচারির কথা মাথা থেকে হারিয়ে গেছিল। ঈষৎ নরম হয়ে ও বলল, 'একদম মনে ছিল না মা। একটা ব্যাপারে ফেঁসে গেছিলাম চিড়িয়াখানায়। কাল সকালেই ওকে সাউথ সিটি-তে নিয়ে যাব। ভাই, তুই কিছু মনে করিস না রে।'

'শোন, যে কথা বলার জন্য তোর কাছে এলাম। তোর দাদা তোকে অনেক বার ফোন করেছিল। পায়নি। ফোনটা বন্ধ করে রেখেছিলিস নাকি? সাড়ে ন'টার সময় ও এ বাড়িতে আসছে। এখানে আজ ডিনার করবে। তোকে না কি খুব দরকার।'

দাদার দরকার। শুনে সাঁঝেলি একটু অবাক হল। কী দরকার থাকতে পারে দাদার? বউদি দাদাকে ছেড়ে চলে যাওয়ার পর থেকে, ও দাদার বালিগঞ্জ প্লেসের বাড়িতে খুব কম দিনই গেছে। পারতপক্ষে দাদাকে ও এড়িয়ে চলে। যে লোক শুধু টাকা পয়সা রোজগারকেই জীবনের মূলমন্ত্র বলে মনে করে, তার সঙ্গে কথা বলার কোনও ইচ্ছে নেই সাঁঝেলির। বউদি অ্যাক্টিং কেরিয়ার গড়তে চেয়েছিল। চাইতেই পারে। প্রত্যেক মানুষেরই অধিকার আছে নিজস্ব পেশা বেছে নেওয়ার। দাদা রাজি হয়নি। এই নিয়েই বউদির সঙ্গে অশান্তি। সাঁঝেলি অবশ্য মনে করে, বউদি যদি সুযোগ পায়, তা হলে ভালো

অ্যাকট্রেস হতে পারবে। ও খুব উৎসাহ দেয়। মায়েরও যে খুব আপত্তি আছে, তা নয়। বউদির সঙ্গে সাঁঝেলি নিয়মিত যোগাযোগ রাখে। মাঝে বউদি একদিন বলল, মুম্বই যাচ্ছে অডিশন দিতে। একতা কপুরের প্রোডাকশনে।

মাকে চটানোর জন্যই সাঁঝেলি বলল, 'আমি কিন্তু কিছু খাব না মা। ডাইনিং টেবলে জোরজার কোরো না। যা খাওয়ার খেয়ে নিয়েছি। দাদা এলে আমাকে ডেকে নিও। আর কিছু বলবে?'

' চেহারাটার কি অবস্থা করেছিস লিলি, আয়নায় একবার দেখেছিস। না খেয়ে খেয়ে তো একদিন শেষ হয়ে যাবি। দুপুরে তোর মাসিমণি আমাকে বলছিল, লিলির দিকে তোরা একটু নজর দে দিদি। ও তো এখন পাখির খাবার খেতে শুরু করেছে।'

'তোমার এই অ্যাডভাইস অনেকদিন শুনেছি। প্লিজ মা, রিপিট কোরো না। আমাকে আমার মতো থাকতে দাও।' কথাটা বলেই সোফায় গা এলিয়ে দিয়ে সাঁঝেলি ফের চ্যানেল সার্ফ করতে লাগল।

' তোর যা ইচ্ছে কর মা। আমি আর কোনও কথা বলব না।' রাগ করে মা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। হাঁটা চলার সময় আজকাল মা হাঁসফাঁস করে। শরীরে ওজন এত বেড়ে গেছে। তবুও স্বাস্থ্যসচেতন হবে না। দাদাটাও মায়ের মতো হয়ে যাচ্ছে। অথচ কলেজে পড়ার সময় টেনিস চ্যাম্পিয়ন ছিল। টিভির পর্দায় চোখ রাখল বটে, সাঁঝেলি কিন্তু মন বসাতে পরল না। দাদা অনেকদিন ধরেই ওর বিজনেসে জয়েন করতে বলছে। একবার ওখানে ঢুকে গেলে, সাঁঝেলি জানে, ও আর ওদের অর্গানাইজেশনের ছাড়া আর কোনও কাজে সময় দিতে পারবে না। ওর লেখাপড়া, এত দিন ধরে পুষে রাখা স্বপ্ন, সব

জলাঞ্জলি দিতে হবে। তাই নিজের খরচ চালানোর জন্য ও এখন একটা কলেজে পার্ট টাইম পড়ায়।

'দিদিভাই, একটা প্রশ্ন করব?'

সাগ্নিকের প্রশ্নটা শুনে সাঁঝেলি ফিরে তাকাল। ও যে ঘরে বসে আছে, সে কথা ভুলেই গেছিল সাঁঝেলি। আহা রে, ওর মুখটা দেখে খুব মায়া লাগল। কপালে উপচে পড়া চুল, চোখে চশমা। বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা। টিভি দেখতে দেখতে বোধহয় আবার কিছু ওর মাথায় খেলে গেছে। উঠে গিয়ে আদর করার

pathagar.net

ভঙ্গিতে ওর মাথার চুল ঘেঁটে দিয়ে সাঁঝেলি বলল, 'এত কিন্তু কিন্তু করছিস কেন ভাই? কী বলবি বল।'

'এই যে একটু আগে তুমি কাকে যেন ঘোড়াদের কথা বলছিলে। ঘোড়ারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমোয় কেন দিদিভাই?'

উত্তরটা সাঁঝেলির জানা। কিন্তু কী করে দশ বছরের একটা বাচ্চাকে ও বোঝাবে, সেটা ঠিক করতে পারল না। তবুও বলল, 'ঘোড়াদের শরীরটা ভগবান একটু অন্যভাবে তৈরি করেছেন ভাই। ঘুমোনোর সময় ওদের শরীরের মাসল্‌গুলো পুরো রিল্যাক্সড অবস্থায় থাকে, তখন ওদের পায়ের হাড় আর লিগামেন্টগুলো ইন্টারলকড হয়ে যায়। ফলে শরীরের ওজন পায়ের ওপর পড়ে না। ঘুমোনোর সময় ওদের শুয়ে না পড়লেও চলে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই ওরা আরাম করে ঘুমোতে পারে।'

'ওদের এই অভ্যাসটা কেন হল দিদিভাই?'

'তার কারণ, ঘোড়ারা আদতে ছিল বন্যপ্রাণী। বনে থাকার সময় ওদের থেকেও শক্তিশালী প্রাণীরা, [illegible] ধর, বাঘ-সিংহ, ওদের শিকার করে খেত। বাঘ-সিংহের হাত থেকে, নিজেদের বাঁচাবে কী করে ঘোড়ারা? বাঁচার উপায়, একমাত্র ওদের স্পিড। দৌড়ে ওদের সঙ্গে পারা মুশকিল। আত্মরক্ষা করার জন্যই ঘোড়ারা সবসময় দাঁড়িয়ে থাকত। যাতে কেউ আক্রমণ করলে, চট করে দৌড়তে পারে। কিছু বুঝলি ভাই, নাকি আবার বলব?'

'[illegible] বুঝেছি।'

'শোন, তুই আরেকটা যে প্রশ্ন করেছিলি, সেই যে রে, পাখিরা ঘামে কী না, তার উত্তরটা কাল জেনে তোকে বলব, কেমন। এখন যা, ঘুমোতে যা। ঘোড়াদের মতো ঘুমোস না যেন?'

কথাটা শুনে খুব মজা পেল সাগ্নিক। সোফা থেকে উঠে

হাই তুলে, ঘর থেকে ও বেরিয়ে গেল। হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে সাঁঝেলি দেখল ন'টা বাজে। তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু দাদার জন্য জেগে থাকতে হবে। টিভি-টা বন্ধ করে, সোফা ছেড়ে ও উঠে পড়ল। করার কিছু নেই। এই সময়টাতেই ওর খুব বিরক্তি লাগে। কখনও-সখনও বন্ধুদের ও ফোন করে জ্বালায়। ফোন করার জন্য বেস্ট লোক হল, নন্দিনী। এতক্ষণে অফিস থেকে নিশ্চয়ই বাড়ি ফিরে এসেছে। নন্দিনীর নামটা মনে পড়ার পরই ও তড়াং করে উঠে বসল। এই রে, আজকেই ওর জন্মদিনে নন্দিনী ওকে নেমন্তন্ন করেছিল। এও বলেছিল, ডিনারে অর্ক আসবে। ইস, একদম ভুলে মেরে দিয়েছে। নন্দিনীটা কী ভাববে? ফোন করলে এখন গালাগাল দেবে। পরে একটা অজুহাত দিয়ে দিলেই হবে ওকে। তার চেয়ে বরং শুভশ্রীকে ফোন করা যাক। অনেকদিন ওর সঙ্গে যোগাযোগ নেই। কেমন আছে কে জানে?

সেট-এ শুভশ্রীর নামটা বের করে সাঁঝেলি সুইচ টিপল। অনেকক্ষণ রিং হওয়ার পর, হাঁফাতে হাঁফাতে এসে ধরল শুভশ্রী। গলাটা চিনতে পেরে বলল, 'লিলি তুই। এতদিন ভাবতাম, কোনও পোকা- মাকড় বা জীবজন্তুর কামড়ে তুই খুব শিগ্গির মারা যাবি। এখন দেখছি, তা হবে না। অনেকদিন বাঁচবি রে।'

'হঠাৎ তোর ধারণাটা বদলাল কেন?'

'আরে, কত্তার সঙ্গে আজ দুপুরে লাঞ্চ করতে গেছিলাম তাজ বেঙ্গলে। ওদের কোম্পানির বিরাট একটা পার্টি ছিল। বোম্বে থেকে বিপাশা বাসুকে নিয়ে এসে ওদের কোম্পানি নতুন একটা প্রোডাক্ট লঞ্চ করল। পার্টিতে অ্যাটেনড করার জন্য বিপাশা বাসুকে কত টাকা নিয়েছে জানিস। কুড়ি লাখ টাকা। কী রোজগার ওদের বল তো? ওই তো চেহারা ছিরি। পার্টিতে কত্তাকে আমি বললামও, বিপাশার বদলে তোমরা সাঁঝেলিকে দিয়ে ব্র্যান্ডিং করালে না কেন? অত টাকাও লাগত না। লোকে তাকিয়ে থাকত।

শুভশ্রীর এই এক দোষ। আসল কথাটা বলতে-বলতে বড্ড বেলাইনে চলে যায়। কিন্তু মেয়েটার

মন খুব ভালো। বরটাও পেয়েছে মনের মতো। মার্কেটিং এক্সিকিউটিভ। শুভশ্রীর শ্বশুরবাড়িতেও সাঁঝেলি বেশ কয়েকবার গেছে। ওদের বাড়িতে দু'টো গোল্ডেন রিট্রিভার আছে। কুকুর দু'টোর খুব যত্ন নেয় শুভশ্রীর বর সুমন্ত্র। সেই কারণে সুমন্ত্রকে খুব পছন্দ করে সাঁঝেলি। শুভশ্রীকে লাইনে ফেরানোর জন্য ও বলে উঠল, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে। আমি কেন অনেকদিন বাঁচব, সেটা আগে বল।'

'আরে, সেটাই তো বলতে যাচ্ছিলাম। কত্তার সঙ্গে তাজ বেঙ্গল থেকে বেরোচ্ছি। হঠাৎ ও বলল, যার কথা একটু আগে তুমি বলছিলে, বাঁ দিকে তাকিয়ে দেখ, সে দাঁড়িয়ে আছে। বাঁ দিকে তাকিয়ে আমি তো কাউকেই চিনতে পারলাম না। কী ভিড়। রাজ্যের লোক রাস্তায় গিজগিজ করছে। এত লোক কোত্থেকে আসে বল তো ভাই। চিড়িয়াখানায় কী এমন আছে, যা দেখতে এত লোক আসে? তোর মনে আছে, স্কুল থেকে একবার মিসেস ডি'সুজা আমাদের চিড়িয়াখানায় নিয়ে গেছিলেন?'

শুভশ্রী ফের বেলাইনে চলে যাচ্ছে দেখে সাঁঝেলি ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'সুমন্ত্র কাছাকাছি আছে? ওকে ফোনটা দেতো। আসল কথাটা তা হলে ওর কাছে শুনে নেব।'

'রাগছিস কেন ভাই। শোন না, তোকে আজ দেখলাম। গাড়ি থামিয়ে আমার কত্তাই তোকে দেখাল। একটা পিঙ্ক কালারের স্কার্ট পরেছিলি, তাই না? দারুণ দেখাচ্ছিল রে তোকে। বিয়ে থা করিসনি। ফিগারটাও ভালো রেখেছিস। লেক গার্ডেন্সের বাড়িতে আমার কত স্কার্ট আর সালোয়ার কামিজ পড়ে আছে, অথচ এখানে শ্বশুরবাড়িতে পরার জো নেই।'

সাঁঝেলি বলল, 'চিড়িয়াখানার সামনে গাড়িই যখন থামালি, তখন আমায় তুলে নিলি না কেন?'

'আরে... তখন তো কত্তার সঙ্গে আমার তর্ক লেগে গেল। তোর পাশে একটা ছেলে দাঁড়িয়ে ছিল। ও বলে কী না, তোর বয়ফ্রেন্ড। আমি বললাম, হতেই পারে না। লিলি প্রেম করবে, অথচ আমরা জানতে পারব না, তা কখনই হবে না। জানিস, বললামও, লিলি আমাদের মতো মেয়ে নয়। দরকার হলে ও শিম্পাজির সঙ্গে প্রেম করবে, কখনই কোনও ইয়ংম্যানের সঙ্গে নয়। সত্যি করে বল তো, কে ওই ছেলেটা? তোর বয়ফ্রেন্ড হয় নাকি? খুব হ্যান্ডসাম কিন্তু। তোর সঙ্গে ভালো মানাবে। প্লিজ, তুই কিন্তু হ্যাঁ বলিস না। তা হলে কত্তার কাছে আমার প্রেস্টিজ থাকবে না।'

শুভশ্রীর কথা শুনে হাসবে, না কাঁদবে, সাঁঝেলি বুঝে উঠতে পারল না। ও উত্তর দেওয়ার আগেই দেখল, দাদা দরজার সামনে দাঁড়িয়েছে। বলছে, 'বোন একবার ডাইনিং টেবলে আয় তো, কথা আছে।'

pathagar.net

৬

'কনগ্র্যাটস অর্ক, চিড়িয়াখানার খবরটা ভালো করেছিস।'

রিপোর্টার্স রুমে ঢুকতেই বলল নন্দিনী। 'থ্যাঙ্কস' বলে অর্ক নিজের সিটে গিয়ে বসল। ঘরে আরও কয়েকজন রিপোর্টার রয়েছে। কমলেন্দু, দেবদূত, সুমিত। কেউ কিন্তু কিছু বলল না। সুমিত খবরের কাগজ পড়তে ব্যস্ত। কমলেন্দু কাকে যেন ফোন করছে উল্টো দিকে মুখ ফিরিয়ে। দেবদূত টিভির সামনে বসে মন দিয়ে নিউজ দেখছে। আসলে হিংসেতে সব জ্বলছে। দেখে অর্কর হাসি পেল। কেউ ভালো খবর করলে অর্ক আগে তাকে কনগ্র্যাচুলেশনস জানাত। কিন্তু পাল্টা কেউ জানায় না বলে, অর্ক এখন কোনও আগ্রহই দেখায় না। অন্যরা কেউ ভালো খবর করলে মনে মনে প্রশংসা করে।

'খবরটা ফলো আপ করবি না? দিব্যদা কিন্তু করতে বলবে।' নন্দিনী ইচ্ছে করেই বলতে লাগল। 'তোর খবরটা এক্সক্লুসিভ হয়ে গেছে রে। বাড়িতে আজ বাবা বলছিল, তোদের কাগজে এই একটাই রিপোর্টার আছে। বাকিগুলো বোগাস।'

কথাগুলো কমলেন্দুদের ঠেস দিয়ে বলল নন্দিনী। টিভির সাংবাদিকরা অনেক দক্ষ, ওরা নিউজ ব্রেক করে, আর খবরের কাগজের সাংবাদিকরা সেই নিউজ স্রেফ ফলো আপ করে— ইদানীং এ রকম একটা বিতর্ক আছে মিডিয়া মহলে। কথাটা অবশ্য পুরোপুরি মিথ্যেও নয়। কিন্তু অর্কর খুব রাগ ধরে, যখন দেখে, নতুন খবর বের করার চেষ্টা না করে কমলেন্দু-সুমিতরা সব সময় টিভির সামনে বসে থাকে। নন্দিনীকে ও বলল 'তুই ঠিকই বলেছিস। অন্য কোনও কাগজ বা টিভি চ্যানেল খবরটা পায়নি। দেখবি, আজ ডেফিনিটলি টিভি চ্যানেলগুলো ঝাঁপাবে। স্টার আনন্দের ঋতব্রত আজ সকালে আমার মোবাইলে ফোন করেছিল। সাঁঝেলি মিত্রর কনট্যাক্ট নাম্বারটা চাইছিল

'তুই দিলি নাকি?'

' কেন দেব না? টিভির একজন রিপোর্টার আমার কাছে

সাহায্য চাইছে। করা উচিত। একটা জিনিস তো আমি প্রমাণ করে দিলাম, ব্রেকিং নিউজ শুধু চ্যানেলের রিপোর্টারই করে না, ইচ্ছে করলে প্রিন্ট মিডিয়ার লোকেরাও করতে পারে।'

নন্দিনী প্রসঙ্গ ঘোরাল, 'হ্যারে , সাঁঝেলি মিত্তিরকে কি তুই আগে থেকে চিনতিস? ওর সঙ্গে তোর আলাপ হল কী করে রে?'

'টপ সিক্রেট, তোকে বলা যাবে না।'

' এই ঢপ মারবি না তো।' ড্রয়ার থেকে অরবিটের প্যাকেট বের করে একটা চুইং গাম মুখে ফেলল নন্দিনী। তার পর চিবোতে চিবোতে বলল, 'আমরা কারমেলে এক ক্লাসে পড়তাম। তোর সঙ্গে আলাপ থাকলে, কয়েকদিন আগে নিশ্চয়ই তোর সম্পর্কে ডিটেলে আমাকে জিজ্ঞেস করত না।'

ধরা পড়ে গিয়ে অর্ক হেসে বলল, 'মেয়েটা কী রকম রে?'

' কেন, প্রেম করবি নাকি? আমার আগেই সন্দেহ হয়েছিল। চেষ্টা করিস না। ছোটবেলা থেকেই আমরা জানি, ও যদি কারও সঙ্গে প্রেম করে, তো তাকে হতে হবে এনডেনজার্ড স্পিসিস। হয় শিম্পাঞ্জি, না হয় ওরাং ওটাং। তুই নিশ্চয়ই এই প্রজাতিগুলোর মধ্যে পড়িস না।'

শুনে অর্ক হাসতে লাগল। বলল, 'ঠিক বলেছিস। ও যে কী ধরনের অ্যানিম্যাল লাভার, তার নমুনা
...। সঙ্গে পরিচয় হওয়ার দিনই আমি পেয়ে গেছি।'

অফিসের ভেতর সিগারেট খাওয়া বারণ হয়ে গেছে। বারবার রাস্তায় গিয়ে ধূমপান করার মেয়ে ...দনী নয়। বরের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে যাওয়ার পর ইদানীং ওর সিগারেট খাওয়াটা বেড়ে গেছিল। ...ণ করলেও শুনত না। অর্কই ওকে পরামর্শ দেয়, অফিসের ভেতর সিগারেটের বদলে চুইংগাম খা।

একদম থাকতে পারবি না, তখন অফিসের বাইরে যাস। মনে হয়, ওর পরামর্শটা নন্দিনী নিয়েছে।

নন্দিনী চুইংগাম চিবোতে চিবোতে বলল, 'স্কুলে সাঁঝেলিকে আমরা ডাকতাম পিপি বলে। মানে... পশুপ্রেমী। আমার ওপর একবার ও প্রচণ্ড রেগে গেছিল। কেন জানিস?'

'কেন রে?'

'পাড়ায় কুকুরের অত্যাচার বন্ধ করার জন্য আমার বাবা ডগ ক্যাচিং স্কোয়াডকে ডেকেছিল বলে। একটা বই নিতে সেদিনই ও আমাদের বাড়িতে এসেছিল। বাপস, পাড়ার লোক একদিকে, অন্যদিকে পিপি। কিছুতেই কুকুর ধরতে দেবে না। কান্নাকাটি শুরু করে দিয়েছিল। বাবা তখনও মিনিস্টার হয়নি।

ওর কান্না দেখে বাবার কী মনে হল, শেষ পর্যন্ত ডগ ক্যাচারদের চলে যেতে বলল, ওই ঘটনার পর পনেরোদিন সাঁঝেলি আমার সঙ্গে কথা বলেনি।'

শুনতে বেশ ভালো লাগছে। অর্ক বলল, 'স্ট্রেঞ্জ ম্যানি। মায়ের কাছে মাসির গল্প করা আমার ঠিক হয়নি। তোদের মধ্যে আবার ভাব হল কবে?'

'বছর পাঁচেক পর কোন এক বন্ধুর বিয়েতে দেখা। সেদিন নিজে থেকে কথা বলল। কঠিন মেয়ে। ভিড়তে যাস না। আর একটা কথা, পিপি-র সঙ্গে প্রেম করতে হলে, তোকে কিন্তু মাছ-মাংস খাওয়া ছেড়ে দিতে হবে। কেননা খাওয়ার জন্য কোনও প্রাণী হত্যা ও পছন্দ করে না।'

'শুরুতেই তো তুই ডিমরালাইজড করে দিচ্ছিস। সব দেখছি নেগেটিভ পয়েন্ট। মেয়েটার কি কোনও পজিটিভ সাইড নেই?'

'আছে। পিপি হল খাঁটি সোনা। ওর মতো মেয়ে দুর্লভ। ওকে যে বিয়ে করবে, সে অর্ধেক রাজত্ব আর রাজকন্যা— দুইই পাবে। কিন্তু

এ সব ইনফর্মেশন পেতে হলে কিছু খরচা করতে হয়, বুঝলি। মাগনায় হয় না।'

বলেই নন্দিনী উঠে দাঁড়াল। অর্ক বলল, 'আরে, স্ক্রিপটা অর্ধেক শুনিয়ে তুই যাচ্ছিস কোথায়? বোস না। লাস্ট চ্যাপ্টারটা অন্তত বলে যা। ওর জীবনে কোনও হিরো-টিরো আসেনি?'

'না রে, কেউ সাহসই পায়নি।'

'ঠিক বলছিস?'

'কী ব্যাপার অর্ক? এতসব জিজ্ঞেস করছিস? কতদূর এগিয়েছিস? আজ আলিপুর কোর্টে আমার ডেট আছে। কথা বলার সময় নেই। না হলে আগাপাস্তালা তোকে কালটিভেট করতাম। চলি রে।'

নন্দিনী চলে যাওয়ার পর অর্ক দ্রুত চার পাঁচটা ফোন সেরে নিল। নাহ, কোথাও কোনও খবর নেই। কয়েক মিনিট চিন্তা করার পর, হঠাৎ ওর মনে হল, ফলো আপ স্টোরি করার জন্য, এক বার ওর

চিড়িয়াখানায় যাওয়া উচিত। কিন্তু কী ফলো আপ হতে পারে, সেটা এডিটোরিয়াল মিটিংয়ে যাওয়ার আগেই ভেবে রাখতে হবে। চটপট বলতে না পারলে দিব্যদা চটে যায়। অর্কর মনে হল, রামভজন রামের পোস্টমর্টেম রিপোর্ট নিয়ে আজ একটা খবর করা যেতে পারে। দেশ থেকে যদি ওর বউ এসে থাকে, তা হলে তার একটা ইন্টারভিউ নিয়ে, হিউম্যান অ্যাঙ্গেল থেকে আরেকটা কপি হবে। খুনী গয়ালটা নিয়েও স্টোরি হয়। ওই গয়ালটা এখন কোথায় আছে, কেনই বা হঠাৎ হিংস্র হয়ে উঠল? এ নিয়ে প্রাণীবিজ্ঞানীরাই বা কী বলছেন? চিড়িয়াখানায় এ রকম ঘটনা আগে ঘটেছে কী না, তা

মনে করার চেষ্টা করল অর্ক। মনে হয়, হয়েছে। ও যখন ছোট ছিল, সেই সময় কাগজে একটা খবর পড়েছিল। ফুলমালা বলে একটা মাদী হাতি, হঠাৎ রেগে গিয়ে, তার মাহুতকে মেরে ফেলেছিল। অফিসে বসে এ সব স্টোরি হয় না। চিড়িয়াখানায় গিয়ে শিউচরণ বলে লোকটার সঙ্গে একবার দেখা করতে হবে। চিড়িয়াখানার সব কিছু ওর নখদর্পণে।

নিউজ এডিটরের রুমে যাবে বলে অর্ক উঠে দাঁড়াতেই ফোনটা বেজে উঠল। রিসিভার কানে দিতে অর্ক শুনতে পেল, রিসেপশনিস্ট অর্পিতার গলা, 'অর্কদা, দু'তিন জন ভদ্রলোক আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। ওপরে পাঠিয়ে দেব?'

অর্ক বলল, ' কোত্থেকে এসেছেন , জিজ্ঞেস কর তো?'

'বলছেন, সোনারপুর এরিয়া থেকে।'

অর্ক বুঝে নিল, দু'তিনজন যখন একসঙ্গে, তখন নিশ্চয়ই কোনও বড় খবর আছে। ওপরে ডাকলে,

অন্য রিপোর্টাররা খবরটা জেনে যাবে। রিপোর্টারদের মধ্যে এমনই খারাপ সম্পর্ক যে কে কখন কাঠি দেবে, বলা যায় না। তাই ও বলল, 'নীচে ওদের বসতে বল। আমি আসছি।'

লিফটে করে নেমে রিসেপশনে এসে অর্ক দেখল, তিনজনই অপরিচিত। নিম্নবিত্ত খেটে খাওয়া মানুষ। পোশাক আশাকও সাধারণ। বয়স চল্লিশের আশপাশে। কাগজের অফিসে আগে কখনও এসেছে বলে মনে হয় না। অনন্যোপায় হয়ে এসেছে। তিনজনেরই দাঁড়ানোর ভঙ্গিতে কুণ্ঠা, চোখ মুখে অস্বস্তি।

অর্ক বলল, 'কী ব্যাপার, বলুন।'

একজন বলল, 'স্যার আমার নাম নিরঞ্জন রাফতান। সীতাংশু ভটচায আমাদের গাঁয়ের স্কুল মাস্টার। উনিই আমাদের আপনার কাছে পাঠিয়েছেন।'

সীতাংশু ভট্টাচার্যকে অর্ক চিনতে পারল না। নিশ্চয়ই কোথাও আলাপ হয়েছিল। অথবা উনি কাগজে ওর লেখাটেখা পড়েছেন। নামটা জানেন। তাই পাঠিয়ে দিয়েছেন। যাই হোক, বুঝতে না দিয়ে ও

বলল, 'আমাকে স্যার বলতে হবে না। কেন এসেছেন বলুন।'

'আমরা খুব বিপদের মধ্যে আছি। ভিটে মাটি থেকে আমাদর উচ্ছেদ করার চক্রান্ত চলছে। নন্দীগ্রামের মানুষদের আপনারা বাঁচিয়েছেন। আমাদের বাঁচান।'

অর্ক বলল, 'আপনারা কোত্থেকে এসেছেন, বললেন?'

'জায়গাটা সোনারপুরের ভগবানপুর মৌজায়। বাইপাসে রুবি হসপিটাল থেকে মাত্র দুই কিলোমিটার ভিতরে। সরকারি জলাজমি। তিনপুরুষ ধরে ওখানে রয়েছি। কেউ চাষবাস করি, কেউ মাছ ধরি। আমাদের সারা বছরের অন্নসংস্থান... ওই জমি। স্যার, শুধু জমিই নয়, ওরা মেরেধরে আমাদের বাস্তুভিটেও ... কেড়ে নিতে যাচ্ছে।'

আবেগে কথাগুলো গুছিয়ে বলতে পারছেন না নিরঞ্জন রাফতান। সামান্য উত্তেজিতও, ঠোঁট কাঁপছে। রাফতানের দিকে তাকিয়ে অর্ক যেন নন্দীগ্রামের ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটির লোকজনদের

[illegible]তে পেল। কয়েকমাস আগে ওরাও দল বেঁধে এই অফিসে এসেছিলেন। ওদের পাশে দাঁড়ানোর

[illegible]রোধ করেছিলেন। রাফতানকে ও বলল, 'অত এক্সাইটেড হবেন না। কী হয়েছে, গুছিয়ে আমাকে

[illegible]। তো।'

[illegible]মি বলছি অর্কবাবু।' সঙ্গী অন্য জন বলল, 'আমি গুরুপদ কাহার। সোনারপুর হাইস্কুলে বাংলা পড়াই। মাস কয়েক ধরেই আমরা শুনছিলাম, আমাদের ওদিকে একটা ইকোবায়োলজিক্যাল পার্ক হবে। জিনিসটা কী, আমাদের কোনও ধারণা

ছিল না। ওদিকে সব গ্রামের মানুষ, লেখাপড়ার চল বেশি নেই। পার্টির লোকেরা গাঁয়ে গিয়ে বলাবলি করছিল, দিল্লি থেকে কারা সব আসবেন। জমি মাপজোক করবেন। পনেরোটা গ্রাম খালি করে দিতে হবে। দিন তিনেক আগে আমরা জানতে পারি, আর কিছু দিনের মধ্যেই কাজ শুরু হবে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, আমাদের চলে যেতে হবে। তখনই গাঁয়ের মানুষদের সঙ্গে পার্টির লোকদের বচসা শুরু হয়। সেখান থেকে মারামারি, খুনোখুনি। কাল সারাদিনে দশটা লাশ পড়েছে। পার্টির লোকেরা সেই লাশ জলাজমিতে পুঁতে দিয়েছে। একেবারে নন্দীগ্রাম স্টাইলে।'

খবর হিসাবে দারুণ, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কোথাও একটা লাইন বেরোয়নি। এই লোকগুলো

না বলছে, তা যদি ঠিক হয়, তা হলে আজ আর একটা এক্সক্লুসিভ হতে পারে। সাউথ চব্বিশ পরগনায় ডাকাতি, খুন খারাপি—এ সব নিত্যকারের ঘটনা। আগে ছিল ভেড়ি অঞ্চল। ভেড়ি লুট হয়ে যাওয়ার পর থেকে এখন মূল বিরোধ জমি দখল নিয়ে। তুচ্ছ কারণেও দুই বাম পার্টির ছেলেদের মধ্যে মারপিট শুরু হয়ে যায়। তবে গুরুপদ কাহার যা বলছে, সেই ঘটনাটা একটু অন্য রকম। এখানে পার্টিগত কোনও সমস্যা নেই। তবুও অর্ক কয়েকটা ব্যাপার যাচাই করে নিতে চাইল। জিজ্ঞেস করল, 'আপনাদের উচ্ছেদ করতে চাওয়ার পিছনে আসল লোকটা কে বলুন তো। নেতাটি কে?'

'রথীন সর'। ওর ডিরেকশনেই তো সব কিছু হচ্ছে। কিন্তু এ ভাবে কি মানুষকে উচ্ছেদ করা যায়, বলুন আপনি? যতই ওয়েটল্যান্ড হোক না কেন? দীর্ঘ দিন যারা বসবাস করছে, তাদের একটা অধিকার জন্মেই যায়। জমি নিতে হলে ক্ষতিপূরণ দিতে হয়। পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হয়। ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কের নিয়মে আছে। এদের সে সব বালাই নেই। গায়ের জোর। একে কমপেনসেশনের নাম করছে না। উল্টে ভাব দেখাচ্ছে, সরকারের জমি, যেন ওদের বাপের জমি। যখন ইচ্ছে তখন তুলে দিতে পারে।'

রাফতান বললেন, 'আমরা কিন্তু বলেছি, ক্ষতিপূরণ দিলেও

উঠব না। প্রতিরোধ কমিটি করেছি। গুরুপদ তার সেক্রেটারি। আমি প্রেসিডেন্ট। তেমন হলে রক্তগঙ্গা বইয়ে দেব, তবু এক ইঞ্চি জমি ছাড়ব না। মেইরে তবে, মরব।'

যা বোঝার, অর্ক বুঝে গেল। ও বলল, 'আপনারা একটু বসুন। আমি ওপর থেকে একবার ঘুরে আসছি। আপনাদের ওখানে আজ যাব।'

চিড়িয়াখানার কথা আর ওর মাথায় নেই। বড় খবর, অনেক বড় খবরের পিছনে ও আজ দৌড়বে।

৭

সকালবেলায় দম ফেলার ফুরসত পায় না শিউচরণ মাহাতো। ভোর পাঁচটার সময় রোজ ও হালকা ব্যায়াম করে নেয়। তার পর স্নান, হনুমানজির পুজো সেরে নিয়ে ঠিক ছ'টার সময় ও ঢুকে পড়ে চিড়িয়াখানার ভেতরে। প্রথমে স্টোর রুমে গিয়ে তার পর কিচেনে যায়। যে সব পশুপাখি চিকিৎসার জন্য ওর কাছে হাসপাতালে যায়, তাদের খাবার ও নিজে তদারকি করে। একেক জনের জন্য একেক রকম খাবার। ঠিকাদাররা সেই সব খাবার ভোরবেলায় কিচেনে দিয়ে যায়। ডাক্তারবাবুর সঙ্গে কথা বলে শিউচরণ বুঝে নেয়, তাতে ভেজাল আছে কী না। খাবারের ব্যাপারে কোনও রকম ত্রুটি ও বরদাস্ত করে না। মাছ-মাংস, ফলমূলে এতটুকু ভেজাল আছে বুঝতে পারলে, ফেলে দেয়।

ঠিক সাতটার মধ্যে শিউচরণ পৌঁছে যায় হাসপাতালে। নিজের হাতে খাওয়ায় অসুস্থ পশুপাখিদের। চিড়িয়াখানায় এই সব কাজ যারা করে, তাদের বলে কিপার। চিড়িয়াখানার বাসিন্দাদের তারা হাতের

তালুর মতো চেনে। গত কুড়ি বছর ধরে কিপারের কাজ করছে শিউচরণ। চিড়িয়াখানার সব পশুপাখিকে চেনে।প্রত্যেকটা এনক্লোজারে ও কাজ করেছে। গাবে হাউস, মল্লিক হাউস, কারনিভোরা হাউস, বার্ডস অব প্রে হাউস...। এখন সিনিয়ার হয়ে গেছে বলে ওকে হাসপাতালের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এই কাজটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। অভিজ্ঞ না হলে কেউ পায় না। নিছক

না।

রোজগারের জন্য শিউচরণ চাকরিটা করে এখনও নিজের সন্তান

হয়নি বলে, পশুপাখিদের ও সন্তানের মতো ভালবাসে। পুজোর সময়, দিন সাতেকের ছুটি নিয়ে ও প্রতিবার দেশের বাড়িতে যায়। মেদিনীপুরের নয়াগ্রামে। মা বেঁচে আছেন বলে ওকে যেতে হয়। কিন্তু ওখানে গিয়েও তখন ছটফট করে।

শিউচরণের ডেইলি রুটিন আজ গড়বড় হয়ে গেছে। রামভজনের মৃত্যুর কারণে। কাল অনেক রাতে ওরা কেওড়াতলা মহাশ্মশান থেকে ফিরেছে। তাই সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠতে পারেনি। ওর বউ মুন্নি ওকে যখন ডেকে তোলে, তখনই পৌনে সাতটা। আধ ঘণ্টার মধ্যে স্নান আর পুজো সেরে ও বেরিয়ে এসেছে। তার পর সোজা হাসপাতালে। এই মুহূর্তে শিউচরণের অনেক পেশেন্ট। ডান দিকের ব্লকে রয়েছে একটা বাঘ, গয়াল, বাঁদর, শকুন। বাঁ দিকের ব্লকে দু'টো করে ম্যাকাও পাখি আর কাকাতুয়া, একটা করে বেজি, ময়না আর পেঁচা।

পা চালিয়ে বাঁ দিকের ব্লকে ঢুকে শিউচরণ দেখল ডাক্তারবাবু তখনও আসেননি। কোনও কারণে হয়তো আটকে গেছেন। ডাক্তারবাবু আসেন সেই বজবজ থেকে। উনি আসার আগেই খাওয়াদাওয়ার পাট চুকিয়ে রাখে শিউচরণ। আজ ওকে ঘরে

ঢুকতে দেখে, চেঁচামেচি শুরু করে দিল কাকাতুয়া আর ময়না। ওদের মধ্যে অদ্ভুত রেষারেষি আগে খাবার পাওয়া নিয়ে। কাকাতুয়ার খাঁচায় আগে খাবার দিলে গোঁসা হয় ময়নার। 'খাব না', 'খাব না' বলে চেঁচায়। তার পর মাথায় হাত বুলিয়ে দিলে, অবশ্য খেয়ে নেয়।

শিউচরণ তাই নিয়ম করে দিয়েছে। একদিন অন্তর ওদের আগে খাবার দেয়।

টিফিন কেরিয়ারে আলাদা আলাদা খাবার সাজানো আছে। কার খাবার কোনটা, শিউচরণ তা জানে। ময়নার খাঁচা খুলে ও খাবার দিতে লাগল। স্টিলের থালায় পাকা পেঁপে, কলা, কিসমিস, আপেলের টুকরো। অন্যদিন বাবা-বাছা করে খাওয়ায়। আজ মন ভার হয়ে আছে। রামভজনের বউ পুতলির মুখটা মনে পড়লেই ওর বুকটা হু হু করে উঠছে। অল্প বয়সেই মেয়েটা বিধবা হয়ে গেল। একটা বাচ্চাও আছে তিন বছরের। ওদের চলবেটা কী করে? আচ্ছা, ওর নিজের অবস্থাও তা কোনও দিন রামভজনের মতো হতে পারে? ও নিজেও তো কোন দিন বাঘ-সিংহ-হাতির শিকার হতে পারে। তখন কী হবে ওর বউ মুন্নির? কথাটা মনে হতেই ও কাকাতুয়ার খাঁচার দিকে সরে এল।

রোজ খেতে দেওয়ার আগে শিউচরণ কাকাতুয়ার মাথায় আগে হাত বুলিয়ে দেয়। তখন ওরা ঝুঁটি তুলে সম্মান জানায়। দিন কুড়ি হল, কাকাতুয়া দু'টোকে দিয়ে গেছে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট। চোরাচালান হচ্ছিল। মালদহ

থেকে ধরে পুলিশ তুলে দিয়েছিল ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের কাছে। ওরা চিড়িয়াখানায় দিয়ে গেছে। বাগানে এত দিন একটাই কাকাতুয়া ছিল ফেজান্ট হাউসে। তার এ বার সঙ্গী মিলবে। কাকাতুয়া দু'টোকে হাসপাতালে রেখে, শেখানো হচ্ছে চিড়িয়াখানার আদব কায়দা। ট্রেনিংয়ের কিছুদিন পর দর্শকের জন্য ফেজান্ট হাউসের খাঁচায় পাঠিয়ে দেওয়া হবে ওদের।

পিছনে কার পায়ের শব্দ। ঘাড় ঘুরিয়ে শিউচরণ দেখল বান্টি যাদব। ওদের ইউনিয়নের মেম্বার। এখন চিড়িয়াখানায় কর্মীদের দু'টো ইউনিয়ন। একটার প্রেসিডেন্ট শিউচরণ নিজে। ওরা কোনও রাজনৈতিক জলের ছাতার তলায় নেই। বান্টিরা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু শিউচরণ কোনও পার্টিকে ঢুকতে দেয়নি। ওর বক্তব্য, বাইরের কাউকে ওদের ব্যাপারে নাক গলাতে দেওয়া উচিত নয়। কিন্তু অন্য ইউনিয়নটা বাম দলের শক্তিশালী এক পার্টির। তাই ওদেরই বেশি ক্ষমতা। ম্যানেজমেন্ট কমিটি... মানে যারা চিড়িয়াখানা চালায়, তারা ওই ইউনিয়নের কথায় বেশি গুরুত্ব দেয়।

বান্টি কাজ করে চিড়িয়াখানার এ ব্লকে। মানে যেখানে কুমির আর ঘড়িয়ালদের এনক্লোজার। ও এই সময় হাসপাতালে? শিউচরণ প্রমাদ গুনল। রামভজন ওদেরই ইউনিয়নের মেম্বার ছিল। কাল রাতে শ্মশানে দাঁড়িয়ে ওকে নিয়ে বান্টি ঘোঁট পাকানোর চেষ্টা করছিল। রামভজনের জন্য ক্ষতিপূরণ আদায় করতে হবে। না হলে অন্তত বউয়ের জন্য চাকরি। কিন্তু বোকাটা জানে না, এই দাবি এখন আর করা যাবে না। সরকার এই নিয়ম তুলে দিয়েছে। দশ বছর আগে হলে মুখ ফুটে বলতে হত না। ম্যানেজমেন্ট কমিটি মৃত কর্মীদের ছেলে-মেয়েকে চাকরি দিয়েওছে। বান্টিরা পুরনো কথা জানে না।

বান্টি সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। ওর সঙ্গে চোখাচোখি হতে শিউচরণ জিজ্ঞেস করল, 'তুই এখানে? তোর এনক্লোজারের

কাজ এর মধ্যেই হয়ে গেল?'

বান্টি বলল, 'আমি সাফসুতরোর কাজটা সেরে এসেছি। জগু খাবার দিচ্ছে। তোমাকে একটা কথা বলতে এলাম শিউদা।'

'বেজির খাঁচায় জল ঢালতে ঢালতে শিউচরণ বলল, 'কী, বল।'

'আজকের কাগজে রামভজনের খবরটা বড় করে বেরিয়েছে, তুমি জানো?'

'না তো। কাগজ দেখার সময় পাইনি।' কথাগুলো বলার সময় শিউচরণের একটা কেশে উঠল। কাল ডিরেক্টর সাহেবের সামনে ওরা সবাই মিলে ঠিক করেছিল, খবরটা চেপে যাবে। তা কাল কি সাঁঝেলি ম্যাডাম সবাইকে বলে দিল? ইস। খুব ভুল হয়েছিল। ওঁর কাছে রামভজনের কথাটা না বললেই ভালো হত। বান্টি ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে দেখে শিউচরণ বলল, 'কী লিখেছে কাগজে?'

'প্রশান্তবাবু বলছিল, কাল নাকি একজন রিপোর্টার এসেছিল বাগানে। কার কাছ থেকে খবরটা পেয়েছিল বলো তো?'

'কী করে বলব, বল। রোজই তো বাগানে কত রিপোর্টার আসে। কে এল গেল, তা নিয়ে ভাবার সময় ছিল নাকি আমার কাল?'

'আমি তো সেকথাই বললাম প্রশান্তবাবুকে। খবরটা কিন্তু লিক হয়েছে হাসপাতাল থেকে। অন্তত লেখার ধরন দেখে সেটাই মনে হচ্ছে। নার্সিংহোম থেকেও হতে পারে। রিপোর্টারদের ফাঁকি দেওয়া অত সোজা নাকি? ওদের এড়ানোর জন্য ডিরেক্টর সাহেব রামভাইকে পিজি হসপিটালে নিয়ে গেল না। অথচ দেখ, কাগজে ঠিক বেরিয়ে গেল।'

বান্টিকে এড়ানোর জন্যই শিউচরণ এ বার বলল, 'আমি

একবার ওদিকের ব্লকে যাব। তুই কি এখানে থাকবি? ঘরে কিন্তু আমি তালা দিয়ে বেরোব।'

ঘর ছেড়ে বেরোনোর সময় প্রতিবার একেবারে নিয়ম করে শিউচরণ তালা লাগিয়ে যায়। অল্প সময়ের জন্য টয়লেটে গেলেও। পাখিটাখি চুরি হয়ে যেতে পারে। কেউ বিষাক্ত খাবার খাইয়ে দিতে পারে। সাবধানের মার নেই। কাকাতুয়া, ময়নার খুব দাম। ওকে চাবির গোছা বের করতে দেখে বান্টি

বলল, 'ডাক্তারবাবুকে কি কাল জিজ্ঞেস করেছিলে, কেন রামভাইয়ের সঙ্গে গয়ালটা ওই রকম করল?'

ঘরের বাইরে বেরিয়ে দরজায় তালা লাগাতে লাগাতে শিউচরণ বলল, 'জিজ্ঞেস করেছি। বলল, কোনও কারণে বোধহয় গয়ালটা রেগে ছিল। হয়তো রামভজন না জেনেই কিছু করেছিল। সেটা ও ছাড়া আর কে বলতে পারবে? এমনটা কিন্তু হওয়ার কথা নয়। ওই গয়ালটাকে অসমের জঙ্গল থেকে নিয়ে এসেছিল ডিরেক্টর সাহেব। সাত আট বছর আগে। তখন বেশ ফেরোসাস ছিল। ইদানীং একেবারে শান্ত হয়ে গেছিল।'

বান্টি বলল, 'এই ঘটনাটা কিন্তু একটা সিগন্যাল দিয়ে গেল আমাদের। বুঝলে শিউদা, এখানে বেশি রিস্ক নিতে যাওয়া বোকামি।'

কথাটা শুনে এতক্ষণে হাসি পেল শিউচরণের। বান্টির কাঁধে হাত রেখে ও বলল, 'অত ভয় পেলে চলবে? শোন, একটা কথা বলি। আমরা যেমন বুঝতে পারি, তেমন জন্তুজানোয়ারও বুঝতে পারে, কে ওদের ভালোবাসে, কে মন্দ। আমাদের থেকেও ওরা অনেক ভালো বোঝে। ভগবান ওদের এই শক্তিটা অনেক বেশি দিয়েছে। তোর হাতের টাচ পেলেই ওরা ঠিক ধরে ফেলবে, তুই ওদের ভালো চাস, না মন্দ। এখানে কাজ করতে গেলে আগে ওদের ভালবাসতে হবে, বুঝলি কথাটা? যা, ভয় পাস না।'

... বেলা দশটার মধ্যেই হাসপাতালের সব কাজ সেরে ফেলল শিউচরণ। বেলা দু'টো পর্যন্ত আর কোনও কাজ নেই ওর, কিপারদের

দু'টো শিফটে কাজ করতে হয়। সকাল ছ'টা থেকে দশটা। বেলা দু'টো থেকে সন্ধে ছ'টা। হাসপাতালের পাশেই কর্মীদের কোয়ার্টার সেদিকে এগিয়েও দাঁড়িয়ে পড়ল শিউচরণ। মুন্নি আজ বাজার করতে বলেছে। দু'দিন বাজার করা হয়নি। ঘরে কোনও সবজি নেই। বাজার করার জন্য ওকে সেই খিদিরপুরে যেতে হবে। জিরাট ব্রিজের পাশ দিয়ে হেঁটে গেলে চট করে পৌঁছে যাওয়া যায়। তাই রাস্তা পেরোনোর জন্য জেব্রা ক্রসিংয়ে এসে দাঁড়াল শিউচরণ।

অন্য দিন ও বেলা সাড়ে দশটার মধ্যে বাজার সেরে ফেলে। আজ শকুনটা বেগড়বাই না করলে কাজ অনেক আগেই সারা হয়ে যেত। সাঁঝেলি ম্যাডামের সেই শকুনটা। প্রথম দু'টো দিন নেতিয়ে

ছিল। ডাক্তারবাবু ওষুধ দেওয়ার পর উঠে দাঁড়ায়। ডানা ঝটপট শুরু করে। আজ কেমন যেন ঝিমিয়ে পড়েছে। বাইপাসের ধারে প্রচুর হোর্ডিং, লোহার কাঠামো, বিদ্যুৎ সংযোগের তার। বোধ হয় শিকার ধরতে গিয়ে কোথাও খোঁচা-টোচা খেয়েছিল। ঘা হয়ে গেছে। ফের ঝিমিয়ে পড়ল কেন, সেটাই ডাক্তারবাবুকে জিজ্ঞেস করা হয়নি। শকুনের খাঁচাটা মেঝেয় রাখাটা বোধহয় ঠিক হয়নি। শকুনটাকে ভালো করে তুলতে না পারলে সাঁঝেলি ম্যাডামের কাছে মুখ থাকবে না শিউচরণের।

রাস্তা পেরিয়ে গেটের সামনে এসে দাঁড়াল শিউচরণ। আজও মারাত্মক ভিড় গেটের সামনে। ভিজিটর দেখলে মনে মনে খুশি হয় ও। মাত্র দশ টাকার টিকিট। কলকাতায় আনন্দ পাওয়ার জন্য, এত কম

টাকায়, আর কোথাও যাওয়া যায়? একটা সিনেমা দেখতে গেলে এখন তিরিশ টাকা লাগে।

সার্কাসে পঞ্চাশ টাকা। নিকো পার্কের মতো জায়গায় গেলে তো একেক জনের তিনশো টাকার ধাক্কা।

বছর তিনেক আগে টিকিটের দাম যখন পাঁচ টাকা থেকে বাড়িয়ে এক লাফে দশ টাকা করার কথা হয়, তখন রাইভাল ইউনিয়ন প্রতিবাদ করেছিল। নাকি সাধারণ লোকের ওপর চাপ পড়বে। সেই সময় শিউচরণ যদি ওদের সঙ্গে গলা মেলাত, তা হলে ম্যানেজমেন্ট কমিটি টিকিটের দাম বাড়াতে পারত না।

কিন্তু কেন জানে না, শিউচরণ তখন কমিটির সঙ্গে একমত হয়েছিল। এক কিলো পিঁপড়ের ডিমের দাম এখন দেড়শো টাকা। চিড়িয়াখানা চালানো সোজা কথা নাকি? বিশাল খরচা। চিড়িয়াখানা চালাতে গেলে, নিজস্ব রোজগার বাড়াতেই হবে। না হলে বন্ধ করে দিতে হবে। কতদিন আর ভরতুকি দিয়ে সরকার চালাবে? এমনিতে, সারা বছর ভিড় হয় না। ভিজিটর আসে পুজোর পর থেকে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত-চার পাঁচটা মাস। তার পর চিড়িয়াখানা চত্বরে সিকিউরিটির লোকজন মাছি তাড়ায়। শিউচরণ মনে করে, চিড়িয়াখানার খরচ তুলে নেওয়ার জন্য টিকিটের দাম কুড়ি টাকা করা উচিত।

ভিড় এড়িয়ে জিরাট ব্রিজের দিকে শিউচরণ পা বাড়াল। আর ঠিক সেই সময় ওর মোবাইল ফোনটা বেজে উঠল। সুইচ টিপে পর্দায় ও দেখল সুভাষ চ্যাটার্জি। ডিরেক্টর সাহেবের নাম্বার। মনের ভেতর অস্বস্তি শুরু হল। 'হ্যালো' বলতেই ও দিক থেকে সাহেব বললেন, 'শিউ, তুমি কোথায়?'

'স্যার, আমি গেটের সামনে।'

'শোনো, তুমি সাঁঝেলি মিত্রকে চেনো? কাল নাকি তোমার কাছে এসেছিল।'

শুনেই বুকটা টিপটিপ করতে লাগল শিউচরণের। সাহেব কি তা হলে সব জেনে গেছেন? খুব বিশ্রি হল ব্যাপারটা। রামভজনের মৃত্যুর কথাটা উনি কাউকে বলতে মানা করেছিলেন। স্যার এখন ওর

বিরুদ্ধে ডিসিপ্লিনারি অ্যাকশনও নিতে পারেন। তবুও শিউচরণ ঠিক করল, মিথ্যে কথা বলবে না। তাই বলল, 'চিনি স্যার।'

'হুম, এখুনি একবার এসো তো আমার অফিসে।' বলেই সাহেব লাইনটা কেটে দিলেন।

৮

দাদার ব্যবহারে পরিবর্তন দেখে বেশ কয়েকদিন ধরেই অবাক হচ্ছে সাঁঝেলি। পুরোপুরি বদলে গেছে। যে দাদা অ্যাদ্দিন বলত, 'তুই ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াচ্ছিস', সেই দাদাই কী না আজকাল বলছে, 'অ্যানিম্যাল ওয়েলফেয়ারের জন্য তোরা যা করছিস লিলি, তার জবাব নেই। এই তো সেদিন রথীনদা এসে তোর কত সুখ্যাতি করে গেলেন।'

সেদিন এই কথাগুলো দাদা বলছিল, ডাইনিং টেবলে বসে। দাদার সঙ্গে তখন খেতে বসেছে বাবা, মাও। সাঁঝেলি কিছু খেতে চাইছিল না। দাদা জোরাজুরি করায় শোনপুরি শেষে এক গ্লাস সরবত আর পাকা পেঁপে এনে দিয়েছিল। দাদার মতলবটা সাঁঝেলি বুঝতে পারেনি। বিজনেসম্যানরা উদ্দেশ্য ছাড়া কিছু করে না। কেসটা কী?

দাদা বলেছিল, 'তোর সঙ্গে যে রথীনদার এত জানাশুনো, কোনওদিন তো বলিসনি বোন? কী মেয়ে রে তুই। দেখলাম, তোকে খুব পছন্দ করে।'

বাবা বলেছিল, ‘ রথীন সর লোকটা কিন্তু ভালো নয় রে খোকা। একেবারে মাফিয়া টাইপের। একটু বুঝে শুনে মিশিস।’

দাদা পাত্তাই দেয়নি কথাটা, ‘পলিটিক্স করে, এমন কোন লোকটা ভালো, তুমি দেখাও তো বাবা। ওদের হাতে না রাখতে পারলে কনস্ট্রাকশন বিজনেস চালানো সম্ভব? দেখচ তো, চারদিকে কী হচ্ছে।’

বাবা আর কোনও কথা না বলে খাওয়ায় মন দিয়েছিল। সাঁঝেলি অবশ্য জানে না, দাদার সঙ্গে রথীন সর বলে লোকটার সম্পর্ক কী রকম। দাদার বিজনেসে কতটাই বা কাজে লাগে। তবে কলেজে ওঠার পর থেকেই ও লক্ষ করেছে, দাদার বিজনেস ফুলে ফেঁপে উঠছে। নানা জায়গায় অ্যাপার্টমেন্ট তৈরি করছে। চাবি হ্যান্ডওভারের দিন, বাড়ির লোকদেরও দাদা কয়েকবার সেখানে নিয়ে গেছে। মায়ের মুখে শুনেছে, দাদা এখন কোটি কোটি টাকার মালিক। তাতে ওর কিছু আসে- যায় না। রথীন সরকে ও চেনে। ওর মনে হয়, ভালো-মন্দ যেমনই হোন না কেন, ভদ্রলোক কাজের।

অন্তত অন্য পলিটিসিয়ানদের মতো নন। কথা দিলে কথা রাখেন। অন্তত, এখনও পর্যন্তরেখেছেন। তার প্রমাণও ওরা পেয়েছে। ইস্টার্ন বাইপাস থেকে গোবিন্দপুরে ওদের অ্যানিম্যাল হসপিটালে যাওয়ার জন্য যে রাস্তাটা ছিল, এই সেদিনও ছিল সেটা কাঁচা রাস্তা। খুব খারাপ অবস্থা হত বর্ষার সময়। জলে ডুবে থাকত। গাড়ি নিয়ে যাওয়াই যেত না। পুজোর আগে রথীন সরকে নিয়ে গিয়ে রাস্তার অবস্থাটা দেখিয়েছিল আশিসদা। উনি কথা দিয়ে যান, পাকা রাস্তা করে দেবেন। তিন মাসের মধ্যে ভোল বদল। আন্ডারগ্রাউন্ড ড্রেন তৈরি করে দিয়েছেন উনি, সেই সঙ্গে পিচের রাস্তাও।

‘তোদের হসপিটালের জন্য যদি টাকা পয়সা দরকার হয়, তা হলে আমাকে বলিস লিলি।’

ডিনার সেরে উঠে যাওয়ার মুখে দাদা সেদিন বলেছিল। ‘রোজগার তো কম করলাম না। ভালো কাজে না হয় কিছু দানই করি। কী বলো মা?’ মাকে সাক্ষী করেছিল দাদা।

মা নির্লিপ্ত গলায় বলেছিল, 'পারলে নিশ্চয়ই করবি।'

ইদানীং ডিনারের সময় মাঝে মাঝে হাজির থাকে দাদা। ডাইনিং রুমে, খুব শখ করে একসঙ্গে ছ'জনের বসার একটা টেবল বানিয়েছিল বাবা। ওপরটা মার্বেল পাথরে কারুকার্য করা। বাবা বলত, 'ফর থ্রি জেনারেশনস।' দাদার বিয়ের পর একটা চেয়ার খালি ছিল। তাতে তো কেউ বসলই না। তারপরও, বউদিকে দিয়ে দাদা নতুন বাড়িতে চলে যাওয়ার পর আরও দু'টো চেয়ার খালি হয়ে গেল। আগে ডিনার করতে বসে বাবার মুখে খই ফুটত। নার্সিংহোমে কী হল, তার গল্প শোনাত। দাদা-বউদি চলে যাওয়ার পর বাবা চুপ হয়ে গেছে।

সাঁঝেলি লক্ষ করেছে, দাদা আজকাল বাবার জায়গাটা নিয়েছে। ডিনার করতে বসে নানা ধরনের কথা বলে। কথায় কথায় অন্তত রথীন সরের প্রসঙ্গ তুলবেই। ক'দিন আগে যেমন বলল, 'রাজডাঙ্গার মাঠে রথীনদারা, খুব বড় করে একটা ফেস্টিভ্যাল করছে। কাকে আনছে জানো মা, হেমা মালিনীকে।' মা উৎসাহ দেখিয়ে বলল, 'তাই নাকি? তা হলে তোর বাবার জন্য কার্ড আনিস। তোর বাবা তো একটা সময় হেমা মালিনী বলতে পাগল ছিল।'

শুনে সাঁঝেলির হাসি পেয়ে গেছিল। পুরু কাঁচের চশমা পরা, গম্ভীর মুখওয়ালা বাবা যে কোনও সিনেমা আর্টিস্টের ফ্যান ছিল, ভাবাই যায় না। ও মনে করতে পারল না, বাবা-মাকে কোনওকালে একসঙ্গে সিনেমা যেতে দেখেছে, কী না। সাঁঝেলি নিজে কখনও সিনেমার প্রতি টান অনুভব করেনি। কলেজে ক্লাস কেটে নন্দিনী, শুভশ্রীরা যখন শাহরুখ আর আমির খানের ছবি দেখতে যেত, তখন ও ডুবে থাকত জুলজি-র বইয়ে। জীবনে মাত্র আট দশটা সিনেমা পুরোটা বসে ও দেখেছে। আফ্রিকান সাফারি, কিংকং, দ্য লস্ট ওয়ার্ল্ড, হাতি মেরে সাথী। তাও ছবিগুলো জন্তুদের নিয়ে বলে। কিংকং দেখে ও কেঁদে ফেলেছিল। শেষ ছবিটা 'স্টুয়ার্ট লিটল' তো ওর দারুণ লেগেছিল। একটা ইঁদুরকে নিয়ে গল্প।

'হ্যাঁরে লিলি, রথীনদা জানল কী করে রে, তুই ভালো গান গাইতে পারিস?' দাদা হঠাৎ প্রশ্নটা

করল। চোখের সামনে থেকে কিংকংয়ের ছবিটা মুছতে সময় নিল সাঁঝেলি। তার পর বলল, 'কিছু বলছ?'

'তুই যে দক্ষিণীতে গান শিখতিস, সেটা রথীনদা জানল কী করে রে?'

'কী করে বলব? আমি তো বলিনি। আশিসদার কাছ থেকে হয়তো শুনে থাকবে।'

'ওহ্, আশিসবাবুই তা হলে তোকে ফাঁসিয়েছে। রেডি থাকিস, ওদের ফেস্টিভ্যালে তোকে হয়তো গান গাইতে বলবে।'

দাদা তাকিয়ে আছে মুখের দিকে। বোধহয় মনের কথা পড়ে নিতে চাইছে। সাঁঝেলি তাই বলল, 'আহ্, আমার প্র্যাকটিস নেই। আমি কী গান গাইব। তুমি বারণ করে দিও।'

মা বলল, 'বারণ করবে কেন? গাইবি তো উদ্বোধনের সময় দু'টো গান। কম্পিটিশনে তো আর যাচ্ছিস না, যে প্র্যাকটিস করতে হবে।'

মা তা হলে জানত, ওকে ওপেনিং সঙ গাইতে হবে। তার মানে... এ নিয়ে মায়ের সঙ্গে দাদা আগেই কথা বলে রেখেছিল, যাতে মা সাপোর্ট করে দাদাকে। কথাটা ভেবেই মাথা গরম হয়ে গেছিল সাঁঝেলির। পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়েছিল। গোবিন্দপুরে ওদের অর্গানাইজেশনের জন্য টাকা দেবে বলেছে দাদা। এই সময়টা ওকে চটানো ঠিক হবে না। দু'চারটে গান গেয়ে দেওয়া ওর কাছে কোনও সমস্যা নয়। প্রশ্নটা হল, রথীন সরের ফেস্টিভ্যালে গান গাইতে যাওয়াটা ওর উচিত হবে কী না। পার্টির লোকজনদের সঙ্গে খুব মেশামেশি পছন্দ করে না আশিসদা। যাতে ভুল বোঝাবুঝি না হয়, হ্যাঁ-না করার আগে, ওর সঙ্গে একবার পরামর্শ করা দরকার। উত্তরটা

এড়ানোর জন্যই ও বলেছিল, 'ফেস্টিভ্যালটা কবে যেন দাদা?'

'ফেব্রুয়ারির শেষ দিকে বোধহয়।'

'ওহ, তা হলে এখনও অনেক দেরি আছে।' বলেই উঠে পড়েছিল সাঁঝেলি।

কাল রাত থেকেই রথীন সরের কথা মনের মধ্যে ঘুরে ফিরে আসছে সাঁঝেলির। লোকটা ওদের অর্গানাইজেশন নিয়ে হঠাৎই খুব বেশি আগ্রহ দেখাচ্ছে। অবশ্য এখনও পর্যন্ত এমন কিছু করেনি, যাতে ওকে কাঠগড়ায় দাঁড় করানো যায়। তবুও আশিসদা একটু দ্বিধায়। এককালে গোবিন্দপুরের হাসপাতালটা দাঁড় করানোর জন্য আশিসদা জীবনে অনেক ঠোক্কর খেয়েছে। প্রচুর সময় দিয়েছে। বিয়ে পর্যন্ত করেনি। ছোটখাটো ব্যবসা চালাত, সেটাও নষ্ট হয়ে গেছে। এখন বিধবা এক পিসির বাড়িতে থাকে। সাঁঝেলি জানে, আশিসদার নিজের বলতে কিছু নেই। রথীন সরের মতো লোকের পাল্লায় পড়ে, যদি হাসপাতালটা ওর হাতছাড়া হয়ে যায়, তা হলে সেটা খুব দুঃখের হবে। পার্টির নেতারা ক্ষমতাবান। ইচ্ছে করলে, সব কেড়ে নিতে পারে।

কাল রাত থেকে বৃষ্টি হচ্ছে। কনকনে ঠাণ্ডা। বাইরে বেরোনোর বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই সাঁঝেলির। গায়ে লেপ চাপা দিয়ে, আধশোয়া হয়ে ও খবরের কাগজে চোখ বোলাচ্ছিল। প্রথম পাতায় রথীন সরের ছবি দেখে ও উঠে বসল। সোনারপুরে ভগবানপুর মৌজায় দু'দল লোকের মধ্যে বেশ কয়েকদিন ধরেই খণ্ডযুদ্ধ চলছে। সেখানে মিটিং করতে গেছেন রথীন সর। আরে, সোনারপুরটাও তো ওঁর এরিয়ায়। খবরটায় দ্রুত চোখ বোলাল সাঁঝেলি। একদল মানুষ জমি থেকে উচ্ছেদ হতে চায় না। অন্য দল তাদের তুলে দেবেই।

উচ্ছেদকারীদের মধ্যে রথীন সরের নামটা দেখতে পেল সাঁঝেলি। খবরটা পড়ে ও উৎসাহ বোধ

করল না। এ সব খবর আর ওর পড়তে ভালো লাগে না।

সাঁঝেলির মনে হয়, আসল কালপ্রিট তো মানুষ। নগরায়ন করতে গিয়ে, একটা সময় বনভূমি থেকে হাজার হাজার প্রাণীকে উৎখাত করেছে মানুষ। এখনও সেই অপরাধটা করে যাচ্ছে। অন্য প্রাণীরা কথা বলতে পারে না। তাদের কাছে অস্ত্র বলতে নখ আর দাঁত। কতটা প্রতিবাদই বা আর তারা করতে পেরেছে? মানুষের আগ্রাসী মনোভাবের বলি হয়ে পৃথিবী থেকে বিলুপ্তই হয়ে গেছে কতশত প্রজাতির প্রাণী। জমি দখলের হিংস্রতা মানুষই প্রথম দেখিয়েছে। তখন অন্য প্রাণীর কথা ভাবেনি। এখন শিল্পায়নের জন্য মানুষই মানুষকে উচ্ছেদ করছে। তার একটা কুফল ভোগ তো করতেই হবে। প্রকৃতি বিনাশ, সম্পত্তি নিধন, মৃত্যু। রথীন সরের মতো মানুষ আগে ছিলেন, এখনও আছেন।

খবরের কাগজটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সাঁঝেলি লেপ মুড়ি দিয়ে টানটান হয়ে শুয়ে পড়ল। রথীন সর লোকটাকে ও প্রথম দেখে চিড়িয়াখানায়। কেয়ার ফর অ্যানিম্যালস-এর হয়ে, স্কুলের একদল ছাত্র- ছাত্রীকে নিয়ে সেদিন, চিড়িয়াখানার গেটের সামনে ওরা বিক্ষোভ দেখাতে গিয়েছিল। দাবি, 'পশুপাখিদের আরও ভালোভাবে রাখতে হবে।' ওই দিনটা বেছে নেওয়ার কারণ, চিড়িয়াখানার লাইব্রেরি হল- এ. ম্যানেজমেন্ট কমিটির মিটিং ছিল। গেটের বাইরে ছাত্রছাত্রীদের দিয়ে সাঁঝেলিরা লিফলেট বিলি করিয়েছিল। টুলের ওপর দাঁড়িয়ে ও বক্তৃতা দিয়েছিল। ম্যানেজমেন্ট কমিটির চেয়ারম্যান সেদিন

মিটিংয়ে হাজির ছিলেন না। ওরা কী চায়, সেটা জানার জন্য কথা বলতে আশিসদাকে ভেতরে ডাকেন কমিটির মেম্বার ওই রথীন সর। আশিসদার সঙ্গে ভেতরে গিয়েছিল সাঁঝেলিও।

প্রথম থেকেই সাঁঝেলির মনে হয়েছিল, রথীন সর পোড়খাওয়া মানুষ। খুব মন দিয়ে দাবিগুলো শুনল, তার পর উনি বলেছিলেন, 'এ খুব ভালো প্রস্তাব। সত্যি, মিটিংয়ে আমরাও আলোচনা করি, কীভাবে চিড়িয়াখানায় আরও একটু ভালোভাবে অ্যানিম্যালদের রাখা যায়। আসলে কী জানেন, ভালো-র তো আবার শেষ বলে কিছু নেই। তার জন্য টাকার দরকার। আপনারাও তো একটা এনজিও চালান। আপনাদের অবশ্য টাকার অসুবিধে নেই। শুনেছি,বাইরে থেকে অনেক পান।'

আশিসদা পাল্টা বলেছিল, 'স্যার, টাকা থাকলেই যে সব সময় অর্গানাইজেশন ভালো চলে, সেটা ঠিক না।'

হাত তুলে থামিয়ে দিয়েছিলেন রথীন সর, 'আমি তর্কে যাব না। ওতে সমস্যার সমাধান হয় না। জু-

অবস্থাটা তো জানেন। আমাকে সাজেশন দিন। কী করলে ভালো হয়, সেটা বলুন।'

আশিসদা হঠাৎই যেন খেই হারিয়ে ফেলেছিল। বলেছিল, 'কী সাজেশন দেব বলুন তো?

জু-অথরিটি অব ইন্ডিয়ার কোনও ডিরেকশনই এখানে মানা হচ্ছে না। একটা একজাম্পল দিচ্ছি। এই যে হাতির ওপেন এনক্লোজারটা আপনারা করেছেন, সেটা কি ঠিক জায়গায় করেছেন? বাউন্ডারি ওয়ালের ঠিক বাইরে জিরাট ব্রিজ দিয়ে সারা দিন অসংখ্য গাড়ি যাচ্ছে। ধোঁয়া ছাড়ছে। সব কার্বন ডাই অক্সাইড সারাদিন ধরে ইনহেল করছে হাতিরা। কারণ ওরাই থাকে ব্রিজের সবথেকে নিয়ারেস্ট পয়েন্টে।

বলুন, হাতিগুলো ক'দিন সুস্থ থাকবে? অন্য কোথাও কি হাতির এনক্লোজার করা যেতনা?'

সাঁঝেলির মনে আছে, রথীন সর তখন বলেছিলেন, 'হাতিগুলোর কথা যে আপনারা ভেবেছেন, তার জন্য ধন্যবাদ। কিন্তু মুশকিলটা হল কী জানেন, ভিজিটরদের বেশিরভাগ, বিশেষ করে বাচ্চারা, জু তে যে দু'তিনটে অ্যানিম্যাল দেখতে আসে, তার মধ্যে একটা হল হাতি। এত বড় প্রাণী, সে জন্যই সেন্টার অব অ্যাট্রাকশন। তাই ভিজিটরস গ্যালারিটাও তো তেমন বড় রাখার কথা ভাবতে হয়েছিল তখন আমাদের। এখানে তেমন বড় জায়গা আর কোথায়, বলুন? আর একটা কথা, হাতির বদলে যে অ্যানিম্যালকেই আমরা ওখানে রাখি না কেন, সমস্যাটা কিন্তু একই থেকে যাবে। কেননা, ব্রিজের রাস্তা বদল করার ক্ষমতা আমাদের হাতে নেই।'

কথার মারপ্যাঁচে সেদিন আশিসদাকে প্রায় চুপ করিয়ে দিয়েছিলেন রথীন সর। পার্টির নেতা হওয়ার অনেক সুবিধে, ওদের হাতও অনেক লম্বা। একটা পর্যায় পর্যন্ত ওদের সঙ্গে তর্ক করা যায়। তার ওপরে যাওয়া যায় না। ওদের অহংবোধে আঘাত দিয়ে ফেললে, পরে সেটা সামলানো কঠিন হয়ে যায়। আশিসদা পরে বলেওছিল, 'দেখ সাঁঝেলি, আমি অনেক কিছু বলতে পারতাম। কিন্তু আমাদের অ্যানিম্যল হসপিটালটা ওর এলাকায়। ভবিষ্যতে আমাদের দরকারও হতে পারে ওকে। তাই ওর আর্গুমেন্টগুলো হজম করে গেলাম।'

সাঁঝেলি জিজ্ঞেস করেছিল, 'একজন আউট অ্যান্ড আউট পলিটিক্যাল নেতা, যার সঙ্গে চিড়িয়াখানার কোনও সম্পর্ক নেই, সে কী করে কমিটির মেম্বার হতে পারে?'

আশিসদা বলেছিল, 'আগে হত না। এই সরকার আসার পর থেকে কমিটিতে পলিটিক্যাল লোকজন ঢুকিয়েছে। বি কেয়ারফুল সাঁঝেলি, এই প্রশ্নটা আর কোথাও কোরো না। আমার ক্ষতি হয়ে যাবে। একটা অর্গানাইজেশন গড়তে অনেক দিন লাগে, ভাঙতে পাঁচ মিনিটও লাগে না। আমার যদি ভালো চাও, তা হলে মুখ বন্ধ করে রেখো।'

সেদিনই অবশ্য সাঁঝেলি বুঝে গেছিল, ওরা যতই আন্দোলন করুক না কেন, রথীন সররা তাতে কান দেবেন না। ওরা নিজেদের খেয়ালমতোই চলবেন।

লেপের ওমে ওর ঘুম এসে গেছিল। হঠাৎ শোনপুরির গলা শুনতে পেল সাঁঝেলি, 'দিদিমণি, ও দিদিমণি, তোমার সঙ্গে একজন দেখা করতে এয়েছে।'

বেলা একটা বাজে। এই সময় কে আবার ওর সঙ্গে দেখা করতে এল? লেপ থেকে বেরোবে না বলেই ও জিজ্ঞেস করে, 'কে রে? আগে কখনও এসেছিল?'

শোনপুরি বলল, 'মনে হয় এয়েছিল। বলল, চিড়িয়াখানা থেকে।'

লেপ ছুঁড়ে ফেলে সাঁঝেলি লাফ দিয়ে ডিভান থেকে নামল। চিড়িয়াখানা থেকে? কে হতে পারে?

মিনিট তিনেকের মধ্যে নিজেকে গুছিয়ে নিয়ে, ড্রয়িংরুমে এসে ও দেখল, শিউচরণ। মাই গড, তা হলে কি শকুনটাকে নিয়ে কোনও প্রবলেম হল? দিন কয়েক শকুনটার কোনও খোঁজ নিতে পারেনি। ও কিছু বলার আগেই, দু'হাত জোড় করে মাথা ঝুঁকিয়ে শিউচরণ বলল, 'ম্যাডাম, ডিরেক্টর সাহেব আপনাকে এই চিঠিটা পাঠিয়েছেন।'

'চিড়িয়াখানার ডিরেক্টর সুভাষ চ্যাটার্জির চিঠি। কোনও কথা না বলে খামটা ছিঁড়ে সাঁঝেলি চিঠি পড়তে শুরু করল। ডিরেক্টর লিখেছেন, 'চিড়িয়াখানায় লাইব্রেরিয়ানদের একটি পদ খালি আছে। আপনি যদি ইচ্ছে করেন, তা হলে আবেদন করতে পারেন। ম্যানেজমেন্ট কমিটি আপনার শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং পশুপ্রেম সম্পর্কে বিলক্ষণ ওয়াকিবহাল। আপনার নাম সুপারিশ করেছেন কমিটির অন্যতম সদস্য রথীন সর।'

চিঠিটা পড়ে সাঁঝেলি হতভম্ব হয়ে গেল।

মুম্বই এয়ারপোর্টে নেমে প্রোজ্জ্বল দেখতে পেলেন, অ্যারাইভাল লাউঞ্জের বাইরেই কারমারকর দাঁড়িয়ে আছে। একে দেখে একটু নিশ্চিন্ত হলেন। মুম্বইয়ে ওঁর ব্যবসাটা দেখে বাল কারমারকর। মারাঠি, বয়স তিরিশের ঘরে। খুব চটপটে। কথায় কথায় ছেলেটা একদিন বলে ফেলেছিল, ওর বাবা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির সঙ্গে জড়িয়ে আছেন। তিনি কতটা ইম্পর্ট্যান্ট লোক, প্রোজ্জ্বল জানেন না। তবে ওই ভদ্রলোকই অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে দিয়েছেন হেমা মালিনীর সঙ্গে। প্রোজ্জ্বল সেই কারণেই মুম্বইয়ে।

ব্যবসার কাজে বহুবার মুম্বই শহরে পা দিয়েছেন। তবুও রাস্তাঘাট চিনতে পারে না প্রোজ্জ্বল। মুম্বইয়ে এলে তাই সর্বক্ষণ সঙ্গে রেখে দেন কারমারকরকে। ওর মা বাঙালি, পঞ্চাশের দশকে নাকি অভিনয়-টভিনয় করতেন। সেই কারণে ছেলেটা ভালো বাংলা বলতে পারে। ব্যাগেজের জন্য অপেক্ষা করার ফাঁকে ওর দিকে হাত তুললেন প্রোজ্জ্বল। জুহুর সান অ্যান্ড স্যান্ড হোটেলে ও ঘর বুক করে রেখেছে। সন্ধ্যা ছ'টায় অ্যাপয়েন্টমেন্ট। মাত্র আধ ঘণ্টার জন্য। যেতে হবে কাছাকাছি জুহু ভিলে পার্লে

পার্লে একটা জায়গায়। ওখানেই থাকেন হেমা। কাজ হয়ে গেলে কাল সকালের ফ্লাইটেই প্রোজ্জ্বল ফিরে যেতে চান কলকাতায়। অনেক কাজ পড়ে আছে।

বড় কোনও প্রোজেক্টে টেন্ডার দেওয়ার আগে যে রকম টেনশনে পড়েন, আজ সেই রকমই টেনশন অনুভব করছেন প্রোজ্জ্বল। রথীনদার ফেস্টিভ্যালে ডান্স প্রোগ্রামের জন্য হেমা মালিনীকে নিয়ে যেতেই হবে। রাজি করাতে না পারলে মুখ থাকবে না। কারমারকরের মাধ্যমে কোনও এজেন্টকে দিয়ে যোগাযোগ করতে পারতেন। কিন্তু ও-ই বলল, 'স্যার, আপনি নিজে এসে কথা বলে যান। এজেন্ট মারফত কথা বললে, ওরা মাঝখান থেকে কমিশন খাবে। তার

pathagar.net

ওপর গ্যারান্টি নেই। হেমাজির নাম করে আপনার কাছ থেকে টাকা নিয়ে নেবে, পরে দেখা যাবে, হেমাজি হয়তো প্রোগ্রামটার ব্যাপারে কিছুই জানেন না। এই রকম ঠগ প্রচুর ঘুরে বেড়াচ্ছে মুম্বই শহরে। মাঝখান থেকে আপনাদের প্রোগ্রাম লাটপাট হয়ে যাবে।'

কারমারকর ভালো পরামর্শই দিয়েছিল। এক ঢিলে প্রোজ্জ্বল দুই পাখি মারার জন্য এসেছেন। হেমা মালিনীর সঙ্গে ব্যক্তিগত আলাপটা হয়ে গেলে, তিনি একটা ব্যবসায়িক দাঁও মারতে চান। তিনি যেসব ড্রেসিং কমপ্লেক্স করছেন, তার ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডার করতে চান হেমা মালিনীকে। মনে মনে ছকে নিয়েছেন প্রোজ্জ্বল। কলকাতায় বড় গোটা তিরিশ হোর্ডিং ছড়িয়ে দেবেন মিত্র কনস্ট্রাকশনের। লোগোটাকে জনপ্রিয় করে তোলার জন্য বিজ্ঞাপন করবেন। হোর্ডিংয়ে থাকবে দুই মেয়ে নিয়ে হেমা মালিনীর ছবি। লিখটা হবে, 'যদি একই কমপ্লেক্সে আমার প্রতিবেশী হতে চান, তা হলে এখানে ফ্ল্যাট নিন।' পারিশ্রমিক তো দেবেনই হেমা মালিনীকে, সেই সঙ্গে একটা অ্যাপার্টমেন্টও। কলকাতায় তিনি থাকুন বা না থাকুন। তিন বছরের চুক্তি একসঙ্গে করে রাখবেন।

ব্যাগেজ ট্রলিতে তুলে প্রোজ্জ্বল বাইরে বেরিয়ে এলেন। কলকাতায় হাড় কাঁপানো ঠাণ্ডা, অথচ মুম্বইয়ে তার রেশ মাত্র নেই। কারমারকর পার্কিং জোন থেকে গাড়ি আনতে গিয়েছে। এ দিক ওদিক তাকাতেই হঠাৎ একজনকে দেখে চমকে উঠলেন প্রোজ্জ্বল। দীপা না? নিজের স্ত্রীকে চিনতে পারবেন না, তা হয় না কি? ওর শরীরের কোথায় কোন তিল আছে, তিনি সবই জানেন। তবুও

অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন। পরনে ডিপ ব্লু শিফন শাড়ি। ম্যাচ করা ব্লাউজ। শ্যাম্পু করা চুল হাওয়ায় উড়ছে। কামনার আগুন জ্বালিয়ে দেওয়ার মতো সুন্দরী। কয়েক হাত দূরে দাঁড়িয়ে, কার সঙ্গে যেন দীপা হেসে হেসে কথা বলছে। আজকাল বোধহয় নিয়মিত জিম-এ যায়। তাই আরও স্লিম লাগছে।

কিন্তু ও মুম্বইয়ে কেন? সঙ্গী ছেলেটাই বা কে? দীপা কি একই ফ্লাইটে কলকাতা থেকে এল? না কি কাউকে সি অফ করতে এসেছে? অন্য কোনও শহর থেকেও আসতে পারে। এই সময়টায় অনেক প্লেন মুম্বইয়ে নামে। ও দিল্লি থেকেও আসতে পারে। ওর বাবা-মা থাকেন দিল্লির বসন্তবিহারে, এক্সপোর্টের ব্যবসা। মাস আটেক আগে বালিগঞ্জের বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছিল দীপা। তার পর থেকে ওর সঙ্গে আর মুখোমুখি দেখা হয়নি। তবে প্রোজ্জ্বল নিয়মিত খোঁজ রেখেছেন।

'স্যার, উঠে আসুন।' কারমারকরের কথায় ঘাড় ঘোরালেন প্রোজ্জ্বল। সুটকেসটা ও ডিকিতে তুলে দিয়েছে। গাড়ির দরজা খুলে দাঁড়িয়ে আছে। পিছনে একগাদা গাড়ির লাইন। অধৈর্য হয়ে হর্ন দিচ্ছে। গাড়ির ভেতরে চট করে ঢুকে একবার পিছনের দিকে তাকালেন প্রোজ্জ্বল। দীপাকে আর দেখতে পেলেন না। মনে অদ্ভুত একটা ফিলিংস হল। একই শহরে ওঁরা দু'জন, অথচ একসঙ্গে থাকবেন না। প্রোজ্জ্বল ঠিক করে নিলেন, হোটেলে ঢুকেই একবার ফোন করবেন রাজাকে। দীপার খবরটা নেওয়ার জন্য। অনেক দিন ধরেই ওকে দীপার পিছনে লাগিয়ে রেখেছেন।

গাড়িতে বসেই কারমারকরের সঙ্গে মুম্বই অফিসের কাজকর্ম নিয়ে কথাবার্তা সেরে নিলেন প্রোজ্জ্বল। অফিস শিবাজি পার্কে, বরজাতিয়া বিল্ডিংসে। কারমারকারকে নিয়ে মাত্র সাত-আটজন স্টাফ। তবুও গত বছর এখানে অফিসটা করেছেন যাতে কোম্পানির প্রেস্টিজ বাড়ে। পুনে, নাসিক আর পানাজিতে তিনটে বড় প্রোজেক্ট ধরার চেষ্টায় আছেন প্রোজ্জ্বল। একেকটা

দেড়শো-দু'শো কোটি টাকার প্রোজেক্ট। কাজগুলো পেলে তিনি ভারসোভার দিকে একটা ফ্ল্যাট কিনে রাখবেন। মাঝে মাঝে মুম্বইয়ে এসে থাকার জন্য।

মুম্বইয়ের ওই অঞ্চলটা খুব দ্রুত পাল্টে যাচ্ছে। কলকাতার অনেক বিজনেসম্যানই ভারসোভায় অ্যাপার্টমেন্ট কিনে রেখেছে। মুম্বই যে একটা অত্যাধুনিক শহর, তা ওই সব অঞ্চলে গেলে বোঝা যায়।

গাড়িটা জ্যামে আটকে গেছে। মুম্বইয়ে এই এক সমস্যা। এ দিকটা পুরনো শহর, রাস্তা তেমন চওড়া নয়। তুলনায় গাড়ির সংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে। জানলার বাইরের দিকে তাকালেন প্রোজ্জ্বল। মধ্যবিত্ত এলাকা। দোতলা-তিনতলা বাড়িগুলোর জীর্ণ অবস্থা। এই সব বাড়ি শহরের পুরনো ক্ষত। ভেঙে ফেলা উচিত। আর্কিটেক্ট হিসাবে তিনি সেটাই চান। নতুন করে সুন্দর সুন্দর কিছু স্কাইক্র্যাপার মাথা তুলে দাঁড়াক। নিম্ন মধ্যবিত্ত বা মধ্যবিত্তদের এই সব অঞ্চলে থাকার কোনও অধিকার নেই। তারা চলে যাক শহরতলিতে। কিন্তু কে এই গুঁড়িয়ে দেওয়ার দায়িত্বটা নেবে? সঞ্জয় গান্ধির মতো বুকের পাটা এখন কারও আছে? ওই লোকটা তখন হিম্মত দেখিয়েছিল বলেই দিল্লি শহরটা আজ দেখার মতো হয়েছে।

'স্যার, সরপুরিয়া-রা আমাদের একটা প্রোজেক্ট দিতে চাইছে। দু'শো কোটি টাকার। একটা প্রোপোজাল

আপনার কাছে পাঠাতাম।' ঘাড় ঘুরিয়ে জানতে চাইল কারমারকর।

'প্রোজেক্টটা কী?'

'পঞ্চগনিতে পাঁচটা ফার্ম হাউস তৈরি করে দিতে হবে। সবাই ফিল্ম ওয়ার্ডের লোক। তবে এখনই তাঁদের নাম ডিসক্লোজ করতে চায় না সরপুরিয়ারা। ওদের একজন এক্সিকিউটিভ ফোন করেছিল। আপনি যদি গ্রিন সিগন্যাল দেন, তা হলে রিপ্লাই দেব।'

'ওরা মুম্বইয়ের কোনও কোম্পানিকে প্রোজেক্টটা দিচ্ছে না কেন?

'কী জানি স্যার। এদের মধ্যে এত রাইভালরি। বলা মুশকিল।'

গাড়ি ফের চলতে শুরু করেছে। প্রোজ্জ্বল দ্রুত ভাবতে লাগলেন। দু'শো কোটি টাকা প্রোজেক্ট এই মুহূর্তে ঘাড়ে নেওয়া সম্ভবই না। কাজ শেষ করতে করতে বছর খানেক লেগে যাবে। এটা নিলে চিড়িয়াখানার ড্রিম প্রোজেক্ট আর তিনি নিতে পারবেন না। পঞ্চগনিতে কার ফার্ম হাউস করে দিলেন,

কলকাতার সেটা কারও নজরে পড়বে না। কিন্তু চিড়িয়াখানার ভেতরে পঁয়তাল্লিশতলায় চারটে বিল্ডিংস,

শপিং মল, মাল্টি প্লেক্স করতে পারলে মিত্র কনস্ট্রাকশন ধরা ছোঁয়ার বাইরে চলে যাবে। ইচ্ছেটা বুকে

ধাক্কা মারে, সাউথ সিটি-র পাশ দিয়ে আসা যাওয়ার পথে। প্রোজ্জ্বল লক্ষ করেছেন, শপিং মল আর

পঁয়ত্রিশতলা বাড়িগুলো লোকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে। তখন মনটা খারাপ হয়ে যায়। সাউথ সিটির

প্রোজেক্টটা ছয়-সাত জন মিলে করেছে। একা করার হিম্মত কারও হয়নি। প্রোজ্জ্বল একাই জু-সিটি

করে দেখিয়ে দেবেন।

... হোটেলে ঘরে ঢুকেই প্রোজ্জ্বল ফোন করলেন রাজাকে, 'কোনও খবর আছে?'

ছেলেটা চট করে সব ধরতে পারে। বলল, 'এ-দিকে আজ অবস্থা খুব খারাপ স্যার।

থেকে গুলি গোলা চলেছে। ভূমি

কাল রাত ওদের কথাবার্তা শুনে মনে হল,

প্রতিরোধ কমিটির লোকেদের হাতেও আর্মস এসে গেছে। টিভিতে

সহজে পিছু হটবে না। আর এস-এর সঙ্গে কনট্যাক্ট করার চেষ্টা

করছিলাম। ফোনে পেলাম না।'

আর এস মানে ... রথীন সর। ফোনে কারও নাম বলাটা উচিত না। আজকাল ফোন ট্যাপ করাটা

জলভাত হয়ে গেছে। প্রোজ্জ্বল বললেন, 'ঠিক আছে ওঁর সঙ্গে আমি কথা বলে নিচ্ছি। ইম্পরট্যান্ট

কিছু ঘটলে তুমি আমাকে ফোন কোরো ।

প্লেনে আসার সময় ইংরেজি কাগজে পড়লাম, চিফ মিনিস্টার

নাকি ওখানে মিটিং করতে যাবেন। কী একটা প্যাকেজ অ্যানাউন্স করবেন। অপোনেন্ট ক্যাম্পের

কোনও খবর আছে?'

' ওদের নেত্রী আজ থেকে অনশনে বসেছেন, স্যর।'

'কতদূর গড়াবে বলো তো মুভমেন্ট? আমার কিন্তু ভালো ঠেকছে না।'

'না স্যর, আর এস কম্পিটেন্ট মানুষ। দেখবেন, উনি ঠিক ঠাণ্ডা করে দেবেন।'

'করলেই ভালো। খিদিরপুরের কোনও খবর আছে?'

'কথা বলেছি। আজ রাতেই অপারেশনে নামবে। খতরনাক সব ছেলে। মনে হয় কাল সকালের

[illegible] রেস্তোরাঁ পাওয়া যাবে। চিন্তা করবেন না স্যার।'

'যাক গে, যে কারণে ফোনটা তোমাকে করলাম। আজই খোঁজ নাও ডি এম এখন কোথায়?'

'উনি মুম্বইয়ে স্যার। লোখণ্ডওয়ালায় আছেন গত এক সপ্তাহ ধরে। বাড়িটার নাম আশীর্বাদ। [illegible] এর উল্টো দিকে। একতা কপুরের সিরিয়ালে নাকি উনি চান্স পেয়েছেন। উনি [illegible] থেকে মুম্বইতে থাকবেন।'

ডি এম মানে... দীপা মিত্র। প্রোজ্জ্বল যে খবরটা জানতে চাইছিলেন, পেয়ে গেছেন।

ফোন ছাড়ার আগে উনি বললেন, 'ঠিক আছে, রাতের দিকে

ফোন কোরো।'

মোবাইল সেট বন্ধ করে জানলার ধারে এসে দাঁড়ালেন প্রোজ্জ্বল। পর্দাটা সরিয়ে দিতেই দেখলেন, চোখের সামনে সমুদ্র। ঘোলাটে জলের ঢেউ আছড়ে পড়ছে বিচে। হোটেলে সব সময় সি ফেসিং রুম পছন্দ করেন প্রোজ্জ্বল। দীপা ভালোবাসত। ওকে নিয়ে অনেকবার মুম্বই এসেছেন। সকালে কত ঘুরে বেরিয়েছেন জুহুর এই বিচে। একবার রাত একটার সময় দীপা আবদার ধরেছিল, বিচে গিয়ে সমুদ্রকে সাক্ষী রেখে চুমু খাবে। এমন রোমান্টিক ছিল ও। রাতের পোশাক পরেই ওরা দু'জন গিয়েছিলেন বিচে। তখন সদ্য বিয়ে হয়েছে। প্রোজ্জ্বল নিছকই একজন বিলেত ফেরত আর্কিটেক্ট। ফাইভ স্টার হোটেলে ওঠার ক্ষমতা ওঁর নেই। ওঁর দু'জনে সে বার ছিলেন নেহাতই সাধারণ সি সাইড বলে একটা হোটেলে। খুব আনন্দে কাটিয়ে ছিলেন সেই দিনগুলো। তখনও দীপার মাথায় ঢোকেনি, অভিনেত্রী হতে হবে।

স্নান করতে করতে নস্টালজিক হয়ে পড়লেন প্রোজ্জ্বল। বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার দিন দীপা বলে গেছিল,'তোমার মতো জানোয়ারের সঙ্গে আমি অন্তত থাকতে রাজি নই।' তার আগে দু'জনের মধ্যে প্রবল কথা কাটাকাটি হয়েছিল। রাগের মাথায় দীপাকে চড় মেরেছিলেন প্রোজ্জ্বল। পেটে অ্যালকোহল তো ছিলই তার ওপর দীপার অভিযোগের জ্বলুনি। সব মিলিয়ে সেদিন নিজেকে সামলাতে পারেননি। দীপা কিন্তু ওর জেদটা বজায় রাখল। শেষ পর্যন্ত অ্যাক্টিং লাইনেই এল। তাও খোদ মুম্বইয়ে। একতা কপুরের সিরিয়ালে চান্স সবাই পায় না। ওর যা কোয়ালিটি আছে; হয়তো একদিন নাম করেও ফেলতে পারে। নাম প্রোজ্জ্বলও করবেন। এমন নাম করবেন, যাতে দীপা একদিন আফশোস করে। শুধু সময়ের অপেক্ষা। চিড়িয়াখানার প্রোজেক্ট সারা ভারতের আর্কিটেক্ট মহলকে চমকে দেবে।

মনটাকে শক্ত করে বাথরুম থেকে বেরিয়ে এলেন প্রোজ্জ্বল। দীপার কথা আর তিনি ভাববেন না। দু'জনের রাস্তা আলাদা হয়ে গেছে। কোনওদিন মিলবে বলে মনে হয়

pathagar.net

না। সুটকেস থেকে পোশাক বের করে তিনি পরতে থাকলেন। দরজায় নক্ করার শব্দ। প্রোজ্জ্বল 'কাম ইন' বলতেই ভেতরে ঢুকে এল কারমারকর। বলল, 'একটা প্রবলেম হয়ে গেছে স্যর।'

টাই বাঁধতে বাঁধতে প্রোজ্জ্বল বললেন 'হোয়াট ইজ দ্যাট ?'

'হেমা মালিনীর ম্যানেজার ফোন করেছিলেন। অ্যাপয়েন্টমেন্ট ক্যানসেলড।'

টাই বাঁধা থামিয়ে প্রোজ্জ্বল জানতে চাইলেন 'কেন?'

'আজ সকালেই নাকি ওঁর মেক আপ আর্টিস্ট আর হেয়ার স্টাইলিস্ট পঞ্চগনি চলে গেছেন। ওখানে কোনও একটা ছবির শুটিং আছে। ম্যানেজার ভদ্রলোক বললেন ওরা দু'জন ফিরে না আসা পর্যন্ত হেমাজি কারও সঙ্গে দেখা করবেন না। আসলে কী জানেন স্যর, বিনা মেক আপে নর্মালি ওরা বাইরে আসেন না।'

'হোয়াট ননসেন্স।' কর্পোরেট মেজাজেই প্রোজ্জ্বল বলে ফেললেন, 'দিস ইজ নট ফেয়ার।'

'কী করবেন স্যার, ফিল্ম আর্টিস্টরা এ রকমই মুডি। ওয়েট করা ছাড়া আর কোনও উপায় নেই।'

শুনে রাগে বিছানার ওপর টাই ছুঁড়ে ফেললেন প্রোজ্জ্বল।

১০

ভোর সাড়ে ছ'টায় চিড়িয়াখানার বাগানে টহল দেওয়ার সময় হরিণের এনক্লোজারে একটা বিশ্রী ব্যাপার চোখে পড়ল শিউচরণের। একটা মণিপুরি হরিণের পিঠে বারবার উড়ে বসতে চাইছে একটা কাক। আর তাকে পিঠে বসতে দেবে না বলে হরিণটা পাগলের মতো ছোটাছুটি করছে। শিউচরণের অভিজ্ঞ চোখ। দৃশ্যটা দেখেই ও বুঝল, হরিণটার পিঠে কোনও কারণে ঘা হয়েছে। সেই ঘা ঠোকরাতে চাইছে

কাকটা। সর্বনাশ, এই দৃশ্যটা কোনও ভিজিটরের চোখে পড়লে, কমপ্লেন হয়ে যাবে। আপিস ঘরের সামনে গিয়ে চেল্লামেল্লিও শুরু করতে পারে, আপনারা জন্তুদের ঠিক মতো দেখাশুনো করেন না। কত রকমের লোক আছে। ন'টা বাজার আগেই, হাসপাতালে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া দরকার হরিণটাকে। কারণ তার পর থেকে টিকিট বিক্রি শুরু হয়ে যায়।

হরিণদের চোট আঘাত অবশ্য চিড়িয়াখানায় খুব স্বাভাবিক ঘটনা। বিশেষ করে, ওদের মেটিং সিজনে। পুরুষ হরিণটা হয়তো যৌন সঙ্গম করতে চায়, মাদী হরিণটা রাজি হচ্ছে না। অনেক সময় রেগে গিয়ে পুরুষ হরিণটা শিঙ দিয়ে গুঁতোয়। শিঙে শিঙে ঠোকাঠুকি শুরু হয়ে যায়। শিউচরণ দেখেছে,

এর ফলে অনেক সময় মাদী হরিণটা মারাও গিয়েছে। একটু জন্তু মারা গেলে এখন নানা ধরনের কৈফিয়ত দিতে হয় কিপারদের। পোস্ট মর্টেম করার পর যদি কিপারের গাফিলতি ধরা পড়ে, তা হলে রক্ষে নেই। এই ডিরেক্টর সাহেব কড়া ব্যবস্থা নেন। উনি করবেনটাই বা কী। শীতের এই সময়টায় রিপোর্টাররা যে চিড়িয়াখানায় ঘুরঘুর করে। ওঁরা ছাড়াও আছেন অ্যানিমেল লাভাররা। একটা খুঁত পেলেই হল। ডিরেক্টর সাহেবের রাতের ঘুম ওঁরা হারাম করে দেন।

হরিণদের এই এনক্লোজারগুলো আগে দেখাশুনো করত রামভজন আর পালিত। রামভজন নেই। তাই বিট্টু বলে একজনকে পালিতের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। আশপাশ তাকিয়ে শিউচরণ দেখল, পালিত বা বিট্টু-কারও পাত্তা নেই। গেল কোথায় ওরা? নিশ্চয়ই স্টোর রুমে গেছে অথবা কিচেনে। এই সময়টায় এনক্লোজার পরিষ্কার করা হয়। হরিণদের খেতে দেওয়ারও সময়। দু'জনের একজন অন্তত এনক্লোজারের ভেতর থাকবে। জুনিয়র এই ছেলেগুলোর কোনও কাণ্ডজ্ঞান নেই। ডেকে এখন ধমক দিলে, উল্টো ফল হবে। পালিত ছেলেটা যে রাইভাল ইউনিয়নের।

জন্তুদের কারওর মধ্যে কোনও অস্বাভাবিক কিছু দেখলে, সঙ্গে সঙ্গে তা ডিরেক্টর সাহেবের কানে পৌঁছে দেওয়াটাই নিয়ম। তাই মণিপুরি ওই হরিণটার ঠিক কী হয়েছে, নিজের চোখে দেখার জন্য, পরিখা পেরিয়ে শিউচরণ এনক্লোজারের ভেতর ঢুকে এল। মণিপুরি হরিণ সিডিউল ওয়ান প্রাণী। মানে ' ভক্সিল শ্রেণিভুক্ত। সেই জন্যই ওদের খাতির বেশি। কয়েক বছর আগেও মনে করা হত, মণিপুরি হরিণ বিলুপ্ত হয়ে গেছে। কিন্তু এক সাহেব নাকি মণিপুরের জঙ্গলে ঘোরার সময় ফের ওদের আবিষ্কার করেন। তিনিই একটা পুরুষ আর মাদী হরিণকে ধরে এনে কলকাতার এই চিড়িয়াখানাকে উপহার দেন। জামাইবাবুর মুখে শিউচরণ শুনেছে,
সেই দুটো হরিণের প্রথম বাচ্চা হওয়ার পর নাকি তখনকার ডিরেক্টর ব্যানার্জি সাহেব আনন্দে সবাইকে মিষ্টি খাইয়েছিলেন। এখন চিড়িয়াখানায় প্রচুর হরিণ।

চিঙ্কারা, ব্ল্যাকবাক, চিতল বারশৃঙ্গা, সাদা ফ্যালো, সম্বর থেকে শুরু করে নানা জন্তুদের মধ্যে চিড়িয়াখানায় এখন ওদের সংখ্যাটাই সব থেকে বেশি।
প্রজাতির। বলতে গেলে,

চোট পাওয়া হরিণটাকে ভালো করে এ বার দেখতে পেল শিউচরণ। পিঠে বেশ বড় ক্ষত, রক্ত গড়াচ্ছে। নাহ, এটা নিজেদের মধ্যে মারামারি করার চিহ্ন নয়। তার থেকেও বড় কিছু সম্ভবত, কোনও খোঁচার জন্য হয়েছে। ফেন্সিং লোহার তার দিয়ে ঘেরা। কোথাও কি তার ছিঁড়ে টিঁড়ে গেছে। হয়তো হুটোপাটি করার সময় হরিণটার খোঁচা লেগেছে। লম্বা এনক্লোজারে একবার নজর বোলাল শিউচরণ। টালির শেড থেকে দশ বারোটা হরিণ বেরিয়ে এসেছে।

আপন মনে ঘুরে বেড়াচ্ছে মাঠে। না, কোথাও কিছু হয়নি।

'শিউদা তুমি এখানে?'

পালিতের গলা শুনে শিউচরণ দাঁড়িয়ে পড়ল। গায়ে দামি জ্যাকেট, কিন্তু কান মাফলার দিয়ে ঢাকা। সামান্য ঠাণ্ডাতেই কাবু হয়ে গেছে। পালিতের দিকে তাকিয়ে একটু বিরক্তই হল ও। বলল, ' তোরা কী করিস বল তো পালিত? এই হরিণটাকে দেখেছিস?'

মানুষ দেখে কাক উড়ে গিয়ে বেড়ার ও পর বসেছে। মণিপুরি হরিণটা যন্ত্রণায় হঠাৎ শুয়ে পড়ল। চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছে। সে দিকে তাকিয়ে পালিত বলল, 'আরি বাস, কী করে হল? কাল বিকেলেও তো দেখিনি। বিট্টুকে জিজ্ঞেস করে দেখ।'

শিউচরণ বলল, 'কথা না বাড়িয়ে খাঁচা নিয়ে আয়। এটাকে এখুনি হসপিটালে নিয়ে যেতে হবে।'

পালিত বলল, 'খাঁচাটা শেডের পিছনে পাঁচিলের দিকে আছে। দাঁড়াও আনছি। তার আগে ডিরেক্টর সাহেবকে একবার জানাবে নাকি?'

'পরে জানালেও হবে। আগে যা বললাম, কর।'

দ্রুত পায়ে এনক্লোজারের পিছনের দিকে চলে গেল পালিত। শিউচরণ খুব খুঁটিয়ে লক্ষ করতে লাগল ধুঁকতে থাকা হরিণটাকে। সাইজে বেশ বড়। এই এনক্লোজারে আগে ও কাজ করে গেছে। ভালো করে দেখে হরিণটাকে ও চিনতে পারল। একমাত্র এই হরিণটার গায়েই সাদা সাদা কয়েকটা দাগ আছে। মজার ব্যাপার হল, কেউ ছবি তুলতে চাইলে এই হরিণটা পোজও দেয়। পরিচিত কোনও ভিজিটর এলে, শিউচরণ আগে এই 'মডেল' হরিণটাকে দেখাত। বাইরে থেকে ভিজিটরদের মধ্যে কেউ ক্যামেরা তাক করলেই হরিণটা ফেন্সিংয়ের সবথেকে কাছে,ছোট্ট একটা গাছের তলায় গিয়ে এক পা তুলে দাঁড়ায়। ক্লিক না-করা পর্যন্ত দাঁড়িয়েই থাকে। চেনা এক ফটোগ্রাফারের কাছে কথাটা বলেছিল শিউচরণ। পরের দিন সেই ছবি কাগজে বেরোয়। তারপর থেকে বাচ্চারা এসে আগে এই হরিণটাকে দেখতে চায়।

'শিউদা, শিগ্গির এসো।' টালির ঘরের ভেতর থেকে চিৎকার

করে বলল পালিত। 'মারাত্মক ব্যাপার ঘটে গেছে।'

ওর গলা শুনে শিউচরণের বুকটা ধক করে উঠল। দৌড়ে যেতে গিয়েও ও নিজেকে সামলে নিল। ওকে ছুটতে দেখলে হরিণরা ভয় পেয়ে যাবে। এমনিতে ওরা খুব ভীতু। মাঠে ওরাও দৌড়াদৌড়ি শুরু করে দেবে। তাই জোরে পা চালিয়ে শিউচরণ শেডের নীচে এল। যা দেখল, তাতে ওর মাথা ঘুরে যাওয়ার জোগাড়। একটা পূর্ণ বয়স্ক হরিণের শরীর থেকে পুরো চামড়াটা কেউ ছাড়িয়ে নিয়েছে। মুণ্ডু নেই, শিঙও গায়েব। মেঝে রক্তে মাখামাখি। রক্ত মাখানো জুতোর ছাপ পাঁচিলের দিকে চলে গেছে। শেডের পিছন দিকে পাঁচিলের গায়ে বাঁশঝাড়। গভীর রাতে কেউ ওখানে বসে দুষ্কর্মটা করে থাকলে, কারও চোখে
পড়ার কথা নয়। চিড়িয়াখানায় এই ধরনের ঘটনা আগে কখনও ঘটেনি।

পকেট থেকে মোবাইল সেট বের করে সঙ্গে সঙ্গে ডিরেক্টর সাহেবকে ফোন করল শিউচরণ।

বলল, 'সার, আপনি এখুনি একবার হরিণদের মণিপুরি এনক্লোজারে চলে আসুন। রেপ্টাইল হাউসের দিকে।' কারণটা ও অল্প কথায় বলে দিল।

পালিত বলল, 'কী করে হল, শিউদা?'

ঘরের চারদিকে নজর দিতে দিতে শিউচরণ বলল, ' এ পাকা হাতের কাজ, বুঝলি। রাতের দিকে ঢুকেছে। ঘণ্টা তিনেকের মধ্যে

কাজ সেরে চলে গেছে। সিকিউরিটির কেউ আছে কী না, গিয়ে দ্যাখ তো? শুয়ারের বাচ্চাগুলো কি কাল রাতে ঘুমোচ্ছিল?'

পালিত লোহার দরজা খুলে বেরিয়ে যাওয়ার পর, মৃত হরিণটার দিকে শিউচরণ তাকিয়ে রইল। মানুষ এত নিষ্ঠুর হতে পারে? বুকের ভেতরটা ওর মুচড়ে উঠল। কাজটা কেউ একা করেনি। কম করে দু'জন তো ছিলই। নিঃশব্দে কাজটা করে চলে গেছে। প্রশ্ন হচ্ছে, এ রকম একটা অবলা জীবকে মারতে পারল কী করে? রাতের দিকে বাগানের প্রতিটা মোড়ে সিকিউরিটির লোক থাকে। হাতে টর্চ আর লাঠি নিয়ে। এরা সব এজেন্সির লোক। সবুজ উর্দি পরা, সারা দিনই টহল দেয়। ওদের চোখ এড়িয়ে পোচার ভেতরে ঢুকল কী ভাবে, সেটা শিউচরণ ভেবে পেল না। রোজ সন্ধে ছ'টার সময় বাগানের ভেতর থেকে ভিজিটর বের করে দেওয়া হয়। কিপাররাও এনক্লোজারে তালা দিয়ে, একবার জন্তুদের ভালো করে দেখে, কোয়ার্টারে চলে যায়। কেউ লুকিয়ে বাগানের ভেতরে থেকে যাবে, এটা হতেই পারে না।

তা হলে কি পিছনের পাঁচিল টপকে কেউ ঢুকল? অসম্ভব। চিড়িয়াখানার পশ্চিম দিকে পুরোটা পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। হরিণ এনক্লোজারের পশ্চিমদিকে, পাঁচিলের ঠিক ও পাশেই মিলিটারিদের কমান্ড হাউস। এখন যার নাম হয়েছে সেনাপতি ভবন। একেবারে গায়ে গায়ে খিদিরপুরের আবহাওয়া অফিস। তার পর সেন্ট টমাস স্কুল। রক্তমাখা পায়ের ছাপ ধরে শিউচরণ বাইরে বেরিয়ে এল। প্রায় বারো ফুট উঁচু ইট-সিমেন্টের দেওয়াল, তার উপর কাঁটা তারের বেড়া। কমান্ড হাউস টপকে আসার কোনও প্রশ্নই নেই।

আবহাওয়া আপিসের দিক থেকে অবশ্য যে কেউ মই বেয়ে উঠে আসতে পারে। কিন্তু সেটা কি সম্ভব? ও দিকেও তো লোকজন পাহারা দেয়।

কিন্তু ঘটনাটা বাস্তবে ঘটেছে। রাতে হরিণের এনক্লোজারে ঢুকে কেউ বা কারা একটা হরিণকে মেরে, তার চামড়া ছাড়িয়ে নিয়ে চলে গেছে। শিউচরণের মনে পড়ল, হায়দরাবাদ জু-তে কিছুদিন আগে এ রকম একটা ঘটনা ঘটেছিল। হরিণ নয়, বাঘের ছাল ছাড়িয়ে নিয়েছিল পোচাররা। ওই খবরটা কাগজে পড়েই বোধহয় এখানকার পোচাররা প্ল্যানটা করেছে। বাঘের চামড়া, নখ, দাঁতের চাহিদা আর দাম জ্যান্ত বাঘের চেয়েও বেশি। এখানে হরিণের চামড়া কার কী কাজে লাগবে? আগে হরিণের চামড়ার জুতো সৌখিন লোকেরা পরত। হরিণ শিকার করে, তার চামড়া বাড়ির দেওয়ালে টাঙিয়ে রাখত। ওয়াইল্ড লাইফ প্রোটেকশন অ্যাক্ট হয়ে যাওয়ার পর এখন এ সব দণ্ডনীয় অপরাধ। আইন সলমন খানের মতো লোককেও ছাড়েনি। চিঙ্কারা, ব্ল্যাকবাক হরিণ মারার দায়ে ওকে জেল খাটতেও হয়েছে।

'কী করে হল এ সব শিউচরণ?'

ডিরেক্টর সাহেবের গলা শুনে শেডের ভেতরে ঢুকে এল শিউচরণ। স্যারের পরনে পাজামা আর পাঞ্জাবি। মানে যে অবস্থায় ছিলেন, চলে এসেছেন। সঙ্গে রাতের ডিউটিতে থাকা দু'তিনজন গার্ড আর পালিত। স্যর প্রথমেই বললেন, 'পুলিশকে আগে একটা খবর

দেওয়া দরকার। যত কুইক সম্ভব।

প্রশান্তকে কি কিছু জানিয়েছ?'

'না স্যর।'

'ওকে বলো। কোয়ার্টার থেকে ওয়াটগঞ্জ থানায় ফোন করে তার পরে যেন এখানে আসে।'

হসপিটালের ওপরেই অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর প্রশান্তবাবুর কোয়ার্টার। উনি মোবাইল ব্যবহার করেন

না। খবর দিতে হলে, ওঁর বাড়িতে গিয়ে দিতে হবে। অন্য কোনও উপায় নেই। শিউচরণ চোখে ইশারা

করতেই পালিত পা চালিয়ে বেরিয়ে গেল। সাহেব ঘরের চারপাশটা ঘুরে-ঘুরে দেখছেন। এনক্লোজারে এই শেডটা আগের ডিরেক্টর সাহেবকে অনেক বলে বলে করিয়েছিল শিউচরণ। কাকদের অত্যাচার থেকে হরিণদের বাঁচানোর জন্য। আগে খোলা জায়গায় হরিণদের খাবার দেওয়া হত। অর্ধেকটাই খেয়ে চলে যেত কাক। এই শেড হওয়ার পর থেকে কাকের সেই উৎপাত কমেছে। শীতের সময় পুরু করে খড় বিছিয়ে দেওয়া হয় এখন, যাতে হরিণদের ঠাণ্ডা না লাগে। খড়ের সেই মেঝেতে এখন চাপ চাপ রক্ত।

'পিছনের পাঁচিল টপকেই এসেছিল, বুঝলে শিউচরণ।' ডিরেক্টর সাহেব বললেন,'এখান থেকে রেপ্টাইল হাউসের মাঝে, কোনও একটা পয়েন্ট দিয়ে ওরা নীচে নেমেছিল। বিচালির অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে, কোনও কারণে হরিণগুলো মারাত্মক ভয় পেয়ে দৌড়াদৌড়ি শুরু করে। দেখ, বিচালি কেমন ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। প্রশ্ন হচ্ছে, সেই সময় নিশ্চয়ই কোনও না কোনও আওয়াজ হয়েছে। সিকিউরিটি গার্ডরা টের পেল না কেন? ওরা তখন কী করছিল?'

'ঠিক বলেছেন স্যর। একটা হুটোপাটি তখন হয়েছিল। দেখলাম, একটা হরিণ সেই কারণে চোটও পেয়েছে। ওকে ইমিডিয়েটলি হসপিটালে নিয়ে যেতে হবে। কিন্তু যে হরিণটাকে মেরেছে, তাকে কবজা করল কীভাবে, সেটাই বুঝতে পারছি না স্যর।'

'মনে হয়, ট্রাঙ্কুলাইজড করেছিল। খুব কাছ থেকে মুখে ব্লো পাইপ দিয়ে। সেন্সলেস হয়ে যাওয়ার পর ধারালো কোনও অস্ত্র দিয়ে মুণ্ডটা আলাদা করেছে প্রথমে। তার পর চামড়াটা ছাড়িয়ে নিয়েছে।

চামড়া ছাড়িয়ে নেওয়ার কায়দাটা দেখেছ? এক্সপার্ট লোকের কাজ বলে মনে হচ্ছে। লোকটাকে যদি এখন হাতের কাছে পেতাম, গুলি করে মেরে তারপর ঝিলের জলে ফেলে দিতাম।'

স্যরের মুখে কাউকে সামান্য চড় মারার কথাও কোনওদিন শোনেননি শিউচরণ। পড়াশুনোর জগতের মানুষ। বহুত পণ্ডিত। সেই লোকের মুখে ক্রোধের রেখা দেখে ও অবাক হয়ে গেল। হরিণটাকে ওই অবস্থায় দেখে একটু আগে ওরও মারাত্মক রাগ হয়েছিল। ও বলল, 'আমার সেই ইচ্ছে হচ্ছে স্যর।'

'কাজটা কারা করতে পারে বলো তো?'

শিউচরণের মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, 'কারা আবার, খিদিরপুরের কোনও অ্যান্টি সোসাল গ্রুপ হবে। ঠিক বের করে নেব। ওদের অনেকের সঙ্গে আমার জানাশুনো আছে। রোজই বাজারে দেখাসাক্ষাৎ হয়। জিজ্ঞেস করলে কেউ না কেউ বলে দেবে।'

'না। না। তুমি মাথা গলাতে যেও না। কোত্থেকে কোন ঝামেলায়

জড়িয়ে পড়বে। তোমার সিকিউরিটি তখন কে দেবে? তোমারও তো ফ্যামিলি আছে। এটা পুলিশের কাজ, পুলিশকে করতে দাও। কাগজে এই ঘটনাটা বেরোলে আমার খুব বদনাম হয়ে যাবে। কী আর করা যাবে। দেখি, রথীন সরকে একবার ফোন করে। উনি পলিটিক্যাল লোক। উনি যদি পুলিশকে চাপ দেন তা হলে ক্রিমিনালগুলো ধরা পড়তে পারে। যাক গে, আমি এ দিকটা সামলাচ্ছি। তুমি ইনজিয়র্ড হরিণটাকে নিয়ে আগে হসপিটালে চলে যাও। এটাকে পরে পোস্টমর্টেমের জন্য তোমার কাছে পাঠাচ্ছি।'

সকাল প্রায় সাতটা বাজে। হসপিটালে পেশেন্টরা খাওয়ার জন্য নিশ্চয়ই চেল্লামেল্লি শুরু করে দিয়েছে। শিউচরণ আর সময় নষ্ট করল না। চোট পাওয়া হরিণটাকে খাঁচায় ভরার সময় ও দেখল, পুলিশ এসে গেছে। বাগান থেকে বেরিয়ে আসতে ইচ্ছেই করছিল না। তবু স্যার বলেছেন বলে শিউচরণ হসপিটালে চলে এল। হসপিটালে ঢোকার পর হঠাৎই ওর মনে হল, সার কি ওকে সন্দেহ করেন? তাই স্পট
থেকে সরিয়ে দিলেন? যাতে খবরটা রিপোর্টারদের কানে না যায়? শিউচরণ ঠিক করে নিল, হরিণটার কথা ও কাউকেই বলবে না। এমন কী, সাঁঝেলি ম্যাডামকেও না।

১১

মেট্রো সিনেমার ফুটপাতে দাঁড়িয়ে রয়েছে অর্ক। উল্টো দিকে, মঞ্চ থেকে গরম গরম বক্তৃতা হচ্ছে।

সোনারপুরের ঘটনা নিয়ে। খবরটা ও-ই প্রথম করেছিল। সেই কারণে, রোজ ফলো আপ করতে হচ্ছে।

আজ বিরোধী দলের নেত্রী ঢাক ঢোল বাজিয়ে অনশনে বসলেন। ভগবানপুরে জমি অধিগ্রহণ বন্ধ না

করা পর্যন্ত তিনি নাকি অনশন চালিয়ে যাবেন। মঞ্চে রয়েছে নিরঞ্জন রাফতান, উচ্ছেদ প্রতিরোধ
কমিটির প্রেসিডেন্ট । আসলে তার সঙ্গে
দেখা করার জন্যই অর্ক অপেক্ষা করছে। রাফতান মঞ্চ থেকে
নেমে এলে, আড়ালে কথা বলে নেবে। অন্য রিপোর্টারদের সামনে ও কথা বলতে চায় না।

কাল সারাটা দিন অর্ক ভগবানপুরে কাটিয়েছে। ফাঁকা জায়গা, জাঁকিয়ে ঠাণ্ডা পড়েছে ওই সব
অঞ্চলে। রাতে শরীরটা ভালো লাগছিল না। সকালে জ্বর জ্বর ভাব ছিল। তা সত্ত্বেও ও আজ অফিসে
এসেছে। বাড়িতে একা সারাটা দিন করবে কী? তা ছাড়া, রিপোর্টারদের এত সহজে কাবু হলে চলে? ব্রেকফাস্ট করার পর ও একটা ক্রোসিন ট্যাবলেট খেয়ে নিয়েছিল। তবুও ম্যাজম্যাজানি কমেনি। অর্ক ঠিক করেছে, অনশনের রিপোর্টটা লিখে দিয়েই ও বাড়ি চলে যাবে।

'বস, তুই এখানে? তোর তো বাজে রোগ নেই।' ভিড়ের মাঝে কে যেন কথাটা বলল।

অর্ক তাকিয়ে দেখল বুচান। পুরনো পাড়ার পরিচিত ছেলে। প্রশ্রয় দিলে মাথায় চড়বে। গম্ভীর হয়ে
বলল, 'বাজে রোগ মানে?'

' লোকে তো মেয়েছেলে তোলার জন্য এখানে ঘোরাঘুরি করে। তুই রিপোর্টার, তোরও জানা
উচিত ।'

একে শরীর ভালো নেই, তার ওপর ফালতু কথা শুনে রাগ হয়ে গেল অর্কর। বলল, 'তুইও কি এই
কারণে ঘোরাঘুরি করছিস?'

বুঝতে পেরে বুচান বলল, 'রাগ করলি, বল? আমি ঠাট্টা করছিলাম রে।'

'ঠাট্টা বোঝার সময় আমার নেই। আমি মিটিং কভার করতে এসেছি।'

কাঁধে হাত রেখে বুচান বলল, 'কেমন আছিস বল। তোকে নিয়ে পাড়ায় আমরা কত গর্ব করি,

জানিস? অনেকদিন পর দেখা হল। চল, কোথাও বসে একটু চা-ফা খাই।'

চায়ের কথা শুনে অর্ক না করতে পারল না। পেটে গরম কিছু গেলে ভালো লাগবে। দু'পা এগোলেই মেট্রো সিনেমার লাগোয়া একটা চায়ের দোকান আছে। ওখান থেকে মঞ্চের দিকেও খেয়াল রাখা যাবে। তাই ও বলল, 'চল তা হলে।'

বুচানটা একই রকম আছে। স্কুলে পড়ার সময় ভালো ফুটবল খেলত। তার পর পাড়ার বাম দাদাদের পাল্লায় পড়ে হাতে লাল ঝাণ্ডা ধরল। খেলাটা ছেড়ে দিল। অর্ক যতদিন টালিগঞ্জের বাড়িতে ছিল, প্রায়ই ওকে মিটিং-মিছিলে দেখত। দাদু বোর্ডিং স্কুলে পাঠিয়ে দিল। তারপর থেকে বুচানদের সঙ্গে কালেভদ্রে দেখা হয়েছে। ভদ্রতা করে অর্ক জিজ্ঞেস করল, 'তুই কি এখনও টালিগঞ্জে আছিস?'

'কোথায় আর যাব? ওই ভাঙাচোরা বাড়িতেই কোনও রকমে আছি। জীবনে কিছুই করতে পারলাম না রে।' বুচানের গলায় স্পষ্টতই হতাশা।

'কী করছিস এখন?'

'চাকরি করি, ভাগাড়ে। কর্পোরেশনের সবথেকে ওঁচা ডিপার্টমেন্ট। জঞ্জাল পরিষ্কারের ডিপার্টমেন্টে। তখন যদি লাল ঝাণ্ডা হাতে না নিয়ে,

তোর মতো লেখাপড়াটা মন দিয়ে করতাম, তা হলে আজ আমার এই দশা হত না।'

চাওয়ালা চায়ের ভাঁড় এগিয়ে দিয়েছে। হাতে নিয়ে অর্ক বলল, 'কেন, কর্পোরেশনের মাইনে তো খারাপ না। এত আফশোস করছিস কেন? তোদের পার্টি অ্যাদ্দিন ধরে পাওয়ারে। তোর পজিশন তো খারাপ হওয়ার কথা না। অনেকেই লুটেপুটে খাচ্ছে।'

চায়ে চুমুক দিয়ে বুচান বলল, 'আমি পারলাম না রে। বিবেকে আটকাল। পার্টি থেকে এক্সপেলড হয়ে গেছি। চাকরিটা পার্টিই দিয়েছিল। কেড়ে নেয়নি। তবে এমন একটা জায়গায় ঠেলে দিয়েছে, কাউকে বলতে পারি না।'

'বিয়ে থা করেছিস?'

'করেছি। এক কমরেডের মেয়েকে। তুই চিনতিস, স্বস্তিকা। আর সেটা আমার জীবনের আরেকটা

মস্ত বড় ভুল। তুই খুব ভালো আছিস ভাই। বিয়ে টিয়ে করিসনি, নির্ঝঞ্ঝাট। তোর খবর দেয় বিনয়। তোদের অফিসেই কাজ করে, প্রসেস না কী ডিপার্টমেন্টে। ফ্ল্যাটারি করছি না, তোর চাঁচাছোলা লেখা কিন্তু আমার খুব ভালো লাগে।'

মঞ্চের দিকে লক্ষ রাখতে রাখতে অর্ক বলল, 'কর্পোরেশনের

তো।'

কোনও খবর থাকলে আমাকে দিস 'করবি? একটা খবর আছে। অবশ্য কর্পোরেশনকে তাতে বাঁশ দেওয়া যাবে না। তবু মনে হয়, লোকে এটা পড়বে।'

অর্ক আগ্রহ দেখাল, 'কী খবর রে?'

'চিড়িয়াখানায় একটা হরিণ আজ মার্ডারড হয়েছে।'

'মার্ডারড হয়েছে? কী করে জানলি?'

বুচান বোঝাতে লাগল, 'চিড়িয়াখানায় যে সব জীবজন্তু মারা যায়, তাদের সদ্গতি করি আমরা । মানে আমাদের ডিপার্টমেন্ট । আজ দুপুরে হরিণের একটা বডি এসেছে, যার মুণ্ডুটা নেই ।আমার সন্দেহটা হয় এই কারণেই । এমনিতে ডেড বডি পাঠানোর আগে ওরা ছাল চামড়া ছাড়িয়ে নেয়। সেগুলো নিজেরাই ডেস্ট্রয় করে পাঠায়, যাতে বাইরে কেউ বিক্রি করতে না পারে । এটা করে, বিশেষ করে, বাঘ- সিংহ বা হরিণের ক্ষেত্রে । আজ হরিণের মুণ্ডুটা নেই দেখে, পোস্ট মর্টেম রিপোর্টটা চেয়ে পাঠালাম। দেখলাম, লেখা আছে মারা গেছে স্ট্রাঙ্গুলেশন জড়িত কারণে । ডাহা মিথ্যে । সেই জেরক্স কপি আমার কাছে আছে। একটা নিরীহ প্রাণীকে কেন ফাঁস দিয়ে মারা হবে বল তো? নিশ্চয়ই এর পিছনে পোচাররা আছে । তুই খুঁজে বের কর। দরকার হলে তোকে জেরক্স কপিটা দিতে পারি।'

অর্ক বলল, 'দে।' বলার পরই ওর চোখে পড়ল মঞ্চে রাফতান নেই। কোন ফাঁকে নেমে গেছে। জেরক্সের কপি আর ফোন নাম্বারটা বুচানের কাছে তাড়াতাড়ি চেয়ে নিয়ে ও বলল, 'দরকার হলে পরে

।র সঙ্গে যোগাযোগ করব। আমি চলি রে।'

রাস্তার উল্টো দিকে মঞ্চের কাছে এসে অর্ক কোথাও দেখতে পেল না রাফতানকে। লোকটা উবে

।ল না কি? হঠাৎই ওর চোখে পড়ল, একটা টিভি চ্যানেলের গাড়িতে রাফতান বসে আছে। চ্যানেলের ।।পোর্টাররা আজকাল ওত পেতে বসে থাকে। প্যানেল ডিসকাশনে কাউকে বসাতে পারলেই হল। ।।ন্টা খানেক ধরে তাকে চটকায়। চব্বিশ ঘণ্টার সব নিউজ চ্যানেল। সময় কাটাবে কী করে? এ বার ।।।।মিক পরীক্ষায় যে ছেলেটা প্রথম হল, একটা চ্যানেল তাকে রেজাল্ট বেরোনোর আগের রাতেই ।।কটা

হোটেলে লুকিয়ে রেখেছিল। যাতে অন্য কোনও চ্যানেল তার কোনও বাইট না পায়। চ্যানেলে চ্যানেলে এমন রেষারেষি। হয়তো এমনও দিন আসবে, যে দিন এই ধরনের লোক কাড়াকাড়ি নিয়ে টিভি রিপোর্টারদের মধ্যে মারপিট হয়ে যাবে।

আর বক্তৃতা শুনে লাভ নেই। অনশনের কপি খুব একটা খাবে না।

মেট্রো স্টেশনের দিকে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ অর্কর মনে হল, বুচান যে খবরটা দিয়ে গেল, সেটাই বরং চেজ করা যাক। কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপ বেরিয়ে পড়তে পারে। আগে চিড়িয়াখানায় না গিয়ে, একবার ওয়াটগঞ্জ থানায় কথা বলে নেওয়া যেতে পারে। ওখানে এখন ও সি হয়ে এসেছে পুলক তালুকদার। অর্কর অনেকদিনের চেনা। রসিক মানুষ, পুলিশে বিরল। ফোনে কিছু জিজ্ঞেস করলে, অন্তত উত্তরটা দেবে। মোবাইল সেটে ওসি-র নাম্বারটা আছে। সেটা বের করে অর্ক সুইচ টিপল।

'বলুন অর্কবাবু, কী উপকারে লাগতে পারি?' তালুকদারের গলা শুনে অর্ক নিশ্চিন্ত। আগের

মতোই আন্তরিকতার টান।

ও বলল, 'একটা খবরের জন্য ফোনটা করলাম।'

' সে তো বুঝতেই পারছি। আপনি নিশ্চয়ই শেয়ার বাজারের দর জানার জন্য আমাকে ফোন করবেন না।'

'আপনার ঘরে এখন কেউ আছে?'

'আছেন, এক সুন্দরী ভদ্রমহিলা। এই মাত্র যাকে আমরা মধুচক্রের বিছানা থেকে তুলে এনেছি।'

'আপনাকে নিয়ে মশাই পারা গেল না। ঘরে কোনও রিপোর্টার আছে কী না, জানতে চাইছি।'

' না নেই। নিশ্চিন্তে কথা বলতে পারেন। কী জানতে চান? চিড়িয়াখানার ঘটনাটা তো? আমার এক

pathagar.net

এস আই ইনভেস্টিগেশনে গেছিল। তার মুখে যা শুনেছি, সেটা বলতে পারি। হ্যাঁ, ব্রাউ অ্যানটেলারড [illegible]টা মার্ডারড হয়েছে। আপনি মশাই, সত্যিকারের ভালো রিপোর্টার। কিন্তু এর মধ্যেই খবরটা পেয়ে গেলেন কী করে?'

পাত্তা না দিয়ে অর্ক বলল, 'এ রকম ঘটনা কিন্তু আগে কখনও চিড়িয়াখানায় ঘটেনি।'

'এখন ঘটবে না কেন বলুন। প্রাইভেট এজেন্সি দিয়ে কি সিকিউরিটির কাজ হয়? প্রপার ট্রেনিং নেই। কতগুলো তালপাতার সেপাইকে হাতে লাঠি আর টর্চ ধরিয়ে দিলেই কি গার্ডের কাজ পাওয়া যাবে? দীপেন্দু বিশ্বাসের কাছ থেকে কি আপনি চুনী গোস্বামীর খেলা পাবেন? পাবেন না।'

'রাতে যারা ডিউটিতে ছিল তারা কি বলছে?'

'শুনলে হাসবেন মশাই। চিড়িয়াখানার ওই দিকটায় নাকি ভূত আছে। গভীর রাতে মাঝে মাঝে নাকি দুই সাহেবকে দেখা যায়, সোর্ড নিয়ে লড়ছে। বিশেষ করে, চাঁদনি রাতে। গার্ডরা নাকি সেই ভয়ে, রাতে ওদিকটা মাড়ায় না।'

'কারা করেছে দুষ্কর্মটা?'

'আমার অফিসাররা তো বলছে, এটা ফারুখ বলে একটা ছেলের কাজ। খিদিরপুরের ছেলে। ডক এলাকা, বুঝতেই পারছেন অ্যান্টি সোসালে ভর্তি। এই ছেলেটা ঠিক পোচার নয়। তা সত্ত্বেও কেন কাজটা করতে গেল, সেটাই খোঁজ নিতে পাঠিয়েছি। মনে হচ্ছে, ওর পিছনে বড় কেউ থাকলেও থাকতে পারে। কত রকমের ইন্টারেস্ট থাকে লোকের। কেউ সুপারিও দিতে পারে।'

সুপারি মানে, টাকা দিয়ে অপরাধ করানো। অর্ক অপরাধ জগতের এই ভাষা জানে। ও বলল, 'এই ছেলেটার ওপর আপনাদের

সন্দেহটা হল কেন?'

'আবহাওয়া আপিসের একজন গার্ড মারধর খাওয়ার পর বলে ফেলেছে। আবহাওয়া আপিসটা এখন নতুন করে রং টং হচ্ছে। এই ছেলেটা রঙের মিস্ত্রিদের সঙ্গে আসত। মিস্ত্রিরা সব খিদিরপুরের লোক। কেউ তখন সন্দেহ করেনি। শালা, আগে থেকে সব ছকে রেখেছিল। পাঁচিল টপকানোর জন্য মিস্ত্রিদের মইটা ইউজ করেছে।'

পুলক তালুকদার যা বলল, খবরের জন্য তা-ই কাফি। তবুও অর্কর মন বলল, একবার চিড়িয়াখানার ডিরেক্টরের সঙ্গে কথা বলা উচিত। ফোনে উনি কিছু নাও বলতে পারেন। তাই ও চিড়িয়াখানায় যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল। বেলা একটা বাজে। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ফিরে আসা যাবে। হেঁটে এসপ্ল্যানেডের বাস গুমটির কাছে গিয়ে একটা ট্যাক্সিতে ও উঠে বসল।

রেড রোডে ট্যাক্সিটা স্পিড নিতেই অর্ক ঠাণ্ডায় কাঁপতে লাগল। হু হু করে হাওয়া ঢুকছে জানলা দিয়ে। হাতল ঘুরিয়ে ও দু'পাশের কাচ বন্ধ করে দিল। আজ এডিটোরিয়াল মিটিংয়ে দিব্যদাকে ও বলে এসেছিল, সোনারপুর নিয়ে কপি দেবে। দিব্যদা খুব একটা উৎসাহ দেখাল না। দিন দুয়েক ধরেই ও লক্ষ করছে, এই খবরটা ভালো করে ছাপা হচ্ছে না। এডিটর জানতে চাইছেন, রথীন সররা কেন জমিটা ফাঁক করতে চাইছে, তার আসল কারণটা কী? শোন, এই খবরটা যদি আনতে পারিস, তা হলে বড় করে ছাপব।'

অশান্তি শুরু হওয়ার পর রথীন সরের সঙ্গে অর্ক নিজে একবার কথা বলেছিল। তখন শুনেছিল, ভগবানপুরে বায়ো ইকোলজিক্যাল পার্ক হবে। সেটা আসলে কী, এখানে কারও তেমন ধারণা নেই। তার জন্য দু'শো সত্তর একর জমিই বা দরকার কেন, তার উত্তরও কেউ দিতে পারছে না। বায়ো ইকোলজিক্যাল পার্ক নাকি করবে কেন্দ্রীয়

সরকারের পরিবেশ দফতর। ওরাই টাকাটা দিচ্ছে। খবরটা কনফার্ম করা যেতে পারে একমাত্র দিল্লির এনভায়রনমেন্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে। কে করবে? এডিটর নাকি দিব্যদাকে বলেছেন, 'তোমার রিপোর্টারদের কারও কোনও বিগ সোর্স নেই। বায়োইকোলজিক্যাল পার্কটা তো একটা কাভার, ভেতরের উদ্দেশ্যটা কী, সেটা ওদের বের করতে বলো।'

ট্যাক্সির সিটে মাথা হেলান দিয়ে, কথাটা মনে হতেই অর্কর মেজাজ গরম হয়ে গেল। এই নিউজ এডিটরগুলো আসলে এডিটরের চামচা। রিপোর্টার হিসাবে নিজেরা কিছু করতে পারেনি কোনওদিন। অথচ রিপোর্টারদের ওপর ছড়ি ঘোরানোর জন্য বসে আছে। ছয় বছর কাগজে রিপোর্টারি করছে অর্ক, অথচ আজ পর্যন্ত একটা ভালো স্টোরি করতে দেখেনি দিব্যদাকে। চোখ বুজে ও নিজের মনেই, দিব্যদার উদ্দেশে বলল, 'শালা, জলাজমিতে ওই ঠাণ্ডায় সারাটা দিন গুলি গোলার মধ্যে কাটিয়ে আয় তার পর তোদের জ্ঞান শুনতে রাজি আছি। খবর করার জন্য কোনও দিন তো লিলুয়ার বাইরেও যাসনি। একটা খবর করার পিছনে যে কী কষ্ট, বুঝবি কী করে?'

'স্যার কিছু বললেন?'

ট্যাক্সি ড্রাইভারের গলা শুনে, চোখ খুলে অর্ক বলল, 'না আপনাকে কিছু বলিনি। একটু তাড়াতাড়ি চালাবেন ভাই। অনেক কাজ আছে।'

'চিড়িয়াখানায় আজ প্রচুর ভিড়। ও দিকটায় মারাত্মক জ্যাম। একটু আগে তাজ বেঙ্গলে ট্রিপ দিয়ে এলাম, ও দিকে পা রাখার জায়গা নেই। ছোট মুখে বড় কথা বলছি স্যার। ওখানে আর চিড়িয়াখানাটা না থাকা উচিত না।'

সিধে হয়ে বসে অর্ক বলল, 'কেন বলুন তো?'

'ট্রাফিকের খুব অসুবিধে। চিড়িয়াখানা যখন হয়েছিল, তখন জায়গাটা ফাঁকা ছিল, ছোটবেলায় বাবার সঙ্গে তো এসেছি। তখন দেখেছি, সন্ধেবেলায় ওই জায়গাটা নিঝুম হয়ে যেত। এখন তাজ বেঙ্গলের মতো বড় হোটেল হয়েছে, ন্যাশনাল লাইব্রেরি আছে, ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির ব্রাঞ্চ হয়েছে। সবথেকে বড় কথা স্যার, চার চারটে বড় বড় নার্সিং হোম আছে। কালই তো, একজন হার্ট অ্যাটাকের প্যাসেঞ্জার নিয়ে এসে কী মুশকিলেই না পড়েছিলাম। জ্যামে আটকে গেছি। ভয় হচ্ছিল, ট্যাক্সির মধ্যেই না ভদ্রমহিলা মারা যান। কোনও রকমে তাকে নার্সিংহোমে পৌঁছে দিই। আমি কি ঠিক বলছি স্যার?'

সমর্থন পাওয়ার জন্য ড্রাইভার পাশ ফিরে তাকাল। মনে মনে তারিফ করল অর্ক। এই হল আম জনতা। পরিমলদা বলত, আম জনতার টাচ্-এ থাকবি অর্ক সব সময়। আমাদের থেকে ওরা অনেক বেশি ভাবে এবং বোঝে। পরিমলদা কবে রিটায়ার করে গেছে, তবুও ওর কথাগুলো মনে আছে। কত দিন এই জু-র আশপাশ দিয়ে গেছে। এই প্রথম অর্কর মনে হচ্ছে, আলিপুরে এখন আর চিড়িয়াখানা রাখার কোনও দরকার নেই। ট্যাক্সির ড্রাইভারকে ও বলল, 'না, না আপনি ঠিক বলেছেন।'

'লোকে চিড়িয়াখানায় আসে কেন, মাঝে মাঝে সেটা ভাবি স্যার। নানা জায়গা থেকে আমরা প্যাসেঞ্জার তুলি। টুকরো টুকরো কথা শুনি তাদের মুখে। একটা আন্দাজ হয়ে যায়। সেদিন চিড়িয়াখানা থেকে শ্যামবাজারের একটা ফ্যামিলি তুলেছি। বাচ্চাটা বাবাকে বলছে, দূর, এই চিড়িয়াখানাটা পচা। ক্যাঙারু নেই, উট আর উটপাখি নেই, ওরাংওটাং আর কচ্ছপ নেই, র‍্যাটল স্নেক নেই, গডজিলা নেই, অ্যানাকোন্ডা নেই। এই নেই, সেই নেই। অর্দ্ধেক জন্তুর নামও কোনও দিন শুনিনি স্যার।'

'বাচ্চাটা আর কি বলছিল?'

'বলছিল চিড়িয়াখানায় সিংহী, গণ্ডার আর জলহস্তী মাত্তর একটা দুটো। এর থেকে বাড়িতে অ্যানিম্যাল প্ল্যানেট দেখা অনেক ভালো। বাচ্চাটর মা বলল, তুই চুপ কর তো। ওর বাবা বলল, চুপ করবে কেন? ও তো ঠিকবলছে। কী আছেটা কী, এই জু-তে?

শেষে হাসির কথা স্যার, বাবা আর মায়ের মধ্যে ঝগড়া লেগে গেল। মা বলতে লাগল, তোমার জন্যই সারাদিন ছেলে টিভি-র সামনে বসে থাকে। পড়াশোনা করে না।

'অর্ক কোনও কথা বলল না। ও ফের মাথাটা এলিয়ে দিল পিছনের সিটে। গডজিলা আর আনাকোণ্ডার জন্য বাচ্চাটা আক্ষেপ করেছে। নিশ্চয় হলিউডের সিনেমায় ওই দু'টো প্রাণীকে দেখেছে। ওকে বলে দেওয়া উচিত ছিল, পৃথিবীর কোনও চিড়িয়াখানায় গডজিলা বলে কোনও জন্তু নেই। চোখ বুজে অর্ক ওই বাচ্চাটাকে চেনার চেষ্টা করতে লাগল।

হঠাৎই ওর মনে পড়ল, ছোটবেলায়, খুব ছোটবেলায় কার হাত ধরে যেন ও চিড়িয়াখানায় এসেছিল। সেই মানুষটার পরনে ধুতি পাঞ্জাবি। খুব ফর্সা, মাথায় চুল পরিপাটি করে আঁচড়ানো। যে দাদু ওকে মানুষ করেছেন, তিনি নন। অন্য কেউ। সেদিন বোধহয় চিড়িয়াখানার কোনও একটা অনুষ্ঠান ছিল। রেল গেটের উল্টো দিকের রাস্তায় ওরা দু'জন ট্যাক্সি থেকে নামা মাত্তর, সঙ্গে সঙ্গে দু'তিনজন লোক ছুটে এল।

অ্যাপায়ন করে ওদের নতুন একটা বাড়ির ভেতর নিয়ে গেল। এই দৃশ্যটাই অর্কর চোখের সামনে বারবার রিওয়াইনড হতে থাকল। এর পর কী হয়ে ছিল, তা জানার কৌতূহলেও গভীর চিন্তায় ডুব দিল। দু'হাতে কানের দু'পাশটা চেপে ধরল। কান দিয়ে গরম হাওয়া

বেরোচ্ছে। সেই তাপ অনুভব করতে করতে অর্ক নিজেকেই দেখতে পেল। চার কী পাঁচ বছর বয়স ওর তখন। পরনে সবুজ রঙের ভেলভেটের প্যান্ট, লাল হাফ হাতা জামা। যিনি ওর হাত ধরে রয়েছেন, তার মুখটা অবশ্য অর্ক দেখতে পেল না।

... একটা প্রায় অন্ধকার অডিটোরিয়াম, প্রচুর লোক। একেবারে সামনের সিটে, সেই মানুষটার পাশে ও বসে আছে। অর্ক দেখতে পেল, মঞ্চে উজ্জ্বল আলোর তলায় চার জন লোক। তাঁদের মুখগুলো সব ঝাপসা। মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে এক জন কথা বলছেন। তার কথাগুলো স্পষ্ট শুনতে পেল অর্ক, 'কলকাতার এই চিড়িয়াখানার প্রথম ভারতীয় সুপারিনটেন্ডেন্ট রামব্রহ্ম সান্যাল সম্পর্কে আপনারা এতক্ষণ অনেক কিছুই শুনলেন। আমাদের চিড়িয়াখানার নাম তাঁর জন্যই সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়েছিল। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে আমরা এই নতুন অডিটোরিয়োমের নাম রাখলাম, রামব্রহ্ম স্যান্যাল স্মৃতি সদন।' তারপর হাততালিতে হল ফেটে পড়ল।

'স্যার, ঘুমিয়ে পড়লেন নাকি? চিড়িয়াখানা এসে গেছে।'

চোখ খুলে অর্ক দেখল, ও অডিটোরিয়ামে নেই। ওর চোখের সামনে, বাঁ দিকে তিন কোনা একটা পার্কে একটা বাঘের মূর্তি। ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে থাবা তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে। মুখ তুলে সামনের দিয়ে তাকাতেই বিরাট একটা গেটের মাথায় আর একটা বাঘের মূর্তি ওর চোখে পড়ল। তার পাশে লেখা কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার। ন্যাশনাল লাইব্রেরি। তা হলে কি ও আলিপুরে পৌঁছে গেছে?। পকেট থেকে পার্স বের করতে গিয়ে অর্ক টের পেল, মাথা যন্ত্রণায় ছিঁড়ে যাচ্ছে, চোখ জ্বালাজ্বালা করছে। সারা শরীরেও অসহ্য ব্যথা। হঠাৎই ওর মনে হল, ট্যাক্সি থেকে একবার নেমে পড়লে মারাত্মক ভুল করবে। ভাড়া দিতে গিয়ে, টাকার বদলে নিজের একটা নেমকার্ড বের করে আনল ও। তার পর অসহায় গলায় ট্যাক্সি ড্রাইভারকে বলল, 'আমাকে বাড়ি পৌঁছে দেবেন প্লিজ। আমি থাকি গলফ্ গার্ডেন্সে। শরীরটা ভালো

নেই। আমার ঠিকানা এই কার্ডে লেখা আছে।'

তার পরই চোখ বুজে অর্ক ভাবতে চেষ্টা করল, রামব্রহ্ম সান্যাল নামটা কি আগে কখনও ও শুনেছে? হঠাৎ কেনই বা ওই নামটা ওর মনে পড়ল?

১২

সাউথ সিটির শপিং মল থেকে বেরোচ্ছিল সাঁঝেলি। সঙ্গে সাগ্নিক। বাইরে পোর্টিকোর নীচে এসে দাঁড়াতেই, রাস্তার গাড়ির মিছিল দেখে ও চমকে গেল। বাড়ি থেকে বেরোনোর সময় ইচ্ছে করেই সাঁঝেলি গাড়ি আনেনি। সাউথ সিটি হওয়ার পর থেকে আনোয়ার শা রোডে মারাত্মক জ্যাম হচ্ছে। সাগ্নিককে ও বলেছিল, 'শপিং মলটা এই তো কাছেই। চল না, হেঁটেই মেরে দিই। মজা হবে। গাড়ির চেয়ে অনেক আগে পৌঁছে যাব।' মায়ের চোখ এড়িয়ে দু'জনে চুপিচুপি বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছিল ।লেক গার্ডেন্স থেকে হেঁটে, দু'জনে গল্প করতে করতেই শপিং মলে চলে আসে। প্রথমে সিনেমা দেখেছে। 'পাইরেটস অব দ্য ক্যারিবিয়ান।' তার পর প্রচুর কেনাকাটা করে, মেনল্যান্ড চায়নায় সাগ্নিককে খাইয়েছে।

দু'জনের হাতে এখন সাত-আটটা প্যাকেট। সে সব নিয়ে হেঁটে বাড়ি ফিরবে কী করে, এখন সেই চিন্তা সাঁঝেলিকে করতে হচ্ছে। যাদবপুরের দিক থেকে আসা অটো রিকশাগুলো গরগর শব্দ তুলে পশ্চিম দিকে চলে যাচ্ছে। যেন প্রচণ্ড রাগ নিয়ে ছুটছে। হাত দেখালেও থামে না। ফাঁকা অটোয় উঠতে

গেলে, হয় পূবদিকে যাদবপুর থানা, না হয় পশ্চিম দিকে লর্ডস বেকারির মোড় অবধি হেঁটে যেতে হবে। সাউথ সিটি থেকে দুটো জায়গাই মনে হয়, সমান দূরত্বের। সাঁঝেলি ঠিক করতে পারল না, কোন দিকে হাঁটবে।

এমন সময় সাগ্নিক বলল, 'আচ্ছা দিদিভাই, একটা প্রশ্ন করব?'

'কী রে?'

'জলদস্যুদের কাঁধে সবসময় তোতাপাখি থাকে কেন গো?'

'বাঃ ভালো একটা কোয়েশ্চেন করেছিস তো? আসলে জানিস ভাই, সমুদ্রের বুকে যারা দিনের পর দিন কাটায়, তারা একাকীত্ব কাটাতে নানা ধরনের জীব পোষে। সে নাবিক হোক অথবা জলদস্যু। হয়তো কোনও দ্বীপে জাহাজ কয়েক দিনের জন্য অ্যাঙ্কর করেছে, সেখানকার কোনও পশুপাখি ধরে ওরা পুষতে শুরু করে। সময় কাটানো যায়, আবার দেশে ফিরে বিক্রি করাও যায়। জলদস্যুদের বেশির ভাগই নোঙর করত বেলিজ বলে একটা দ্বীপে। সেখানে নানা রঙের সুন্দর সুন্দর তোতা পাখি, কাকাতুয়া পাওয়া যেত। সেগুলো ধরে ওরা পোষ মানাত, কথা শেখাত। তার পর দেশে ফিরে সেই পাখি ধনী লোকেদের কাছে চড়া দামে বিক্রি করে দিত। লন্ডনে, প্যারিসে এই ধরনের পাখির বাজার এখনও রয়েছে।'

উত্তরটা দিতে দিতেই সাঁঝেলি উত্তরদিকের সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল। রাস্তায় পা দিতেই সাঁঝেলির চোখে পড়ল, ওপারে আটকে পড়া একটা স্যান্ট্রোতে নন্দিনী বসে আছে। ও এখন ঢাকুরিয়ায় বাবার ফ্ল্যাটে থাকে। মধুসূদন-মঞ্চের উল্টো দিকে। ওর তো এই রাস্তা দিয়ে যাওয়ার কথা নয়? তা'ছাড়া সন্ধেবেলায় এই সময়ে নাকি অফিসে নন্দিনী ভীষণ ব্যস্ত থাকে। অন্তত সে রকমই বলে। কোনও কিছু না ভেবে, জানলার কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে সাঁঝেলি বলে ফেলল, 'এই নন্দিনী, তুই এদিকে? চললি কোথায়?'

'পিপি তুই! দূর থেকে দেখে আমার অবশ্য সে রকমই সন্দেহ হচ্ছিল, বুঝলি। কিন্তু ভাবলাম, গাড়ি ছাড়া তুই তো কোথাও নড়িস না। রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকবি কী জন্যে? হয়তো তোর মতো অন্য কেউ হবে। এই পৃথিবীতে একই রকম দেখতে লোকের তো অভাব নেই। তোর সঙ্গে বাচ্চা ছেলেটা কে রে?'

'আমার পিসিমণির ছেলে।'

'হুঁ, ওকে দেখেও আমার ডাউট হয়েছিল। একে বোধহয় আরও ছোট দেখেছি। খুব নাদুস নুদুস ছিল তখন। যাক গে, এখন উঠে আয়। তোদের ওদিকেই যাচ্ছি।'

সাগ্নিককে পিছনের সিটে পাঠিয়ে দিয়ে সাঁঝেলি নন্দিনীর পাশে এসে বসল। ঠিক তখনই সামনের গাড়িগুলো এগোতে শুরু করল। গাড়ি স্টার্ট করে নন্দিনী জিজ্ঞেস করল, 'হ্যাঁরে পিপি, অ্যান্টার্কটিকায় পেঙ্গুইনরা কেমন আছে রে?'

সাঁঝেলি ভ্রূ কুঁচকে বলল, 'হঠাৎ পেঙ্গুইনের খবরে তোর কী দরকার?'

'এমনিই। তুই ছাড়া ওদের কথা ভাবার জন্য আর কে আছে বল? যাক গে, সেদিন ফোনে তোকে জিজ্ঞেস করতে ভুলে গেছিলাম। এখন করছিসটা কী?'

'জুলজি পড়াচ্ছি। কলেজে পার্ট টাইম। ক'দিন আগে আরেকটা চাকরিও জুটেছে। আমার মনের মতো চাকরি। মাসের পয়লা তারিখে জয়েন করব।'

'কোথায় রে?'

'চিড়িয়াখানায়। মাইনেটা অবশ্য খুবই কম।'

'তোর আর কম-বেশি। চাকরি করার দরকারটা কী রে তোর পিপি?

তোর মতো অবস্থায় থাকলে, আমি তো পায়ের ওপর পা তুলে বসে বসে খেতাম।'

'কী বলছিস তুই নন্দিনী। বাবা আর দাদার পয়সায় আমি আয়েস করব? ভাবলি কী করে? জানিস, এখানেই পশুপাখিদের সঙ্গে মানুষের তফাত। পশুপাখিরা কোনও কিছু ইনহেরিট করে না। একটু বড় হয়েছ, কী যাও। নিজে খেটে খাও। আমি মনে করি, ওরাই ঠিক।'

গাড়ি চালাতে চালাতে নন্দিনী বলল, 'জন্তু জানোয়ার ছাড়া তোর মুখে কি অন্য কোনও তুলনা আসে না?'

'আসবে কেন বল? ওদের নিয়ে অ্যাদ্দিন স্টাডি করছি বলেই, কমপেয়ারটা করি। তোর কথাই বলি, পারলি জহর কোটের সঙ্গে থাকতে? ওর তো অত টাকা।'

নন্দিনীর হাজব্যান্ডের নাম জহর চ্যাটার্জি। বিয়ের আগে কলেজের বন্ধুরা ওর নাম দিয়েছিল, জহর কোট। নন্দিনীর গায়ে লেপটে থাকত বলে। তখন শুনে হাসত নন্দিনী। কিন্তু এখন চটে গেল, 'ওর কথা ছাড়। ও একটা জানোয়ার।'

সাঁঝেলি বলল, 'নন্দিনী... তুই আমাকে নামিয়ে দে ভাই। অ্যানিম্যালদের তুই ইনসাল্ট করছিস। তুই ভালো করে জানিস, আমি সেটা সহ্য করতে পারি না।'

'সরি পিপি, আর বলব না।'

'ঠিক আছে, মাফ করে দিলাম। তা, যাচ্ছিস কোথায়, সেটা তো বললি না।'

'তুই তাকে চিনিস। বেচারী জ্বরে কাবু হয়ে রয়েছে। গিয়ে চাঙা করতে হবে।' বলেই মুচকি হাসল নন্দিনী, 'একটা কথা জিজ্ঞেস করব

পিপি, অনেক দিনের কৌতূহল। তুই কিছু মনে করবি না বল।'

'ভ্যানতাড়ামি ছাড় তো।'

'আচ্ছা বাঘের জ্বর হলে, কী ভাবে মাপা হয় রে?'

সাঁঝেলি ভ্রূ কুঁচকে বলল, 'ওদের রেক্টাম দিয়ে থার্মোমিটার পুশ করতে হয়।'

'আমার সেটাই সন্দেহ ছিল। মুখের ভেতর থার্মোমিটার দিলে তো ওরা এক কামড়ে ভেঙে ফেলবে। সত্যি, মানুষের সঙ্গে ওদের কত তফাত, বল।'

'তুই ঠাট্টা করছিস, তাই না?'

'নট অ্যাট অল।' প্রসঙ্গ ঘোরানোর জন্য নন্দিনী দ্রুত বলল, 'এই... তোর বাড়িতে যাওয়ার জন্য কি

ডান দিকের গলিটায় ঢুকব?'

'ঢোক, এ দিক দিয়েও যাওয়া যায়। শুধু শুধু আমার জন্য ট্রাবলটা নিলি। যাচ্ছিলি একটা জায়গায়, টেনে নিয়ে এলাম।'

'তুইও চল না আমার সঙ্গে। পুঁচকেটাকে নামিয়ে দিচ্ছি। তোর হাতে তো এখন কোনও কাজ নেই। গোবিন্দপুর ছাড়া তোর কোথাও যাওয়ার জায়গা আছে বলে কখনও শুনিনি।'

শুনে রাগ করার বদলে হেসে ফেলল সাঁঝেলি। তার পরে বলল, 'সরি নন্দিনী। তোর বার্থ ডে ডিনারে সেদিন যেতে পারিনি। একটা দরকারে সেদিন দাদা বাড়িতে থাকতে বলেছিল। আমার অবশ্য

একটা ফোন করে দেওয়া উচিত ছিল তোকে। তুই রাগ করবি বলে করিনি।'

'ইট'স অলরাইট।' বলে ডান দিকে টার্ন নিয়ে নন্দিনী লেক গার্ডেন্সের ভেতর ঢুকে পড়ল। স্কুলকলেজে পড়ার সময় ওদের বাড়িতে নন্দিনী বহুবার এসেছে। কিন্তু এত অলিগলি, প্রতিবার রাস্তা ভুলে যায়। অন্য রাস্তায় চলে যায়, আর ফোন করে বারবার জানতে চায় কীভাবে আসবে। সাঁঝেলি চুপ করে রইল, এটা দেখার জন্য, ওকে জিজ্ঞেস না করে নন্দিনী বাড়ি পৌঁছতে পারে কী না। আজ ও জিজ্ঞেস করলেই একটা মোক্ষম কথা শুনিয়ে দেবে।

'হ্যাঁরে পিপি, এ বার কোন দিকে?'

এই প্রশ্নটাই মনে মনে চাইছিল সাঁঝেলি। ও বলল, 'ডান দিকে। এই কারণেই আমি বলি, মানুষের সঙ্গে কত তফাতঅ্যানিম্যালদের। ওরা এক বার যে রাস্তা দিয়ে যায়, কোনও দিন ভোলে না। বাড়ির বেড়ালটাকে থলেতে ভরে তুই যদি অন্য কোথাও পাচার করে আসিস, দেখবি, ঠিক ফের বাড়ি ফিরে আসবে। শীতের সময় পাখিগুলোকে দেখিস না? হাজার হাজার মাইল উড়ে রাস্তা চিনে ঠিক এখানে চলে আসে।'

কথাটা হজম করে নন্দিনী বলল, 'জীবজন্তুর জগৎ থেকে একদিন না একদিন তুই একটা বিরাট প্রাইজ পাবি পিপি। দেখিস, নোবেল প্রাইজের মতো ওদের কোনও প্রাইজ। এত বড় পশুহিতৈষী তো আর পৃথিবীতে নেই। সেদিন আমাকে মনে রাখিস, মাইরি।'

শুনে হাসতে লাগল সাঁঝেলি

। ওদের বাড়ির সামনে গাড়িটা দাঁড় করিয়ে নন্দিনী বলল, 'তোর এই তুতো ভাইটাকে তাড়াতাড়ি খালাস কর ভাই। আমি অলরেডি লেট।'

হাতের সব প্যাকেট সমেত সাগ্নিককে বাড়ির ভেতর ঢুকিয়ে দিয়ে, সাঁঝেলি ফের সামনের সিটে এসে বসল। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'আমরা যাচ্ছি কোথায় বল তো?'

'এই তো কাছেই। যার বাড়িতে যাচ্ছি, তোকে দেখলে সে খুব খুশি হবে। অবশ্য যদি দেখার মতো

অবস্থায় থাকে।'

গলি থেকে বেরিয়ে নন্দিনী আনোয়ার শা রোডে ঢোকার পরই সাঁঝেলি বলল, 'তোকে একটা কথা

বলার ছিল রে নন্দিনী। ধর, তোদের কাগজের জন্য যদি একটা আর্টিকেল লিখি, তা হলে ছাপবি?'

'কী আর্টিকেল? গোবিন্দপুরে তোদের হসপিটাল নিয়ে?'

' সে তো একবার বেরিয়েছে। ও সব না। আজ সকালে একটা খবর পড়ে আর্টিকেল লেখার

কথাটা আমার মাথায় এল। তোদের কাগজে ফার্স্ট পেজে বেরিয়েছে।'

' কোন খবরটা রে?'

' ওই যে... দিল্লিতে একটা স্কুল স্টুডেন্ট বাবার রিভলবার চুরি করে, স্কুলে গিয়ে গুলি করে মেরেছে

তার ক্লাস মেট-কে। খবরটা ডেফিনিটলি সেনসেশনাল। পড়েই মনে হল, একটা আর্টিকেল লেখা

উচিত। এই অল্পবয়সী ছেলেরা কেন এত ভায়োলেন্ট হয়ে উঠেছে, সে সম্পর্কে আমার স্টাডি করা

আছে।'

'তুই তো সাইকোলজিস্ট বা সাইক্রিয়াট্রিস্ট নোস, তোর লেখা লোকে পড়বে কেন? কালই আমাদের

কাগজে একজন নামী সাইকোলজিস্টের লেখা বেরোচ্ছে। নিউজ এডিটর আমাকে সেই লেখাটা করতে

দিয়েছিল। ভদ্রলোক কয়েকটা পয়েন্ট খুব ভালো এক্সপ্লেন করেছেন। কাল পড়ে নিস।'

'সাটেনলি পড়ব। কিন্তু আমার লেখাটা অন্য রকম। আমার কাছে একটা রেমেডি আছে। গোবিন্দপুরে

কাজ করতে গিয়ে আমার অনেক প্র্যাকটিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স হয়েছে। দেখিস, লেখাটা ভালো হবে।'

'তিন চার লাইনের মধ্যে সাবজেক্টটা বলতে পারবি?'

'কেন পারব না? আজকাল এই যে বাচ্চারা একটা নিউক্লিয়াস ফ্যামিলির মধ্যে মানুষ হচ্ছে, তারই কুফল এটা। বাবা-মা চাকরি করে, কেউ বাচ্চাটার স্পেশাল কেয়ার নেয় না। বাড়িতে ঠাকুমা-দিদিমা বা কাকা-কাকিমার মতো কেউ নেই যে, বাবা-মায়ের অভাবটা পূরণ করবে। বাড়িতে বেশিরভাগ সময়ই সে কিছু গ্যাজেটস নিয়ে নড়াচড়া করছে। হয় ভিডিও গেমস খেলছে, না হয়তো টিভি-র সামনে বসে আছে। এমন সব সিনেমা বা প্রোগ্রামস দেখছে, যা ওর দেখার কথা নয়। ভায়োলেন্স ওখান থেকেই

শিখছে। ওর মনে বদ্ধমূল ধারণা হয়ে যাচ্ছে, এটা এক ধরনের অ্যাডভেঞ্চার। সেই অ্যাডভেঞ্চারের

নেশায় যা ওর করার কথা নয়, সেটা করতেও দ্বিধা করছে না...'

'ব্যস, ব্যস।' থামিয়ে দিল নন্দিনী। তারপর বলল, 'এই সব ব্যাখ্যা সাইকোলজিস্ট ভদ্রলোক
দিয়েছেন। আগে বাড় পিপি। নতুন কোনও পয়েন্ট থাকলে বল। কী রেমেডির কথা বলছিলিস।'

'ছোটবেলা থেকেই যদি বাচ্চার হাতে কোনও ধরনের একটা পেট অ্যানিম্যাল ধরিয়ে দেওয়া হয়,
তা হলে জীবনেও সে ভায়োলেন্ট কাজ করবে না। আমি প্রায় শ'দুয়েক কেস স্টাডি করেছি। জানিস,
গোবিন্দপুরে সেদিন একটা বাচ্চা মেয়ে ফোন করেছিল, থাকে বালিগঞ্জের মাল্টি স্টোরিড বিল্ডিংসে।
কাঁদতে কাঁদতে বলল, আমাদের বাড়ির নীচে, রাস্তার কুকুরকে একটা গাড়ি চাপা দিয়ে গেছে। ওর
পায়ে চোট লেগেছে। আমার বাড়িতে বাবা-মা কেউ নেই। প্লিজ, আপনারা কেউ এসে কুকুরটাকে নিয়ে
যান। না হলে মরে যাবে। সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গেলাম। দেখি, ওই কুকুরটাকে তোয়ালের মধ্যে জড়িয়ে বুকে
আঁকড়ে ধরে আছে বাচ্চা মেয়েটা। পরে শুনলাম, ওর বাড়িতেও একটা স্পিৎজ আছে। এই যে স্ট্রিট
ডগটার জন্য মেয়েটার ভালোবাসা, সেটা গ্রো করেছে কিন্তু বাড়িতে পেট ডগ রয়েছে বলে।'

মন দিয়ে সাঁঝেলির কথা শুনছিল নন্দিনী। ও থামতেই বলল, 'ঠিক বলেছিস। আমার এক রিলেটিভের

ছেলের মধ্যেও এই জিনিসটা রিসেন্টলি লক্ষ্য করলাম। ওরা হ্যাজব্যান্ড ওয়াইফ দু'জনেই চাকরি করে। ছেলেটা বাড়িতে একা থাকত। হঠাৎ বিগড়ে গিয়েছিল। কিন্তু আমার রিলেটিভ বাড়িতে

দুটো খরগোশ এনে দেওয়ার পর দেখলাম, ছেলেটা পুরোপুরি বদলে গেল। স্কুল থেকে ফিরে আসার পর খরগোশ দুটোকে নিয়েই ওর সময় কেটে যায়। কী কেয়ারিং হয়ে গেছে, ভাবতে পারবি না।'

সাঁঝেলি উৎসাহ নিয়ে বলল, 'এই কারণেই তো বাচ্চাদের অ্যালফাবেটস শেখানোর সময় অ্যানিম্যালদের নামগুলো মাথায় ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। বাংলায় অ-য়ে অজগর আসছে তেড়ে। ইংরাজিতে ব্যাট, ক্যাট, ডিয়ার, এলিফ্যান্ট, ফক্স। দেখবি, আমাদের ঠাকুর দেবতাদের বাহনগুলোও পশু অথবা পাখি।'

নন্দিনী বলল, 'তুই ঠিক বলেছিস পিপি। আমার খুব জানার ইচ্ছে, ঠাকুরদের সঙ্গে একটা করে পশুপাখি জুড়ে দেওয়া হয়েছিল কেন? কারণটা কি তুই জানিস?'

'কারণ ওই একটাই। পার্টিকুলার এই পশু বা পাখিটার প্রতি ভয়মিশ্রিত ভালোবাসা জাগিয়ে তোলা।

অমুক ঠাকুরের বাহন, মারিস না। মারলে পাপ হবে। যা তোকে বলছিলাম, আমার তো মনে হয়, প্রত্যেক ফ্যামিলিতে একটা করে পেট অ্যানিম্যাল রাখা উচিত। যার যা সামর্থ, তাই পুষুক। সে পাখি হোক, কুকুর বা বেড়াল। দেখবি, তা হলে পৃথিবী থেকে অনেক

' তোরা এ নিয়ে ক্যাম্পেন করছিস না কেন?'

টেনশন কমে যাবে।'

সাঁঝেলি বলল,' করার কথা অনেক দিন ধরে ভাবছি। কয়েকটা স্কুলের সঙ্গে যোগাযোগও করেছি। ভালো

রেসপন্স পাচ্ছি। একটা স্পনসর পেলেই ক্যাম্পেনটা শুরু করে দেব। আশিসদা অনেকের সঙ্গে কথাও বলছে। তার আগে যদি তোদের কাগজে লেখাটা বেরোয়, তা হলে আমাদের সুবিধা হয়।

স্পনসর ইন্টারেস্ট নেবে।'

'লেখাটা কবে দিতে পারবি?'

'আজই দিতে পারি। আমার কম্পিউটারে রেডি আছে। তবে ইংরেজিতে।'

'ঠিক আছে। আমরা বাংলা করে নেব। আজই দিয়ে দিস। এখন নামতে হবে। চল, এসে গেছি।'

গলফ গার্ডেন্সে একটা হাউসিং কমপ্লেক্সের ভেতরে ঢুকে গাড়ি থামাল নন্দিনী। তার পর ডানদিকের বাড়িতে ঢুকে গ্রাউন্ড ফ্লোরে একটা ফ্ল্যাটের সামনে দাঁড়িয়ে জোর বেল টিপল। কয়েক সেকেন্ড পর যে এসে দরজা খুলল, তাকে দেখে অবাক হয়ে গেল সাঁঝেলি। অর্ক স্যান্যাল। এত কাছে থাকে? কিন্তু এ কী চেহারা হয়েছে ওর?

১৩

কাল রাতে কলকাতা থেকে ফোনে রাজা বলেছিল, 'মিশন সাকসেসফুল সার। ইডিয়েট বক্সের লোকগুলো কাজ শুরু করে দিয়েছে।'

ইডিয়েট বক্সের লোকেরা মানে টিভি রিপোর্টাররা। প্ল্যানটা প্রোজ্জ্বল দিয়ে এসেছিলেন। এমন কিছু করে, যাতে লাগাতার চিড়িয়াখানার বদনাম হয়। এর জন্য কিছু টাকা খরচ করতে হলেও পিছিও না। এই কাজটা করার উপযুক্ত মাধ্যম হচ্ছে টিভি। ওরা একবার যার পিছনে লাগে, তার নাভিশ্বাস তুলে দেয়। তিলকে তাল করতে ওস্তাদ। আর চ্যানেলে চ্যানেলে লড়াই বাঁধিয়ে দিলে তো কথাই নেই। যা ইচ্ছে করানো যাবে।

রাজা ছেলেটার এলেম আছে। একদিকে, খিদিরপুরের কয়েকটা অ্যান্টি সোসাল ছেলেকে জোগাড় করেছে। অন্য দিকে, ম্যানেজ করে ফেলেছে টিভি চ্যানেলের কয়েকজন রিপোর্টারকে। প্ল্যানের পার্ট ওয়ান অনুযায়ী, ইতিমধ্যেই খিদিরপুরের ছেলেটা চিড়িয়াখানায় নিঃশব্দে কাজ শেষ করে গা ঢাকা দিয়েছে। সম্ভবত, সে এখন বাংলাদেশে। রাজা সেই ব্যবস্থা করে রেখেছিল। প্ল্যানের পার্ট টু এখন বাকি। হরিণ হত্যার খবরটা মিডিয়ার মাধ্যমে ছড়িয়ে দিয়ে চিড়িয়াখানার কর্তাদের যথাসম্ভব বিব্রত করা। অবশ্য মাঝে মাঝেই এই অস্বস্তিতে ফেলার কাজটা করতে হবে। যাতে একটা সময় সাধারণ লোকও বিরক্ত হয়ে বলতে বাধ্য হয়, সিকিউরিটির কারণে চিড়িয়াখানা অন্য কোথাও শিফট করা হোক।

হোটেলের রুমে বসে এই সব কথা ভাবছিলেন প্রোজ্জ্বল। আধ ঘণ্টা ধরে টিভির পর্দার দিকে চোখ রেখেছেন। না, কলকাতার চিড়িয়াখানার হরিণের মার্ডার হওয়ার খবরটা ন্যাশনাল চ্যানেলগুলোর কোথাও দেখায়নি। আর অপেক্ষা করা যাবে না। এখুনি বেরিয়ে যেতে হবে। চট করে উঠে ড্রেস করতে লাগলেন প্রোজ্জ্বল। লবিতে হয়তো এখন বসে আছে কারমারকর। সন্ধে ছ'টার সময় ওর সঙ্গে যাওয়ার কথা বান্দ্রায় নামী এক ফটোগ্রাফারের বাড়িতে। মিত্র কনস্ট্রাকশনের জন্য অ্যাড ক্যাম্পেন করতে হেমা মালিনী রাজি হয়েছেন। কীভাবে সেই স্টিল ছবি তোলা হবে, সে সম্পর্কে কথা বলার জন্যই কারমারকর নিয়ে যাবে অ্যালেক্স ডি'সুজা নামে এক ফটোগ্রাফারের কাছে। হেমা নাকি অ্যালেক্স ছাড়া অন্য কারও কাছে ছবি তোলেন না।

ইচ্ছে করলে এই দায়িত্বটা প্রোজ্জ্বল দিতে পারতেন কোনও এজেন্সির হাতে। কিন্তু দেননি। তার কারণ আছে। অ্যালেক্সকে হোটেলে নিয়ে আসার কথা বলেছিলেন প্রোজ্জ্বল। কাল সে কথা শুনেই সাফ সাফ না করে দিয়েছিল কারমারকর। বলেছিল,

'স্যার,ঐশ্বর্যা শাহরুখ খানদের ছবি তোলে ও। আম্বানি বা ওয়াদিয়া লেভেলের লোক ছাড়া কারও কাছে যায় না। এত এক্সপেনসিভ ফোটোগ্রাফার, তবুও

লোকে ওর কাছে যায়।' অ্যালেক্স কত বড় ফোটোগ্রাফার, সেটা নিজের চোখে দেখার জন্য তাই প্রোজ্জ্বল ওর স্টুডিওতে যেতে চান।

চারটে দিন টানা মুম্বইয়ে থেকে প্রোজ্জ্বলের মনে হচ্ছে, কলকাতার কোনও ভবিষ্যৎ নেই। প্রচুর টাকা রোজগার করতে হলে এই শহরেই এসে থাকতে হবে। এখানে টাকা উড়ছে। ধরে নেওয়ার কায়দা জানা থাকলেই হল। এই ক'টা দিন প্রোজ্জ্বলের অবশ্য বৃথা যায়নি। অন্য কয়েকটা কাজ উনি সেরে ফেলেছেন।

রথীন সরের ফেস্টিভ্যালে নাচতে হেমাকে রাজি করিয়েছেন। কনট্রাক্ট পেপারে সই হয়ে গেছে। একটু বেশিই লাগল পারিশ্রমিকটা। প্রায় দশ লাখ টাকা। তবে এই টাকাটা গায়ে লাগবে না। পুষিয়ে যাবে মিত্র কনস্ট্রাকশনের অ্যাড ক্যাম্পেনে। খুশির খবরটা সেদিনই রথীন সরকে ফোনে দিয়েছেন প্রোজ্জ্বল। পরে রাজার মুখে শুনেছেন, বাইপাসের ধারে নাকি বড় বড় হোর্ডিং লেগে গেছে, হেমা মালিনীর নাচ নিয়ে। প্রতিটা হোর্ডিংয়ের তলায় লেখা, সৌজন্যে

মিত্র কনস্ট্রাকশন।

খুশি মনেই নীচে লবিতে নেমে এলেন প্রোজ্জ্বল। কিন্তু কারমারকরের বদলে সুমতিকে দেখে একটু অবাক হলেন। সুমতি মজুমদার। মুম্বই অফিসের ডেপুটি ম্যানেজার। মাস তিনেক আগে জয়েন করেছে। এ বারই এসে প্রথম ওকে দেখলেন প্রোজ্জ্বল। প্রবাসী বাঙালি, অসাধারণ সুন্দরী এবং সেই সঙ্গে সেক্সি। হাসিটা একেবারে মাধুরী দীক্ষিতের মতো। এই রকম একটা মেয়ে অফিসে থাকা খুব দরকার। কারমারকর আলাপ করিয়ে দেওয়ার পর প্রোজ্জ্বলের একটা কথাই মনে হয়েছিল, মেয়েটা ফিল্ম লাইনে না গিয়ে কেন কর্পোরেট জগতে এল? পরে কারমারকর বলেছিল, সুমতি নাকি ফিল্ম লাইনে চেষ্টা করেছিল। তেমন সুবিধে করতে পারেনি।

সুমতি এগিয়ে এসে বলল, 'গুড মর্নিং স্যার। আমাকে এখানে দেখে মনে হচ্ছে, আপনি একটু অবাক হয়েছেন?'

সরাসরি মেয়েটার মুখের দিকে তাকালেন প্রোজ্জ্বল। একটু ফ্লার্ট করার ঢঙেই বললেন, 'নট অ্যাট অল। সন্ধেবেলায় একটা সুন্দর মুখ দেখতে কার না ইচ্ছে হয় বলো। আমার তো ইচ্ছে, তুমি পুরো একটা দিন আমার সঙ্গে কাটাও।'

শুনে খিলখিল করে হাসল সুমতি। তার পর বলল, 'মাই প্লেজার স্যার। আপনার সঙ্গে সময় কাটানোর সুযোগ পাওয়াটা তো

ভাগ্যের ব্যাপার। আসলে কারমারকার আমাকে এখানে পাঠালেন, তার কারণ অ্যালেক্স ডি'সুজার সঙ্গে আমার একটা সময় খুব পরিচয় ছিল। গোয়া থেকে মুম্বই এসে ও যখন স্ট্রাগল করছে, তখনকার কথা বলছি।

হাত তুলে সুমতিকে থামিয়ে দিলেন প্রোজ্জ্বল, 'ইউ নিড নো এক্সপ্ল্যানেশন। চল বান্দ্রা যাওয়া যাক।'

'স্যার, অ্যালেক্স ডি'সুজার ওখানে কাজ শেষ করে কি হোটেলেই ফিরবেন?'

প্রোজ্জ্বল বললেন, 'ডি' সুজার ওখানে কতক্ষণ লাগতে পারে বলো তো?'

'বলা মুশকিল। ফিল্ম আর্টিস্টদের ফোটোগ্রাফাররাও একেকজন সেলিব্রিটি। গেলেই টের পাবেন

স্যার। তবে মনে হয়, আটটার আগে বেরিয়ে আসতে পারব।

প্রোজ্জ্বল বললেন, 'ঠিক আছে, তার পর তোমাকে নিয়ে কোথাও ডিনার করতে যাব। আপত্তি নেই

তো?'

'কী যে বলেন স্যার।'

হোটেলের লবি থেকে বেরিয়ে আসার সময় প্রোজ্জ্বল লক্ষ করলেন, অনেকেই সুমতির দিকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে। দীপার সঙ্গে যখন কোথাও যেতেন, তখনও এটা লক্ষ করতেন। এই মেয়েটা দীপার সমবয়সীই হবে। বিবাহিত কী না, তা বোঝা যাচ্ছে না। তবে ফিল্ম লাইন থেকে ছিটকে আসা মেয়ে, ভার্জিন থাকতেই পারে না। মুম্বইয়ে খুব ফাস্ট লাইফ। এই অল্প কয়েকবার সাক্ষাতে প্রোজ্জ্বল টের পেয়েছেন, সুমতি পোড় খাওয়া মেয়ে। পরিস্থিতি চট করে মানিয়ে নিতে পারে। গাড়িতে সুমতি সামনের সিটে উঠতে যাচ্ছিল। প্রোজ্জ্বল পিছনের সিটে ডেকে নিলেন।

জুহু থেকে বান্দ্রার দূরত্ব এমন কিছু নয়। তবুও জ্যামের জন্য প্রায় আধ ঘণ্টা লেগে গেল। এই সময়টুকুর মধ্যে সুমতি সম্পর্কে যা জানার জেনে নিলেন প্রোজ্জ্বল। আসলে নাসিকের মেয়ে। পুনে থেকে এমবিএ করেছে। ভাগ্যান্বেষণে মুম্বই এসেছিল। তখনই জুহু বিচে একদিন চোখে পড়ে ফোটোগ্রাফার ডি'সুজার। জোর করে নাকি ডি'সুজা ওর পোর্টফোলিও বানায়। নিজেই পাঠিয়ে দিতে থাকে বিভিন্ন প্রোডাকসন হাউসে। সুমতি কয়েকটা বি গ্রেড মার্কা ছবি করেছিল। অবশ্য পুনম নামে। কিন্তু সেই ছবি ফ্লপ হয়। এখন একাই থাকে বান্দ্রায় একটা অ্যাপার্টমেন্টে।

ডি'সুজার বাড়িতে গিয়ে প্রোজ্জ্বল চমকে গেলেন। বাড়ি না বলে বাংলো বলা ভালো। সুমতি বলল, বাংলোটা নাকি আগে ছিল ধীরজকুমার বলে এক নায়কের। তাঁর কাছ থেকে ডি'সুজা কিনে নিয়েছে। পোর্টিকোর নীচে মার্সিডিজ, বিএমডবলিউ কী নেই। একটা গাড়ি দেখিয়ে সুমতি বলল, 'স্যার, ডি'সুজার কাছে এখন প্রীতি জিনটা এসেছে। এই গাড়িটা ওর। আমি চিনি।'

বাংলোর সামনের দিকে স্টুডিয়ো। রিসেপশনে বসা মেয়েটা সুমতিকে দেখে চিনতে পারল। হেসে বলল, 'প্লিজ ওয়েট। কলকাতার একটা শাড়ির কোম্পানির শুটিং চলছে। মডেল প্রীতি জিনটা। বারবার শাড়ি আর মেকাপ বদলাচ্ছে। একটু সময় লাগবে। প্রীতির শুটিং শেষ না হওয়া পর্যন্ত অ্যালেক্স বেরোতে পারবে না।'

pathagar.net

এদিক ওদিক তাকিয়ে প্রোজ্জ্বল একটু দমে গেলেন। এমনিতেই রিসেপশন হল-টা দেখে মাথা ঘুরে গেছে। তার ওপর আশপাশের লোকজন প্রত্যেকেই চেনা সেলিব্রিটি। সুন্দর মুখ। সিনেমা আর টিভির পর্দায় এঁদের প্রায়ই দেখা যায়। ডি'সুজার সঙ্গে দেখা করার জন্য এঁরা সবাই অপেক্ষা করছে। প্রোজ্জ্বল হীনম্মন্যতায় ভুগতে শুরু করলেন। এই সেলিব্রিটিদের তুলনায় তিনি কে? একজন আর্কিটেক্ট-কাম-প্রোমোটার ছাড়া তো কিছুই নন। তিনি যদি আম্বানিদের মতো এক লক্ষ কোটি টাকার মালিক হতেন, তা হলে আর পাঁচজনের সঙ্গে এ ভাবে রিসেপশনে অপেক্ষা করতে হত না।

জীবনে টাকা রোজগার করতে হবে। অনেক অনেক টাকা। ঠাণ্ডা ঘরে বসে প্রোজ্জ্বল চিন্তা করতে লাগলেন, শুধু চিড়িয়াখানার দখল নিলেই আশ মিটবে না। পরের প্ল্যানটা করতে হবে রেসকোর্সকে ঘিরে। কলকাতার ঠিক মাঝখানে অত বিরাট একটা রেসকোর্স রাখার কোনও যুক্তি আছে? রেস কোর্সে চলে যাওয়া উচিত রাজারহাটের দিকে। প্রচুর জায়গা পড়ে আছে ওই অঞ্চলে। কতটা জায়গা হবে রেসকোর্স? পঞ্চাশ-ষাট একর তো হবেই। প্রোজ্জ্বল সোনা ফলিয়ে দিতে পারেন ওই জায়গাটা পেলে। দুবাই শপিং মলের মতো একটা মল তৈরি করতে পারেন। সবাই ধন্য ধন্য করবে সেই স্থাপত্য দেখে।

ঘণ্টা খানেক পর ডি'সুজার স্টুডিওর ভেতরে ঢুকেই প্রোজ্জ্বল হোঁচট খেলেন। এ কী দীপার ছবি এখানে! দেওয়ালের বিরাট একটা

অংশ জুড়ে ব্রো আপ। কোনও সি বিচে তোলা। দু'পা সামনের দিকে টানটান করা। ভিজে বালির ওপর দু'হাতে ভর দিয়ে দীপা আকাশের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। হাওয়ায় ওর চুল উড়ছে। পরনে কোনও অন্তর্বাস চোখে পড়ল না প্রোজ্জ্বলের। পোশাক বলতে পিঙ্ক কালারের পাতলা এক টুকরো সিল্কের কাপড়। কাঁধ থেকে উরু পর্যন্ত নেমে এসেছে। স্তনবৃন্ত দু'টো ফুটে উঠেছে, উরুর অনেকটা অংশই অনাবৃত। এই ছবি যে কোনও পুরুষের কামনা জাগাতে বাধ্য। প্রোজ্জ্বল অবাক হয়ে গেলেন এই ভেবে, সি বিচে প্রকাশ্যে দীপা এই পোজে ছবি তুলতে পারল কী করে?

ছবিটা দেখে সুমতি বলল, ' কী অসাধারণ , তাই না স্যার?'

প্রোজ্জ্বল বললেন, 'হ্যাঁ, কার ছবি, জিজ্ঞেস করো তো?'

পাশ থেকে ডি'সুজা বলল, 'দীপান্বিতা। কলকাতার মেয়ে। আমার কাছে পোর্টফোলিও করাল। এমন বোল্ড মেয়ে পাওয়া মুশকিল। এর মধ্যেই পাঁচটা অ্যাড-এর মডেল হয়ে গেছে।'

কথাগুলো বলেই ডি'সুজা সোজাসুজি কাজের প্রসঙ্গে চলে এল। ছেলেটার বয়স বেশি নয়। সাতাশ কী আটাশ। খুব হ্যান্ডসাম, কম কথা বলে। এরই মধ্যে এত নাম করে ফেলেছে যখন, তখন নিশ্চয়ই ছেলেটার কোয়ালিটি আছে। দু'চারটে কথা বলার পরই ডি'সুজাকে ভালো লেগে গেল প্রোজ্জ্বলের। সব শুনে ও বলল, হেমাজির ফোটো শুট করতে পারলে খুব খুশি হবে, তবে তিন মাসের মধ্যে ডেট দিতে পারবে না। দিন দুয়েকের মধ্যেই মুম্বই ছেড়ে ও বেরিয়ে পড়ছে। তার পর সুইজারল্যান্ড, রোম... এবং ইউরোপের আরও কয়েকটা শহরে নাকি শুটিং করতে যাবে। ফিরে আসার পরও মাসখানেক ব্যস্ত থাকবে শাহরুখ খান আর প্রিয়াংকা চোপড়ার শুটিং নিয়ে। মার্চের শেষদিকে কোনও রকমে একটা

দিন বের করতে পারে।

প্রোজ্জ্বল তাতেই রাজি হয়ে গেলেন। তাড়াতাড়ির কিছু নেই। হেমা মালিনীর ক্যাম্পেনটা না হয় নতুন আর্থিক বছরের প্রথম দিকেই শুরু করবেন। শেষদিকে ড়ি'সুজাই পরামর্শটা দিল, মুম্বইয়ে হেমাজির সঙ্গে কোঅর্ডিনেট করবে সুমতি। ফোটো শুটের দিন তারিখ ঠিক করে নেবে।

দীপার কথা স্টুডিয়োর বাইরে পা রাখতেই ভুলে গেলেন প্রোজ্জ্বল। হালকা মেজাজে গাড়িতে উঠে বললেন, ' কোথায় ভালো ডিনার করা যায় বলো তো সুমতি?

'একটা সাজেশন দেব স্যার। পিওর বাঙালি খাবার খেতে চান তো একটা জায়গায় চলুন। নিরিবিলি, কেউ ডিসটার্ব করার নেই, এমন একটা জায়গা। ইচ্ছে করলে ড্রিঙ্ক করতে পারেন, ড্যান্সও। ডিনারে কই মাছের কালিয়া, দই ইলিশ। এখানে টানা চার পাঁচদিন তো হোটেলের রান্না খেলেন। আজ না হয় স্বাদ বদলাবেন। চলুন সেখানে।'

গাড়িতে মিনিট তিনেক যাওয়ার পর একটা বিরাট হাউসিং কমপ্লেক্সে ঢুকে ড্রাইভারকে সুমতি বলল, ' তোমাকে আর ওয়েট করতে হবে না। স্যারকে হোটেলে আমি পৌঁছে দিয়ে আসব।'

তার পরই দরজাটা খুলে বলল, 'আসুন স্যার। আমার ছোট্ট অ্যাপার্টমেন্ট। আপনার অসুবিধে হবে। কিন্তু ডিনার করে তৃপ্তি পাবেন।'

বলেই হাত বাড়িয়ে দিল সুমতি। গাড়ি থেকে নামার সময় বুকের আঁচল খসে পড়েছে। ওর স্তন দুটোর দিকে চোখ চলে গেল প্রোজ্জ্বলের। সেটা নজর করেও আঁচল সামলাল না সুমতি। ওর ঠোঁটের কোণে মুচকি হাসি। ওহ, তা হলে নিজের ফ্ল্যাটে নিয়ে এল সুমতি? মোহগ্রস্তের মতো ওর বাড়িয়ে

[illegible] হাতটা স্পর্শ করলেন প্রোজ্জ্বল। ভুলে গেলেন, তিনি মিত্র কনস্ট্রকশনের এম ডি। সুমতির

[illegible] ধরে রেখেই তিনি লিফটের দিকে এগোলেন। লিফটে ওঠার পর তিনি সুমতির কোমরটা জড়িয়ে

খিদিরপুরের মোড়ে বাজার করতে এসেছে শিউচরণ। আজ একটু বেশি করেই সবজি কিনে রাখবে। নয়াগ্রাম থেকে ভাইয়ের বউ কাল রাতে ফোন করেছিল, মায়ের শরীর খুব খারাপ। ডাক্তারবাবু নাকি বলে গেছেন, বাড়ির সবাইকে খবর দিতে। তার মানে মায়ের এখন তখন অবস্থা। শিউচরণ ঠিক করেছে, দিন তিনেকের ছুটি নিয়ে আজই দেশের বাড়িতে যাবে। বউ মুন্নিকে ও সঙ্গে নিতে চেয়েছিল। কিন্তু মুন্নি যেতে পারবে না। আলিপুরের একটা নার্সিংহোমে আয়ার চাকরি করে। ছুটি পাবে না।

এমনিতে হসপিটাল ছেড়ে শিউচরণ কোথাও যেতে পারে না। ও চলে গেলে পশুপাখিদের খাওয়াবে কে? যত্ন নেবে কে? ভীষণ অসুবিধে। কোথাও গেলে ও অবশ্য নিজেও সুস্থির থাকতে পারে না। পুজোর ছুটিতে নয়াগ্রাম গেছিল দিন সাতেকের জন্য। সেই সময় পালিতকে বলে গেছিল। ওর কাজটা পালিত করে দিয়েছিল। কিন্তু তখন ও ফুরনের কাজ করত। মানে... কেউ অ্যাবসেন্ট হলে, তার জায়গায় কাজে লাগত। রামভজন মারা যাওয়ার পর প্রশান্তবাবু, হরিণের এনক্লোজারে পার্মানেন্ট

কাজ দিয়েছে পালিতকে। এ বার তাই ওকে পাওয়া যাবে না। কাল বেস্পতিবার চিড়িয়াখানায় ছুটির দিন। জন্তুদের ফাস্টিংয়ের দিন। সপ্তাহে এই একটা দিন জন্তুদের কিছু খেতে দেওয়া হয় না। তাতে ওদের শরীর ভালো থাকে। ফলে এই দিনটা নিয়ে কোনও প্রবলেম নেই। ওর অনুপস্থিতিতে হসপিটালে লোক দরকার শুধু শুক্রবারটার জন্য।

বাজার করতে করতে শিউচরণ মাথা ঘামাতে লাগল, কাকে ফিট করা যায়। ছুটি চাওয়ার সময় প্রশান্তবাবু একবার জানতে চেয়েছিলেন, 'তোমার কাজের দায়িত্বটা কাকে দিয়ে যাচ্ছ?' শিউচরণ তখন বলেছিল, 'আপনি চিন্তা করবেন না স্যার, কাউকে ফিট করে যাব।'

pathagar.net

কিন্তু এখন নিজেই চিন্তাটা মন থেকে সরাতে পারছে না। হসপিটালে এখনও আছে 'রুদ্র'। সেই বাঘটা, যার পায়ে চোট লেগেছিল। সে তো আবার শিউচরণ ছাড়া কারও দেওয়া খাবার ছোঁবেই না।

বাজারের লোকজন সবাই শিউচরণকে চেনে। মাঝে মাঝে অনেকেই ওর কাছে আসে ছেলে মেয়েদের নিয়ে চিড়িয়াখানা দেখিয়ে দেওয়ার আব্দার নিয়ে। বিনে পয়সায় দেখেও যায়। এদেরই একজন কালুয়া। বাজারের ফুটপাতে বসে লঙ্কা, লেবু আর ধনেপাতা জাতীয় জিনিস বেচে। ওর পাশের দোকান থেকে বাঁধাকপি কেনার সময় হঠাৎ কালুয়া বলল, 'শিউদা, তোমার সনে একটা কতা আছে।'

মাথায় রুদ্রর চিন্তা, এখন কোনও আব্দার শোনার সময় নেই। তার ওপর কত তাড়াতাড়ি নয়াগ্রাম পৌঁছতে পারবে, শিউচরণ সেটাই ভাবছে। তাই কালুয়াকে কাটানোর জন্যই ও বলল, 'এখন না রে, চিড়িয়াখানায় এখন খুব ভিড় হচ্ছে। মাসখানেক পরে আসিস, ঢুকিয়ে দেব।'

'ধ্যাৎ তেরিকা, কে তোমার ওখানে যাচ্ছে? আমার কথাটা আগে শোনো। তোমাদের পালিত কিন্তু খুব বেপদে পড়ে যাবে।'

বাঁধাকপি চট করে থলের ভেতর ঢুকিয়ে শিউচরণ সরে এল, 'কেন রে? ও আবার কী করল?'

'৬ক এরিয়ার খুব বাজে মালদের সঙ্গে মিশচে। শালার কাপ্তেনি হঠাৎ বেড়ে গেছে। আজকাল ওয়াটগঞ্জের মাগিপাড়াতে যাচ্ছে।'

ওয়াটগঞ্জে একটা বেশ্যাপট্টি আছে। শিউচরণ জানে। পালিত ওখানে যাতায়াত করছে শুনে ওর মেজাজটা খিঁচড়ে গেল। এই সব ছেলের ক্যারেক্টার বলে কিছু নেই। সন্ধে হলেই চুল্লু নিয়ে বসে যায় কোয়ার্টারের ঘরে। ফ্যামিলির লোকজনদের সঙ্গে অশান্তি করে। ওদের

ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে চলে শিউচরণ। ওকে ইউনিয়ন চালাতে হয়। ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট যদি চুল্লু খেয়ে পড়ে থাকে, তা হলে কে মানবে?

হঠাৎই ওর মনে হল, কালুয়া যা বলছে, ঠিক। পালিতের চালচলন হঠাৎই কেমন যেন বদলে গেছে। ইদানীং দামি জ্যাকেট পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। দামি সিগারেট খাচ্ছে। ও উচ্ছন্নে গেলে শিউচরণের কিছু আসে যায় না। কেননা ও রাইভাল ইউনিয়নের মেম্বার। কিন্তু পালিত এমন যেন কিছু করে না লাগে, যাতে চিড়িয়াখানার বদনাম হয়। সেই কারণেই শিউচরণ জিজ্ঞেস করল, 'পালিত কাদের সঙ্গে মিশছে বললি, কালুয়া?'

'তুমি খপর নাও। তোমাদের বান্টি সব জানে। শালা আজকাল আমাদের বস্তিতেও ঘুরঘুর করচে মানা বলে একটা মেয়েকে পটাতে। একদিন থাবড়া দিলাম। ওগে' শেল্টার নেল ফারুকের কাছে।

ফারুক কী মাল, তা তো জানে নে। পুলিশ অলরেডি ওর পেছনে নেগেচে। থানার ছোটবাবু কিন্তু আমায় বলেচে। ছোটবাবু রোজ আমার এখেন থেকেই নেবু আর নঙ্কা নে যায়।'

কালুয়ার সঙ্গে কথা বলতে বলতেই শিউচরণ লক্ষ করল, মাংসের দোকান রহমনিয়া থেকে বেরিয়ে আসছেন ডিরেক্টর সাহেব। নিশ্চয়ই আজ বাড়িতে কোনও লোককে নেমন্তন্ন করেছেন। স্যারের চোখে যাতে না পড়ে সেজন্য ও সরে পড়তে চাইল। দেখা হলে কী কাজ ধরিয়ে দেবেন, কে জানে? তখন দেশের বাড়িতে যাওয়ার বারোটা বেজে যাবে। বাগানে যেন আর কোনও কিপার নেই। সব ব্যাপারে দাদা ওরাই। তাড়াতাড়ি ও কালুয়াকে বলল, ' তোর সঙ্গে পরে কথা বলব। পালিতের ওপর তুই একটু নজর রাখিস।' বলেই শিউচরণ বাজারের ভিড়ে ঢুকে পড়ল।

বেলা প্রায় দশটার সময় বাজার নিয়ে কোয়ার্টারে ফিরে এল

শিউচরণ। ও ঠিক করল, বারোটার আগে বেরিয়ে পড়বে। হাওড়া স্টেশন থেকে মেদিনীপুর লোকাল ট্রেনে সোয়া তিন ঘণ্টা। তার পর [illegible] থেকে এক ঘণ্টা অন্তর ট্রেকার। কপাল ভালো থাকলে সঙ্গে সঙ্গে যদি ট্রেকার পেয়ে যায়, তা হলে নয়াগ্রাম পৌঁছতে আরও আধ ঘণ্টা। সন্ধ্যে ছ'টার মধ্যেই ও পৌঁছে যাবে নয়াগ্রামে। হাতের থলেটা [illegible] মুন্নিকে ও বলল, 'আমি কিন্তু এখুনি বেরিয়ে যাব।'

ছোট্ট এক কামরার কোয়ার্টার। একটা তক্তপোষ পাতার পর ঘরে আর জায়গা নেই। মাকে দেশের বাড়ি থেকে নিয়ে এসে কলকাতায় চিকিৎসা করানোর ইচ্ছে হয় শিউচরণের। কিন্তু জায়গার অভাবে ইচ্ছেটা পূরণ করতে পারে না। ঘরের লাগোয়া এক ফালি রান্না করার জায়গা। সেখানে স্টোভে চায়ের জল ফোটাচ্ছিল মুন্নি। ওখান থেকেই উত্তর দিল, 'আগে চা খাও। তার পরে স্নানে যেও।'

গা থেকে হাফ হাতা সোয়েটার, শার্ট আর গেঞ্জিটা খুলে ফেলল শিউচরণ। অনেকটা হেঁটে আসার [illegible] গেছে। গামছা দিয়ে গা-টা ও মুছে নিল। কাল রাত থেকেই ঠাণ্ডাটা হঠাৎ কম। কলকাতায় [illegible] এই ডিসেম্বরেও শীত নেই। যাকগে, শীত-গ্রীষ্মতে ওর কী এসে যায়? সময় নষ্ট করে লাভ নেই। হাত বাড়িয়ে তাক থেকে সরষের তেলের ডিবে টেনে নিল শিউচরণ। তালুতে খানিকটা তেল ঢেলে, ও গায়ে-হাতে মাখতে লাগল। এই সময়টা ওরা স্বামী-স্ত্রী নিজেদের মধ্যে সাংসারিক কথাবার্তাগুলো সেরে ফেলে। কেননা রান্নাবান্না সেরে বেলা একটার মধ্যেই মুন্নি দৌড়য় ওর নার্সিংহোমে। দুটো থেকে ওর ডিউটি। ফেরে সেই রাত দশটায়।

চায়ের কাপ হাতে নিয়ে তক্তপোষের কাছে এসে দাঁড়াল মুন্নি। বলল, 'মাইনেটা কি আজ তুমি তুলতে পারবে? নয়াগ্রামে গিয়ে কী

অবস্থায় পড়ব, জানো না। হাতে কিছু বাড়তি টাকা নিয়ে যাও।'

এই রে... মনেই ছিল না আজ মাইনের ডেট। শিউচরণ লজ্জিত মুখে বলল, 'যাওয়ার আগে মাইনেটা তুলে দিয়ে যাচ্ছি।'

'সকালে পুতলি এসেছিল। বলল, দিদি তুমি শিউদাকে বল আমার একটা ব্যবস্থা করে দিতে। ইউনিয়নের লোক, শিউদা বললে, সাহেব ফেলে দিতে পারবে না।'

পুতলি মানে... রামভজনের বউ। কাল ম্যানেজমেন্ট কমিটির মিটিংয়ের পর শিউচরণরা খবর পেয়েছে, রাজ্য সরকার চিড়িয়াখানার জন্য নতুন কুড়ি জন লোক নেবে। পুতলির জন্য দাবিটা তোলাই যায়। দাবিটা ও একা তুললে রাইভাল ইউনিয়ন বাগড়া দেবে। তার চেয়ে সবাই মিলে ডিরেক্টর সাহেবকে বলাটাই ভালো। না হলে মেয়েটা পথে বসবে। চাকরির আশ্বাস এখন অবশ্য পুতলিকে দেওয়া যাবে না।

শিউচরণ তাই বলল, ' দেখি, সবাই মিলে কী করা যায়।'

চায়ে চুমুক দিয়ে মুন্নি খবর দিল, 'পালিতের ঘরে আজ কালার টিভি এল। কোত্থেকে এত টাকা পাচ্ছে গো?' কোয়ার্টারে শিউচরণই প্রথম ছোট্ট একটা ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট টিভি কিনে এনেছিল। দেশে ধান বেচে কিছু টাকা পেয়েছিল, সেই টাকায়। তখন ওর ঘরে সন্ধেবেলায় ভিড় লেগে থাকত। এ নিয়ে চাপা গর্ব ছিল মুন্নির। এখন অবশ্য অনেকের ঘরেই সাদা-কালো টি ভি। কোয়ার্টারে যারা থাকে, তাদের মাইনেপত্তর মোটামুটি একই রকম। কেউ রঙিন টিভি কেনার কথা ভাবতেও পারে না। একজন কিনে আনলে অন্যদের চোখ তো টাটাবেই। ঈর্ষা এমনই একটা জিনিস, দ্রুত সংক্রমিত হয়। ছেলেটার সম্পর্কে ভালো করে খোঁজ নিতে হবে কালুয়ার কাছে। মুন্নিকে ও বলল, ' যে যা ইচ্ছে করুক। আমাদের জানার কী দরকার?'

'হ্যাঁ গো, সেদিন কাগজে পড়লাম, হাজরার মোড়ে কোন এক দোকানে নাকি ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট টিভির বদলে, কম দামে কালার টিভি দিচ্ছে। কত পড়তে পারে, বলো তো?'

'ছয়-সাত হাজার তো লাগবেই। কেন, তুমি কিনবে নাকি?'

'ধরো যদি কিনি।'

'টাকা পাবে কোথায়?' শিউচরণ সত্যিই অবাক।

'সংসার খরচ থেকে একটু একটু করে বাঁচিয়েছি। একটু খোঁজ করে দেখবে কোন দোকানে পাওয়া যায়?'

' তোমার যদি খুব ইচ্ছে হয়, তা হলে কেনো। আমার কোনও আপত্তি নেই।'

'তা হলে কি আজই একবার হাজরার মোড়ে যাব কল্পনাদিকে নিয়ে?'

শিউচরণ বলল 'আগে দেখ, মা কেমন থাকে। টাকাটা না আবার ওখানে লেগে যায়।'

'লাগবে না। আমি বলে দিচ্ছি। মা এখনও অনেক বছর বাঁচবে।'

চা খাওয়া শেষ করে শিউচরণ তক্তপোষের নীচে নামিয়ে রাখল কাপটা। আর তখনই ও আতপ

চালের মতো একটা মিষ্টি গন্ধ পেল। তক্তপোষের নীচে তা হলে গন্ধগোকুল শেল্টার নিয়েছে। চিড়িয়াখানায় কাঠবেড়ালির মতো দেখতে একটা জন্তু আছে—গন্ধগোকুল। গা দিয়ে আতপ চালের মতো গন্ধ বেরোয়।

দিনের বেলায় কোনও গর্ত-টর্তে থাকে। রাতের বেলায় খাবারের লোভে এসে কোয়ার্টারে হানা দেয়। তার মানে, কাল রাতে

এসে তক্তপোষের তলা থেকে গন্ধগোকুলটা আর বেরোতে পারেনি। ওখানে নানা জিনিস ডাঁই করা আছে। খুঁজে পাওয়াও মুশকিল। উবু হয়ে শিউচরণ গন্ধগোকুলটাকে খোঁজার সময়ই হঠাৎ ওর মোবাইলটা বেজে উঠল। শুনে বুক কেঁপে উঠল শিউচরণের। নয়াগ্রামের নয়তো? ডান হাত বাড়িয়ে মোবাইল সেটটা দ্রুত টেনে নিয়ে ও স্ক্রিনের দিকে চোখ দিল। হ্যাঁ, নম্বরটা ওখানকারই। তা হলে কি মায়ের কিছু হল? কাঁপা গলায় শিউচরণ জিজ্ঞেস করল, 'কে বলছেন?'

'শিউ আমি রে, নুরুল। নয়াগ্রাম থিকে।'

নুরুল ইসলাম। ওদের বাড়ির কাছেই থাকে। এক সঙ্গে স্কুলে পড়ত। এখন চাষবাস করে, সেই সঙ্গে বাম রাজনীতিও। বেশ পয়সাকড়ি করেছে। ওদের বন্ধুত্বটা এখনও টিকে আছে। শিউচরণ দেশের বাড়িতে গেলে নুরুল রোজ দেখা করতে আসে। কলকাতা সম্পর্কে নানা কথা জানতে চায়। গ্রামের লোকজনের মুখে শিউচরণ শুনেছে, ওরা নুরুলকে পঞ্চায়েতের চেয়ারম্যান করতে চেয়েছিল। কিন্তু ও নাকি হতে চায়নি। কোনও রকম দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত থাকতে চায় না বলে। প্রচণ্ড দরকার না হলে নুরুল ফোন করত না। হঠাৎ করল কেন? তবে কি মা বেঁচে নেই?

ও বলল, 'মা কেমন আছে রে?'

'কী হয়েছে তুর মায়ের? জানি নি তো? আমি অবশ্য অনেকদিন তুদের বাড়ি যাইনি। কাল ফেরি ঘাটে

তুর ভাইয়ের সঙ্গে দেখা হল। কিছু বলল নি তো?'

শুনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল শিউচরণ। বলল, 'না না , ঠিক আছে. তই বল। ফোনটা করলি কেনে?'

' আরে, ইখানে একটা পিকিউলিয়ার হুছে। আমাদের পঞ্চায়েতের মেম্বাররা বলল, খবরটা তুকে জানাতে। তাই তুকে বুললাম।'

'কী হইছে, বল।'

' ইখেনে কারা যেন হনুমানের প্যাট কেটে লিচ্ছে রে।'

'কী বলছিস তু, বুঝতে পারছিনি । হনুমানের প্যাট কাটছে কে?'

' আরে সেটাই তো জানি নি । জঙ্গলের বড়বড় হনুমানগুলা আছে না, দাড়িওয়ালা, উদের অনেকের প্যাট কাটা। কাটা জায়গায় লাল শালু দিয়ে পট্টি মারা। দুটা মরে গিছে গাছ থিকে পড়ে। আজ সকালে আমার বাড়ির সামনে একটা হনুমান ধুপ করে পড়ল। সেটা ধরে লিয়ে এসে দেখি,ওই কাণ্ড।'

'অবাক কাণ্ড। হনুমানটা এখন কুথায়?'

'আমার ঘরে। ভেট ডাক্তারকে খবর দিছি। তু একবার আয় শিউ। ইখেনে প্যানিক হয়ে গিছে।'

নুরুল যখন ওর সঙ্গে কথা বলে, তখন মাঝে মধ্যে গ্রাম্য ভাষা ব্যবহার করে। ওর কথাগুলো

শিউচরণ ঠিক বুঝতে পারল না। দেশের বাড়িতে রেসাস মাঙ্কির খুব অত্যাচার। সাইজে বেশ বড় হয়।

চলতি কথায়, সবাই বলে হনুমান। দল বেঁধে গেরস্থের বাড়িতে ঢুকে ওরা কলা মূলো খেয়ে যায়। কেউ

লাঠি নিয়ে তেড়ে যায় না। ওই সব অঞ্চলে হনুমানকে প্রায় সবাই ভক্তি করে। অনেক জায়গায় হনুমানের

মন্দিরও আছে। হনুমান মারা গেলে তার শ্রাদ্ধশান্তি হয়। এমন কী, লোকজন খাওয়ানোর আয়োজনও

থাকে । হঠাৎ কী হল, একসঙ্গে কয়েকটা হনুমানকে পেট কাটা অবস্থায় পাওয়া গেল? সত্যিই রহস্যজনক
ব্যাপার। নুরুলকে ও বলল, 'তুর বাড়িতে যে হনুমানটা রইছে, উটা কি বেঁচে আছে?'

'একদম মরামরা। প্যাট থেকে লাল পটিটা খুলে কী দেখলাম, জানিস? কাটা জাগাটা সিলাই করা। ই মানুষের কাজ, বুঝলি। লিশ্চয় কারও কোনও মতলব আছে ঠিক বুলেছিস।'

'ই মানুষের কাজই হবে। তবে ও মানুষটা ঢ্যামনা আছে।'

'তু চিড়িয়াখানার জন্তু জানোয়ার নিয়ে পড়ে আছিস ভাই। পঞ্চায়েতের চেয়ারম্যান বুলল, তু নাকি ' আরও ভালো বুঝতে পারবি। একবারটা আইসবি? তুর আসা দরকার।'

শিউচরণ বলল, 'মায়ের শরীরটা ভালো নাই । আজই দেশে

যাচ্ছিলাম। ঠিক আছে, বাড়িতে ঢোকার আগে একবার তুর ওখানে যাব। তুরা একটা কাজ কর। থানায় গিয়ে ডায়েরি করে রাখ। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের লোকজনদেরও খপর পাঠা। না হলে পরে প্রবলেমে পড়ে যাবি। কারা এ কাজ করতে

পারে বল তো? কাউকে সন্দেহ করিস?'

'আমার তো ডাউট, মাওবাদীদের কাজ। গুড়গুড়িপালের জঙ্গলে উরা শেল্টার লিয়েছে। উরা জানে ই দিকের মানুষজন হনুমান পুজো করে। মেজালি আমাদের পার্টির সাপোর্টার। একটা ডিসটার্বেন্স পাকানোর চেষ্টা করছে। যাতে লোকে আমাদের ওপর বিশ্বাস হারায়। পুলিশকে সব জানিয়েছি। ইর মধ্যে পুলিশ এক বার কোম্বিং অপারেশনও করেছে। কিন্তু কিছু লিফলেট ছাড়া আর কাউকে পায়নি।'

নুরুলের কথাগুলো ঠিক মনঃপুত হল না শিউচরণের। হনুমানের পেট কাটার সঙ্গে রাজনীতির কোনও সম্পর্ক নেই। বামপন্থীরা আজকাল সবকিছুতেই মাওবাদীদের ভূত দেখা শুরু করেছে। ও নিজে একটা ইউনিয়ন চালায়, ভালোমতো জানে। যাক গে, ফোনে কথা বলে সময় নষ্ট করে কোনও লাভ নেই। তাই ও বলল, 'শুন, ইর মধ্যে যদি কুনও হনুমানের বডি কুথাও পাস, তা হলে তুর জিম্মায় রেখে দিস। পোস্টমর্টেম করার দরকার হতে পারে। আচ্ছা, ছাড়ি তা হলে। সন্ধেবেলায় দেখা হবে।'

মোবাইলটা অফ করে শিউচরণ গুম হয়ে বসে রইল। ওর মনে হল, এটা সাধারণ ঘটনা নয়। নিশ্চয়ই এর পিছনে অন্য কোনও রহস্য আছে। আগে সাঁঝেলি ম্যাডামের কাছে একবার যাওয়া দরকার। ম্যাডামকে আজ চিড়িয়াখানাতেই পাওয়া যাবে। লাইব্রেরির চাকরিতে আজই উনি জয়েন করছেন। শিউচরণ ঠিক করে নিল, রেডি হয়ে বেরিয়ে, মাইনে তুলে, প্রথমে ও লাইব্রেরিতে যাবে। ম্যাডামকে সব কথা জানাবে। তারপর রওনা হবে নয়াগ্রামের দিকে।

১৫

সাঁঝেলি টিপস না দিলে সত্যিই অর্ক, একটা বড় খবর তাড়া করার

সুযোগ পেত না। সকালে সুপার ফাস্ট ট্রেন ধরে, ও সাড়ে আটটার মধ্যে মেদিনীপুরে চলে এসেছে। শিউচরণের জন্য অপেক্ষা করছে প্ল্যাটফর্মে। তবে একটু আশঙ্কার সঙ্গে। লোকটাকে মাত্র একদিনই দেখেছে ও চিড়িয়াখানায়। মুখটাই মনে করতে পারছে না। দেখলে চিনতে পারবে কী না, তাতে ঘোরতর সন্দেহ আছে।

হাওড়া স্টেশন থেকে ওঠার সময় গোটা চারেক কাগজ কিনেছিল অর্ক। সবগুলো পড়ে উঠতে পারেনি। সময় কাটানোর জন্য একটা ইংরেজি কাগজ ও চোখের সামনে মেলে ধরল। লিড নিউজ 'কিডনি চক্রের চাঁই অমিতকুমার গ্রেফতার। তাকে নেপাল থেকে দিল্লিতে নিয়ে আসা হয়েছে।' সেকেন্ড লিড, 'ভগবানপুরে ফের সারদিন সংঘর্ষ।' ইকো বায়োলজিক্যাল পার্কের খবরটা অন্যরা চেপে গেলেও, এই কাগজটা এখনও বড় করে ছেপে যাচ্ছে। ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটির প্রেসিডেন্ট নিরঞ্জন রাফতানের একট বড় বিবৃতি দেখে, পড়তে লাগল অর্ক। মাই গড, একেবারে তুলোধোনা করে দিয়েছে

সরকার আর রথীন সরকে। লোকটা যেদিন প্রথম ওর কাছে এসেছিল, সেদিন ওকে অতি সাধারণ গ্রাম্য মানুষ বলে মনে হয়েছিল। মাস খানেকের মধ্যে এতটা বদলে গেল কী করে?

জ্বর থেকে ভালো হয়ে ওঠার পর, দিন তিনেক অর্ক অফিসে যেতে পারেনি। তার মধ্যে কমলেন্দুকে দিয়ে দিব্যদা বেশ কয়েকটা রিপোর্ট লিখিয়েছিল রাফতানদের বাম্বু দিয়ে। তার পর স্বাভাবিক কারণেই ওদের কাগজের ওপর চটেছে রাফতানরা। মাঝখানে ওদের মনোভাব বোঝার জন্য অর্ক একবার ওপদ কাহারকে ফোন করেছিল। বিস্তর অভিযোগ শুনতে হল। কী আর করা যাবে? কাগজটা তো আর ওর বাবার নয় যে, সব খবর ওর ইচ্ছেমতো ছাপা হবে? অর্ক তাই অন্য দিকে মন দিয়েছে। নয়াগ্রামে এসেছে সেই কারণে।

দিব্যদাকে কিছু জানায়নি। মেদিনীপুরে দিব্যদার পেয়ারের করেসপন্ডেন্ট আছে। সুমিত দাস। প্রায়ই ফালতু খবর ওর নাম দিয়ে ছাপা হয়। নয়াগ্রামের হনুমানদের কথা দিব্যদাকে জানালে, সঙ্গে সঙ্গে বলত, ' তোর যাওয়ার দরকার কী ? সুমিতই ওখান থেকে করে দেবে।'

'নমস্কার অর্কবাবু। আমি শিউচরণ মাহাতো।'

কাগজের পাতা থেকে মুখ তুলে, সামনে দাঁড়ানো লোকটার দিকে তাকাল অর্ক। মাথায় উস্কো খুস্কো চুল, লাল চোখ, মুখে সারা রাত অনিদ্রার ছাপ স্পষ্ট। গায়ে একটা সস্তার শাল জড়ানো। গলায় কাছা দেওয়া। হাঁটু অবধি ধুতি, খালি পা। নিশ্চয়ই কেউ মারা গেছে। নিজে পরিচয় না দিলে, শিউচরণকে অর্ক চিনতেও পারত না। ও বলল, 'কী হয়েছে তোমার শিউ? কোনও মিসহ্যাপ?'

গায়ের শাল সামলাতে সামলাতে শিউচরণ বলল, 'কাল রাত ন'টায় মা মারা গেছে। শ্মশান থেকে একটু আগে ফিরলাম। চলুন, যাওয়া যাক।'

অর্ক বলল, 'তা হলে আমাকে নিতে এলে কেন শিউ ? অন্য কাউকে পাঠিয়ে দিতে।'

'কী বলছেন স্যার। আপনাকে ম্যাডাম পাঠিয়েছেন। আপনার দায়িত্ব আমার। অন্য কারও ওপর ছেড়ে দিতে পারি?'

ম্যাডাম মানে সাঁঝেলি। প্ল্যাটফর্ম থেকে শিউচরণের পিছন পিছন বেরিয়ে আসার সময় অর্ক বলল, ' তোমার মা মারা যাওয়ার খবরটা কাল রাতে ম্যাডামকে ফোন করে বলে দিলেই পারতে। তা হলে আমি আসতাম না।'

' না স্যার হনুমানগুলোর কথা ভেবেই আপনাকে না করতে পারলাম না। চলুন, বড়িতে গিয়ে সব বলছি। এখানে এ সব কথা আলোচনা করা সেফ হবে না। অনেক ঘটনা ঘটে গেছে।'

'নয়াগ্রামে... আমরা যাব কীভাবে শিউ?'

‘ আপনার জন্য গাড়ির ব্যবস্থা করেছি। আমার বন্ধু নুরুল ইসলামের মারুতি আছে স্যার। ওর বাড়িতেই আপনি উঠবেন। আমার বাড়িতে নিয়ে যেতে পারছি না বলে মাফ করবেন স্যার। বুঝতেই পারছেন, অশৌচ।’

‘কী হয়েছিল তোমার মায়ের?’

‘ ওল্ড এজ প্রবলেম। কিডনি, লিভার সব খারাপ হয়ে গেছিল। এই দিকে আসুন স্যার, গাড়িটা পার্কিংয়ে রাখা আছে।’

গাড়ির কাছে গিয়ে অর্ক বুঝতে পারল, শিউচরণ একা আসেনি। গাড়িতে ড্রাইভারের সিটে একজন

বসে আছে। তার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল শিউচরণ, ‘এ আমার বন্ধু নুরুল। এখানকার পঞ্চায়েতের মেম্বার। আপনাকে যা ব্রিফ করার, এ করে দেবে। আমি বাড়িতে হবিষ্যি সেরে, বেলা একটার সময় আপনার কাছে আসছি। কিছু মনে করবেন না স্যার।’

স্টেশন চত্বর ছেড়ে গাড়ি বেরোনোর পর অর্ক বুঝতে পারল, মোটর বাইকে করে তিন-চারটে ছেলে ওদের পিছনে পিছনে আসছে। ওরা কারা, জিজ্ঞেস করতে গিয়েও চুপ করে গেল ও। সম্ভবত, নুরুলের লোক। আজকাল গ্রামের দিকে মানুষের হাতে পয়সা এসে গেছে। বিশেষ করে, যারা ক্ষমতাসীন পার্টি করে। এই মোটর বাইক বিগ্রেড এখন পশ্চিমবাংলার গ্রামাঞ্চলে সর্বত্র দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। নন্দীগ্রামেও অর্ক এই বাহিনীকে দেখেছে। দ্রুত আতঙ্ক ছড়াতে এদের জুড়ি নেই।

শিউচরণ মুখে কুলুপ এঁটে রয়েছে। বোঝাই যাচ্ছে, ওর শরীরের ওপর দিয়ে ঝড় বয়ে গেছে। অথচ কী কঠিন মন, কর্তব্যের খাতিরে লোকটা কিন্তু স্টেশনে চলে এসেছে। একটু আগে ও বলল, ‘হনুমানগুলোর কথা ভেবে আর থাকতে পারলাম না।’ জন্তু

জানোয়ারদের ওপর অসীম ভালোবাসা না থাকলে, এই কালাশৌচের মাঝেও কি কেউ ছুটে আসতে পারে? কিন্তু কেন শিউচরণ বলল, 'এ সব কথা বাইরে আলোচনা করা নিরাপদ নয়।' নিশ্চয় কোনও কারণ আছে। কথাটা মনে হতেই অর্ক নিশ্চিত হল, মেদিনীপুরে ওর ছুটে আসা ব্যর্থ হবে না। বড় খবর পাবে।

মনে মনে ও কৃতজ্ঞতা জানাল সাঁঝেলিকে। মাত্র মাস দেড়েক হল, মেয়েটার সঙ্গে আলাপ হয়েছে। এরই মধ্যে তিনটে বড় খবরের টিপস দিয়েছে। খবর দেওয়াটা অবশ্য বড় নয়। তার থেকেও বড় কথা, ওদের সম্পর্কটা ইতিমধ্যেই তিনগুণ গাঢ় হয়ে উঠেছে। সাঁঝেলি সম্পর্কে ওর ধারণাটা বদলে যায় জ্বরে ভোগার দিন থেকে। পরে নন্দিনীর মুখে শুনেছে, ওকে ওই অবস্থায় দেখে, সাঁঝেলি নাকি খুব বিচলিত হয়ে পড়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে ফোন করে লেক গার্ডেন্স থেকে কোন এক ডাক্তারকে ও ডেকে আনে। বাড়ি থেকে শিবা বলে একজন কাজের লোককে আনিয়ে নেয়। তাকে দিয়ে ওষুধ কেনানো, রক্ত পরীক্ষার

জন্য প্যাথলজিক্যাল সেন্টার থেকে লোক আনানো-সবই নাকি সাঁঝেলি করিয়েছিল। সেই রাত্তিরে শিবা ছেলেটি যে ওর ফ্ল্যাটে ছিল, অর্ক তা পরে জেনেছে। নন্দিনী কথাটা
শেষ করেছিল এইভাবে, 'পিপি তোর জন্য যা করেছে অর্ক, তোর আপনজনরাও অতটা করত না।'

খুব দ্রুত ওরা আপনি থেকে তুমিতে নেমে এসেছে। কারণে, অকারণে সাঁঝেলিকে দিনে একবার ফোন না করলে, অর্কর ভালো

লাগে না। সাঁঝেলিও দিনে দু-তিনবার ফোন করে। রামকৃষ্ণ মিশন হোস্টেলে পড়াশুনা করার দরুন মেয়েদের সঙ্গে খোলামেলা মেশামেশির সুযোগ পায়নি অর্ক। খবরের কাগজের অফিসে ঢোকার পর কারও সঙ্গে প্রেম করার কথা ওর মাথায় আসেনি। কিন্তু সাঁঝেলির সঙ্গে ভালোভাবে আলাপ হওয়ার পর থেকে মেয়েটাকে ওর বেশ ভালো লাগছে। এমন আশ্চর্য মেয়ে পৃথিবীতে আছে বলে ওর ধারণা ছিল না। যে শুধু পশুপাখির কল্যাণে নিজের জীবনটা কাটাতে চায়। ওকে নিয়ে মাঝে একদিন অর্ক প্রেস ক্লাবে গিয়েছিল। কোনও কারণে পরিবেশটা সাঁঝেলির পছন্দ হয়নি। লনে কয়েক মিনিট বসার পরই ও তাগাদা দিতে শুরু করে, অন্য কোথাও চল। এখন মাঝে মাঝে সময় পেলেই ওরা গিয়ে বসে বালিগঞ্জের কাফে কফি ডে-তে। সাঁঝেলির একটা দুর্বলতা অর্ক ধরে ফেলেছে। ওর আইডল আশিসদাকে নিয়ে কোনও টিপ্পনি কাটলেই ও মারাত্মক রেগে যায়।

... পিচের রাস্তায় গাড়ি মসৃণ গতিতে দৌড়চ্ছে। উল্টো দিক থেকে কখনও বাস, ট্রেকার বা সাইকেল ভ্যান হুশ করে চলে যাচ্ছে। একেকটা ট্রেকারে কুড়ি বাইশজন। কেউ কেউ বিপজ্জনক ভাবে ঝুলে ঝুলে যাচ্ছে। হয়তো এক-দেড় ঘণ্টা অন্তর অন্তর ট্রেকার ছাড়ে। তাই অত গাদাগাদি। রাস্তার দু-পাশে বেশিরভাগ জায়গায় জঙ্গল। একটা জায়গায় অর্কর চোখে পড়ল, লেখা আছে হাতিমারির মন্দির। বোধ হয় এইসব অঞ্চলে হাতির খুব

উৎপাত। কেউ কোনও কালে হাতি মেরেছিলেন। তিনিই মন্দির গড়ে দেন। তাই নাম হয়েছে হাতিমারির মন্দির
। ঠিক ওই মন্দিরের কাছে নেমে যাওয়ার আগে শিউচরণ বলল, 'নুরুল দেখিস, স্যারের যেন অযত্ন না হয়।'

গাড়ি ফের চলতে শুরু করার একটু পরেই বুক পকেটে রাখা মোবাইলটা বেজে উঠল। বের করে এনে কানে দিতেই সাঁঝেলির গলা পেল অর্ক, 'পৌঁছেছ?'

সঙ্গে সঙ্গে ওর মেজাজটা ভালো হয়ে গেল। বলল, 'হ্যাঁ, নয়াগ্রামের দিকে যাচ্ছি। তুমি কোথায়?'

' চিড়িয়াখানায়। খুব মজা লাগছে, জানো। এতদিন গেটের বাইরে থেকে আশিসদার সঙ্গে বিপ্লব করতাম। এখন থেকে মনে হচ্ছে, আমি এদেরই একজন।'

শুনে অর্কর হাসি বেল। কাল রাতেই নন্দিনীর বাড়িতে সাঁঝেলির সঙ্গে ওর প্রবল তর্কাতর্কি হয়েছিল, এন জি ও -দের কাজকর্ম নিয়ে। অর্ক বলেছিল, এনজিও-দের নাইন্টি পার্সেন্ট মতলবী, টাকা কামানোই ওদের লক্ষ্য। সাঁঝেলি তীব্র প্রতিবাদ করেছিল। আশিসদার উদাহরণ দিয়ে বলেছিল, 'নিজের ভুল একদিন নিজেই তুমি বুঝতে পারবে। তখন মনে হবে, ফালতু সময় নষ্ট করেছ।' নন্দিনী থামিয়ে না দিলে তর্ক আরও গড়াত। সেই কথাটা মনে পড়ায় অর্ক হেসে বলল, 'এখন ছাড়ছি, বুঝলে। মোবাইলে চার্জ দিতে হবে।

স্পট থেকে পরে তোমাকে ফোন করব।'

নুরুলের বাড়ি অর্করা পৌঁছাল আরও মিনিট দশেক বাদে। এরই মধ্যে টুকটুক করে নয়াগ্রাম সম্পর্কে ও অনেক কথা জেনে নিল। নয়াগ্রামে সিডিউল কাস্ট বেশি। লোধা, শবরদের বাস। শিক্ষার হার খারাপ নয়। তবে বেশিরভাগই কৃষিজীবী। রাজনীতি করে বলেই, নুরুল লোকটা ভালো কথা বলে। আরও আশ্চর্যের, খুঁটিয়ে খবরের কাগজ পড়ে, টিভি নিউজ দেখে। ওদের কাগজ নিয়েও নুরুলের বিস্তর অভিযোগ। বেশ রাগ সুমিতের ওপর। আগের বার বিধানসভা নির্বাচনের সময় সুমিত নাকি ওদের পার্টির বিরুদ্ধে অনেক গোলমেলে রিপোর্ট লিখেছিল। তাই পার্টির লোকেরা ঠিক করেছে, এ

বার পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময় ওকে গ্রামে ঢুকতেই দেবে না।

শুনে অর্ক মুচকি হেসেছিল, যত দোষ নন্দ ঘোষ। কিন্তু অসুস্থ হনুমানটা দেখার পর ওর মুখ থেকে হাসি মিলিয়ে গেল। একতলার একটা ঘরে তোষকের ওপর কাৎ হয়ে পড়ে আছে। গায়ে কাঁথা চাপা।

দেখে মনে হয়, একটা মানুষ শুয়ে আছে। ঘরে আরও দু'জন লোক হাজির। তাদের একজনকে উদ্দেশ্য করে নুরুল বলল, 'ও আপনি এসে গেছেন? কী রকম দেখলেন ডাক্তারবাবু?'

ভদ্রলোক বললেন, ' অবস্থা ভালো বুঝছি না। স্টিচ দু'তিনদিনের পুরনো বলে মনে হচ্ছে। অনেক ব্লাড লস হয়ে গেছে। স্টিচের জায়গাও পেকেছে। আমি একটা ইনজেকশন দিলাম। নতুন করে ব্যান্ডেজ করেছি। এই দেখুন না।'

ভদ্রলোক তা হলে ভেটেরেনারি সার্জেন। সঙ্গে সঙ্গে অর্কর মাথায় দুটো প্রশ্ন খেলে গেল। তবুও ও চুপ করে রইল হনুমানের ক্ষতটা দেখার জন্য। কাঁথা সরিয়ে হনুমানটাকে সোজা করে শোয়ালেন ভদ্রলোক। তার পর পিছনের পা দুটো টেনে দু'পাশে সরিয়ে দিয়ে বললেন, 'পেট কাটার আগে একে নির্ঘাত ট্রাঙ্কুলাইজ করা হয়েছিল। এরকম কেস আমার কাছে কখনও আসেনি।'

নুরুল বলল, 'গুড়গুড়ি পালের জঙ্গলে আমার ছেলেদের পাঠিয়েছিলাম। এ রকম আরও দুটো হনুমান ওরা দেখে এসেছে। আমার মনে হয়, এটা অর্গানাইজড ক্রাইম। কারা করল সেটা জানার চেষ্টা করছি। আগে একে সুস্থ করে তুলি।'

'আমারও তাই মনে হচ্ছে। কিন্তু যা করার, দ্রুত করুন।'

'আপনি কী বলেন? সদরে নিয়ে গেলে কিছু সুবিধে হবে?'

ডাক্তারবাবু বললেন,' এর যা অবস্থা দেখছি, আজ বিকেলের মধ্যে ভালো ট্রিটমেন্ট না পেলে কোলাপস করে যেতে পারে। আগে এর একটা আলট্রাসোনোগ্রাফি করে রাখলে ভালো হয়। মেদিনীপুরে আমার ওখানে সে রকম মেশিন নেই। বেস্ট হয়, আপনারা যদি একে কলকাতায় নিয়ে যেতে পারেন। আমার মনে হয়, তারও আগে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টকে পুরো ব্যাপারটা আপনাদের জানিয়ে রাখা উচিত। এই ধরনের রেসাস ম্যাঙ্কি ওয়াইল্ড লাইফ প্রোটেকশন লিস্ট-এ আছে। আপনার পজেশনে যদি মারা যায়, তা হলে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট

আপনাকে হ্যারাস করতে পারে।'

হনুমানের মুখের দিকে তাকিয়ে অর্কর মতো রিপোর্টারের বুকটা মুচড়ে উঠল। মুখ একদিকে কাৎ করে রেখেছে, চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। ডাক্তারবাবু পা দুটো ছেড়ে দিয়েছেন। তাসত্ত্বেও, হনুমানটা পা দু'দিকে ছড়িয়ে রাখল। যেন পেটের কাটা জায়গা দেখাতে চাইছে। কেন জানে না, অর্কর হঠাৎ মনে হল, অভিমানে মুখ ঘুরিয়ে রেখেও, হনুমানটা যেন বলতে চাইছে, দেখ, তোমরা আমার কী অবস্থা করেছ। ওর রিপোর্টার সত্তা বলতে লাগল, এটা ডেফিনেটলি কোনও দুষ্ট চক্রের কাজ।

কিন্তু এর পিছনে যদি কোনও মানুষের হাত থাকে, তা হলে সে এই দুষ্কর্ম করতে যাবে কেন? মনে মনে এই প্রশ্নটারই উত্তর ও খুঁজতে লাগল। হঠাৎই ইংরেজি কাগজের হেড লাইনটা ওর চোখের সামনে ভেসে উঠল, কিডনি চক্রের চাঁই গ্রেফতার। কিডনি কথাটা বর্শার ফলার মতো ওর মাথায় ঢুকে গেল। এমনও তো হতে পারে, এই হনুমানগুলোর পেট কাটা হয়েছে, কিডনি চুরির উদ্দেশ্যে। কিন্তু হনুমানের কিডনি নিয়ে মানুষ করবেই বা কী? হনুমানের কিডনি কি মানুষের কাজে লাগে? মনে হয় না। এক্সপার্টদের কাছ থেকে সেটা অবশ্য জেনে নিতে হবে। একটু ঘুরিয়ে ডাক্তার ভদ্রলোককে ও জিজ্ঞেস করল, 'আপনার কি মনে হচ্ছে ডক্টর বলুন তো? এই হনুমানগুলোর পেট কাটার কারণটা কী? ওদের বডি পার্টস চুরি করার জন্য?'

ডাক্তার বললেন, 'হঠাৎ এ কথা আপনার মনে হল কেন?'

'তার আগে আপনি বলুন, আলট্রাসোনোগ্রাফি করার কথা আপনি বললেন কেন?'

'আপনার পরিচয়টা জানতে পারি কি?'

অর্ক নিজের পরিচয় দিতেই ডাক্তার ভদ্রলোক গম্ভীর হয়ে গেলেন। তার পর বললেন, ' 'দেখুন মশাই, আপনার মতো আমারও সেই সন্দেহ হচ্ছে। আলট্রাসোনোগ্রাফি করলে ধরা পড়ে যাবে, বডির ঠিক কোন পার্টস কেটে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু আপনাকে একটা রিকোয়েস্ট করি, কাগজে যদি কিছু লেখেন, তা হলে প্লিজ, আমার নামটা কোথাও উল্লেখ করবেন না। সরকারি চাকরি করি, বুঝতেই পারছেন।'

অর্ক বলল, 'ঠিক আছে, কথা দিচ্ছি। তবে একটা ইনফর্মেশন দিন। কলকাতার কোথায় অ্যানিম্যালদের আলট্রাসোনোগ্রাফি করা যায়?'

'একজন রেডিয়োলজিস্ট আছেন। দীপিকা সেন। ওকে যদি ধরতে পারেন, নাথিং লাইক দ্যাট। ভদ্রমহিলার কাছে পোর্টেবল মেশিন আছে। তেমন হলে সেই মেশিন উনি এখানেও নিয়ে আসতে পারেন। তা হলে হনুমানটাকে আর নিয়ে যেতে হবে না। সেক্ষেত্রে ওর চান্সেস অব সার্ভাইভাল বেটার ধরে নেওয়া যায়।'

'দীপিকা সেনকে কোথায় পাওয়া যেতে পারে?'

' ওর একটা ছোট হসপিটাল আছে পেট অ্যানিম্যালদের জন্য। বেহালার শিবরামপুর বলে একটা জায়গায়। নিজের উদ্যোগেই করেছেন। যেভাবেই হোক, ভদ্রমহিলাকে এখানে নিয়ে আসুন। ওঁর ফোন নাম্বারটাও লিখে নিতে পারেন। আমার কাছে আছে।'

৬.দীপিকা সেনের ফোন নাম্বারটা দিয়ে ডাক্তার ভদ্রলোক চলে গেলেন। মনে মনে দ্রুত পরবর্তী কাজগুলো ছকে নিল অর্ক। তার পর মোবাইল বের করে নম্বর

টিপতে লাগল সাঁঝেলিকে ধরার জন্য।

১৬

'সাঁঝেলি, তোমার সন্দেহটা ঠিক। রিপোর্ট বলছে, এর একটা কিডনি নেই। সেটা কেটে নেওয়া হয়েছে।' আলট্রাসোনোগ্রাফি মেসিনের দিকে তাকিয়ে কথাগুলো বললেন দীপিকা সেন।

শুনে চমকে উঠল সাঁঝেলি। ঘরে তখন অর্ক শিউচরণ ছাড়াও রয়েছে নুরুল। চৌকির ওপর শোয়ানো হনুমানটা একেবারে নিস্তেজ হয়ে পড়ে আছে। নুরুলের ছেলেরা গুড়গুড়ি পালের জঙ্গল না কোথায় যেন গেছে। আরও পেটকাটা হনুমান ধরে আনার জন্য। যদি রাতের মধ্যে ধরে আনতে পারে, তা হলে আলট্রাসোনোগ্রাফি করিয়ে নেওয়া হবে। সাঁঝেলির অনুরোধে, রাতে নয়াগ্রামে থেকে যেতে রাজি হয়েছেন দীপিকা সেন।

অর্কর ফোন পাওয়ার পর থেকে গত সাত-আট ঘণ্টা ঝড় বয়ে গেছে সাঁঝেলির ওপর দিয়ে। ডিরেক্টরকে বলে বেলা একটার মধ্যে ও বেরিয়ে এসেছিল চিড়িয়াখানা থেকে। তার পর বেহালায় গিয়ে অনেক ঘোরাঘুরি করে দীপিকা সেনকে ও খুঁজে পায়। সাঁঝেলি ভেবেছিল, এত অল্প সময়ের ব্যবধানে দীপিকা সেন মেদিনীপুরে যেতে রাজি হবেন না। কিন্তু পুরো ব্যাপারটা শুনে সঙ্গে সঙ্গে উনি তৈরি হয়ে নেন। একটা টাটা সুমো ভাড়া করে ওরা দু'জন সন্ধে ছ'টার মধ্যে মেদিনীপুরে চলে এসেছে। আসার আগে অতি উৎসাহে আশিসদাকে পুরো ঘটনাটা সাঁঝেলি জানায়। ভেবেছিল, খুব খুশি হবে। কিন্তু তার বদলে আশিসদা কেমন যেন চটে গেল। একবার বললও,'এ সব ঝামেলার মধ্যে তুমি যেও না। পরে ফালতু অনেক কমপ্লিকেশনে পড়ে যাবে।'

একদিকে অর্ক, অন্যদিকে আশিসদা। সাঁঝেলি দোটানায় পড়ে গেছিল। কিন্তু দীপিকা সেন মেদিনীপুর যেতে রাজি হওয়ায়,ও মন থেকে আশিসদাকে ঝেড়ে ফেলে। মনকে এই বলে ও প্রবোধ দেয়, একটা প্রাণীর জীবন রক্ষার জন্য যাচ্ছে। এই

ভাবনাটাকে ওর অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। এখানে আসার পর সাঁঝেলির অবশ্য মনে হচ্ছে, ও কোনও ভুল করেনি। যা ভেবে ও এখানে এসেছিল, ঘটনার গুরুত্বটা তার থেকেও অনেক অনেক বেশি। দীপিকা সেনের কথা শুনে ও অর্কর দিখে তাকাল।

'হনুমানের কিডনি কি মানুষের কাজে লাগে দীপিকাদি?' প্রশ্নটা করল অর্ক।

'লাগে কি না জানি না। তবে আমার আন্দাজ, লাগানো হয়।' দীপিকা সেন বললেন, 'রেসাস মাঙ্কির সব অর্গান মানুষের মতো। কোনও পার্থক্য বোঝা কঠিন। একজন সিনিয়র ইউরোলজিস্টের কাছে শুনেছি, ট্রান্সপ্ল্যান্ট করার সময় কোনও মানুষের দেহে যদি রেসাস মাঙ্কির কিডনি বসিয়ে দেওয়া হয়, তা হলে সেটা ধরা খুব মুশকিল।'

সাঁঝেলি বলল, 'তার মানে? সার্জারি করার সময় ওরা চেক করে নেবেন না, কার কিডনি ট্রান্সপ্ল্যান্ট করছেন?'

'এই জায়গাটাতেই তো যাবতীয় চালাকি। খুব সহজ ভাষায় বলি, কিডনি বসানোর সময় কোনও সার্জেনের পক্ষে গ্যারান্টি দেওয়া সম্ভব নয়, কারও শরীরে নতুন কিডনি ঠিকভাবে ফাংশান করবে কী না। সেটা ডোনারদের দেওয়া... অর্থাৎ রোগীর আত্মীয়ের শরীর থেকে সরাসরি নেওয়া কিডনি হলেও... নিশ্চিত নয়। অনেক সময় নতুন কিডনি ফাংশান করে না। পুরো সার্জারিটা তখন ব্যর্থ হয়ে যায়। এই ফাকটার সুযোগ নেয় নার্সিংহোমের দুষ্ট চক্র।'

অর্ক বলল, 'তা হলে আপনি বলতে চাইছেন, মানুষের কিডনির বদলে হনুমানের কিডনি ট্রান্সপ্ল্যান্ট করে পেশেন্টকে ঠকানো সম্ভব। সে বেচারী তো মারা যাওয়ার আগে জানতেও পারবে না, তার শরীরে কার কিডনি বসানো হয়েছিল।'

' একজাক্টলি তাই। একেকটা কিডনির দাম কম করে এখন এক-দেড় লাখ টাকা। সেটা পেশেন্ট পার্টির প্রয়োজন আর রেঞ্জ বুঝে দেড়-দুলাখ টাকাতেও পৌঁছতে পারে। কেন নার্সিংহোম বা হাসপাতালে অশুভ চক্রটা গড়ে উঠেছে, এ বার বুঝতে পারছেন ? জন্তু , অ্যান্ড অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ মানুষের জীবন নিয়ে ছেলেখেলা চলছে।'

কথাগুলো শুনে সাঁঝেলি গুম হয়ে বসে রইল। রাত প্রায় ন'টা। বাইরে অন্ধকার এমন জমাট, তাকাতেই ওর ভয় লাগছে। জীবনে কখনও এ রকম প্রত্যন্ত গ্রামে ও রাত কাটায়নি। আজও আসতে পারত না। যদি মা আর বাবা বাড়িতে থাকত। ওরা দু'জন ব্যাঙ্কক গেছে দিন দুয়েক আগে। ফিরবে চার পাঁচদিন পর। সাঁঝেলি পরাণকাকুকে বলে এসেছে, রাতে নন্দিনীর বাড়িতে থাকবে। মা-বাবার মধ্যে কেউ ফোন করলে, সেটা বলে দিতে। ফলে মা-বাবার পক্ষে জানা সম্ভব নয়, সত্যি সত্যি রাতটা ও কোথায় কাটিয়েছে। ভয়ের অবশ্য কিছু নেই। কেননা, অর্ক সঙ্গে আছে।

দীপিকা সেনের দিকে তাকিয়ে সাঁঝেলি মনে মনে হিসাব করতে লাগল। একটা হনুমানের কিডনি কেটে নিয়ে, বিক্রি করতে পারলে মিনিমাম লাখ টাকা লাভ। নয়াগ্রামে যদি পাঁচটা কিডনি কেউ কেটে নিয়ে যায়, তা হলেই তো পাঁচ লাখ। খুব বেশি খরচ নেই। একজন ভেট সার্জেনকে সঙ্গে জোটাতে পারলেই হল। জন্তু জানোয়ারদের নিয়েও যে এ রকম দু'নম্বরী ব্যবসা করা যায়, সাঁঝেলি কোনওদিন চিন্তাও করতে পারেনি। ও ঠিক করল, রাতে আশিসদাকে ফোন করে সব জানাবে। এর বিরুদ্ধে মানুষকে সচেতন করে তুলতে হবে। সাধারণ লোক তো কিছুই জানে না।

পরের নিঃস্তব্ধতা ভেঙে অর্ক বলল, 'কারা এই কাজটা করতে

পারে বলে মনে হয় নুরুল?'

নুরুল বলল, ' এখানকার লোক না। পার্টির ছেলেদের খোঁজ নিতে বলেছিলাম। আজ সকালে [illegible] খবর দিল, ওদেরই গ্রামের কে [illegible] যেন দু'তিন দিন আগে একটা কালো রঙের জিপসি গুড়গুড়ি [illegible]লের জঙ্গলের কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছে। সে নাকি রাতে কোনও গ্রাম থেকে যাত্রা দেখে [illegible]রছিল। জিপ থেকে হনুমানগুলোকে ছেড়ে দিতেও নাকি ছেলেটা দেখেছে। সেই ছেলেটাকে আমার [illegible] নিয়ে আসার জন্য [illegible] লোক পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু দুপুরে খবর পেলাম, ওকে নাকি পাওয়া যাচ্ছে [illegible]।'

[illegible]পিকা সেন বললেন,' তা হলে আমার ধারণা ঠিক। এটা কিডনি চক্রের কাজ। ছেলেটার মুখ বন্ধ [illegible] জন্যই ওরা কিডন্যাপ করেছে। আচ্ছা, এই ছেলেটা কি জিপসি গাড়ির নাম্বারটা কাউকে বলে [illegible]?

[illegible]ড়ির [illegible]ম্বারটা যদি পাওয়া যায়, তা হলে চক্রটার হদিশ পাওয়া যেতে পারে। অবশ্য গাড়ির [illegible] [illegible] [illegible] ওরা ইউজ [illegible] করতে পারে। হোপ এগেনস্ট হোপ আর কী।'

নুরুল বলল, 'গাড়ির নাম্বারের কথা আমাদের মাথায় আসেনি। সেটা জানার চেষ্টা করব। তবে একটা কথা আগে বলিনি, এখন বলছি, আজই আমি হুমকি দেওয়া একটা ফোন পেয়েছি। হনুমানটাকে ছেড়ে দাও। খবরের কাগজে যদি কিছু বেরোয়, তা হলে তোমার কপালে দুঃখ আছে। তার মানে ওরা জেনে গেছে, অর্কবাবু এখানে আছেন।'

সাঁঝেলি বলল, 'ফোন নাম্বারটা কোথাকার দেখুন তো?'

'খোঁজ নিয়েছি। সাউথ ক্যালকাটার একটা বুথের। গড়িয়াহাট অঞ্চলের।

'আরে, ওখানে তো আমাদের পরিচিত অনেকেই থাকে। তাদের বলব নাকি?'

অর্ক বলল, 'না। এখন কাউকে কিছু জানাতে হবে না। দীপিকাদি আপনি বলুন, হনুমানটাকে নিয়ে কী করা যায়?'

'বাঁচানো যাবে বলে মনে হচ্ছে না। এখান থেকে ওকে মুভ করানোও রিস্কি। যদি সরকারি কোনও হসপিটালে নিয়ে যান, এবং কেউ অ্যালিগেশন আনে, ওর পেট থেকে আপনারাই কিডনি কেটে নিয়েছেন, তা হলে তিন-চার বছর জেলের ঘানি টানতে হতে পারে। ওয়াইল্ড লাইফ প্রোটেকশন অ্যাক্ট এখন এমন কড়া। বিপদটা ডেকে আনবেন কেন? এর চেয়ে বরং চেষ্টা করুন এটা জানার জন্য, কারা এই কাজটা করেছে? ভবিষ্যতে তারা যাতে আর করতে না পারে।'

সাঁঝেলি বলল' পুলিশের হেল্প নেওয়া যায় না?'

শিউচরণ এতক্ষণ কোনও কথা বলেনি। এ বার উঠে দাঁড়িয়ে ও বলল, 'অনেক রাত হয়ে গেছে।

আমাকে বাড়ি ফিরতে হবে। নুরুল, তুই এদের খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা কার। ম্যাডাম, আমি আপনাদের টাটা সুমোটা নিয়ে যাচ্ছি। কাল সকাল সাতটার মধ্যে ফিরে আসব। তার পর একটা স্টেপ নেওয়া যাবে।'

... রাতে খাওয়া দাওয়ার পর দীপিকা সেনের সঙ্গে গল্প করতে বসল সাঁঝেলি। মাত্র ন'টা বাজে। তাতেই মনে হচ্ছে কত রাত্তির। এই সময় রোজ বাড়িতে টিভি দেখতে দেখতে মুখে ক্রিম ঘষে নেয়।

pathagar.net

টুকি আর টাকিকে আদর করে। অথবা শোনপুরির কাছ থেকে শোনে সারাদিনে বাড়িতে কী হল না হল,
তার গল্প । আজ ক্রিম আনতে পারেনি । নুরুল
যে ঘরে শোয়ার ব্যব্যস্থা করেছে, সেখানে টিভিও নেই। নেই টুকি, টাকিও। তাই সাঁঝেলি বলল, 'আসুন দীপিকাদি, গল্প করে খানিকটা সময় কাটানো যাক। আপনি নিশ্চয় এত তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়েন না।'

দীপিকা বললেন, 'শুতে শুতে আমার অনেক রাত্তির হয়ে যায়। আমার হ্যাজব্যান্ড বাড়ি ফেরেনই রাত দশটা-এগারোটার সময়। উনি ডাক্তারি লাইনে জিনিয়াস। ভাসকিউলার সার্জারিতে ডিগ্রি নিয়ে এসেছেন কার্ডিফ থেকে। কিডনি ট্রান্সপ্লান্টও করেন। খুব ব্যস্ত মানুষ। উনি বাড়ি ফেরার পর একসঙ্গে ডিনার করি। মাঝে মাঝে উনি যখন বিদেশ যান, বা অন্য কোনও রাজ্যে, তখন আমি ফ্রি।'

' আরে, আমার বাবাও তো ইউরোলজিস্ট। ডাঃ সুব্রত মিত্র। কিডনি ট্রান্সপ্ল্যান্ট করেন। একই লাইনের যখন আপনার হাজব্যান্ড নিশ্চয়ই চিনতে পারবেন।'

' ওঁকে তো ভালো মতো চিনি। একটা সময় ওঁরা দু'জন একই নার্সিংহোমে ছিলেন। একই সঙ্গে কিডনি ট্রান্সপ্ল্যান্ট করতেন। পরে আমার হ্যাজব্যান্ড রিসার্চের দিকে চলে এলেন।'

' আপনার ছেলে মেয়ে ক'টি দীপিকাদি?'

'একটাই ছেলে। পড়াশুনো করছে। বাড়িতে শ্বশুর-শাশুড়ি, আমার ভরা সংসার।'

' তার মধ্যেও এনজিও চালাচ্ছেন কী করে?'

'প্রথম কথা হল, ইচ্ছে থাকলেই উপায় হয়। আমার হ্যাজব্যান্ড অবশ্য আমাকে ফুল সাপোর্ট দিয়েছেন । আমার পুরো রোজগার অর্গানাইজেশনের পিছনে ঢেলেছি। তবুও উনি কিছু বলেননি।'

‘ বেহালায় আজ গেলাম বটে, কিন্তু আপনার ইউনিট ভালো করে দেখার টাইম পেলাম না। দুপুরে আপনাদের ওখানে যে কুকুর-বেড়ালগুলো দেখলাম, ওদের কি রাস্তা থেকেই তুলে আনেন?’

‘হ্যাঁ। এই কাজটা আমাদের দিয়েছে কলকাতা কর্পোরেশন। ওরা আমাদের মোট পঞ্চাশটা ওয়ার্ডের দায়িত্ব দিয়েছে। এই ওয়ার্ডগুলো থেকে যদি কোনও কমপ্লেন আসে, তা হলে স্ট্রিট ডগ ধরে আনার জন্য আমাদের দৌড়তে হয়। আমি নিজেও রাস্তায় নেমে কুকুর ধরি। স্টেরিলাইজ করে ফের ছেড়ে দিই। এ ছাড়াও, রাস্তার কোনও কুকুর-বেড়ালের অ্যাক্সিডেন্ট হলে, আমরাই ট্রিটমেন্ট করি।’

‘অর্গানাইজেশনটা পেট অ্যানিম্যালদের জন্য করেননি কেন?’

‘ আগে এন্টালিতে পেট অ্যানিম্যালদের জন্য একটা অর্গানাইজেশন চালাতাম। সরকারি অনুদানও কিছু পেতাম। কিন্তু আমার পিছনে দু’তিনজন লেগে গেল। বিশেষ করে, মানেকা গান্ধীর ঘনিষ্ঠ একজন। ওঁর মিসেস গান্ধি সেন্ট্রাল মিনিস্টার। তাঁর এই লোকটা তখন এখানকার আট-ন’টা এনজিও -র পর ছড়ি ঘোরাতেন। নানা কারণে রোজ রোজ চিঠি পাঠাতেন, আর আমাদের জবাবদিহি করতে হত। একটা সময় তাঁর অত্যাচারে আমি অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলাম। মাঝে মাঝে তিনি অন্য আবদারও করতেন। আমার তখন বয়স কম, দেখতেও খুব একটা খারাপ ছিলাম না। বুঝতেই পারছ।’

সাঁঝেলি বলল, ‘আপনি এখনও যথেষ্ট সুন্দরী। যাই হোক, শেষে কী হল বলুন?’

‘ আমাকে নিয়ে উনি দিল্লিতে যেতে চাইতেন। তাতে নাকি গ্র্যান্ট পেতে সুবিধে হবে। মাঝে মাঝে সন্ধেবেলায় ওর অফিসে চা খেতেও ডাকতেন। বুঝতেই পারছ, কী জন্য ডাকতেন। এই ভাবে গ্র্যান্ট পেতে আমি চাইনি। একটা সময় উনি মারাত্মক চটে গেলেন আমার ওপর। গ্র্যাজুয়ালি আমাকে এমন প্যাঁচে ফেললেন, বাধ্য হয়ে ওই অর্গানাইজেশনটা আমাকে তুলে দিতে হল।’

‘কী রকম প্যাঁচে ফেললেন?’

'আমার হ্যান্ডলারদের ভড়কি দিতে শুরু করলেন। দু'তিনশো টাকা বেশি মাইনে অফার করে উনি
ভাগিয়ে নিতে লাগলেন। একদিন এমন হল, পাঁচজন একসঙ্গে আমাকে ছেড়ে চলে গেল। সেদিনই কলকাতার নানা জায়গা থেকে কমপ্লেন আসতে শুরু করল, স্ট্রিট ডগ তোলার জন্য। লোক নেই, নাচারালি আমরা সব জায়গায় অ্যাটেন্ড করতে পারলাম না। আমরা ডাকলেও লোক পাঠাই না, কয়েকজনের কাছ থেকে এই রকম অভিযোগ লিখিয়ে নিয়ে উনি মিনিস্ট্রিতে পাঠিয়ে দিলেন। তার পর থেকে আমাদের গ্র্যান্ট বন্ধ হয়ে গেল। আমি আর অর্গানাইজেশন চালাতে পারলাম না।'

'এ রকম হয় নাকি? তার পরই কি আপনি বেহালায় ইউনিটটা করেন?'

'না, দু'তিন বছর চুপচাপ বসেছিলাম। বেহালায় আমার বাবার একটা জমি ফাঁকা পড়েছিল। সেই জমিতে নতুন ইউনিটটা করেছি। এখন আমার প্রায় কুড়িজন হ্যান্ডলার আছে। ওরা ওই বাড়িতেই থাকে, সারাটা দিন কুকুর-বেড়ালদের দেখা শুনো করে।'

'কিন্তু কতদিন এভাবে চালাতে পারবেন দীপিকাদি?'

'যতদিন না যোগ্য কারও হাতে তুলে দিতে পারি। আমাদের রোজগার বলতে কিছু নেই। আউটডোরে রোজ দু'চারটে করে পেট অ্যানিমাল চিকিৎসার জন্য আসে। খুব সামান্যই ফি নিই। কিছু মেম্বার আছেন, যারা প্রতি মাসে একশো টাকা করে চাঁদা দেন। এইভাবে চালিয়ে যাচ্ছি। যাক গে, এতক্ষণ আমার কথা বলে যাচ্ছি। এবার তোমার সম্পর্কে কিছু শুনি। তুমি তো শুনলাম, চিড়িয়াখানায় চাকরি করো। আচ্ছা, একটা পার্সোনাল কথা জিজ্ঞেস

করি, অর্কবাবু কি তোমার বয়ফ্রেণ্ড?'

শুনে খিলখিল করে হেসে উঠল সাঁঝেলি। তার পর বলল, 'কী করে বুঝলেন?'

' চোখ থাকলে ঠিক বোঝা যায়। তোমার থেকে বয়সে আমি বছর পনেরো বড়। আমিও তো তোমার বয়সটা পেরিয়ে এসেছি। বুঝতে পারি। অর্কবাবু কিন্তু ভীষণ হ্যান্ডসাম আর ইন্টেলিজেন্ট। সত্যি বলছি, তোমার সঙ্গে ভালো মানাবে। পারফেক্ট ম্যাচ।'

রেডিয়োলজিস্টের খোলস ছেড়ে বন্ধুর মতো কথা বলছেন দীপিকা সেন। সাঁঝেলি বলল, 'না না। আপনি যা ভাবছেন, তা ঠিক নয়। আমাদের আলাপ খুব অল্পদিনের।'

'তাতে কী? আমার হ্যাজব্যান্ড তো তিনদিনের মাথায় আমাকে প্রপোজ করেছিলেন। প্রেমে পড়ার ব্যাপারটা কি সময়ের ওপর নির্ভর করে? তোমাকে দেখে আমার মনে হচ্ছে, অর্কবাবুর প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছ। তোমাদের বাড়ি থেকে কোনও প্রবলেম থাকলে অবশ্য আলাদা কথা।'

হাসতে হাসতেই সাঁঝেলি বলল, 'দীপিকাদি, আপনি এত ফাস্ট ফরোয়ার্ড করবেন না। সত্যি বলছি, এতদিন আমার ধারণা ছিল, যে জগৎটাকে আমি ভালোবাসি, সেখানে আন্তরিকভাবে থাকতে গেলে বিবাহিত জীবন কখনই সম্ভব নয়। কিন্তু আপনাকে দেখে নতুন করে ইন্সপিরেশন পাচ্ছি।'

'তা হলে এখানেই অর্কবাবুর সঙ্গে মন দেওয়া নেওয়াটা সেরে ফেল না। বলো তো, আমি ঘটকির কাজটা করে দিই।'

'প্লিজ এই কাজটা করতে যাবেন না। দরকার হলে পরে আপনার সাহায্য নেব।'

'কথাটা মনে থাকে যেন। এসো না, আমার এনজিও-তে কাজ করবে? তোমার মতো একজনকেই আমার দরকার।'

'না দীপিকাদি। গত এক বছর ধরে আমি একটা এনজিও-র সঙ্গে যুক্ত আছি। গোবিন্দপুরে আমাদের হসপিটাল আছে। যিনি চালান, তিনি আপনার মতোই ডেডিকেটেড। চিনবেন হয়তো, আশিস ভট্টাচার্য।'

নামটা শুনে দীপিকা সেনের মুখটা শক্ত হয়ে গেল। সাঁঝেলি স্পষ্ট দেখতে পেল, মুখের রং বদলাচ্ছে।

ক্রোধ আর ঘৃণার সঞ্চার হচ্ছে ওই মুখে। পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিলেন উনি। বললেন, 'আর কথা নয়। চলো, ঘুম পেয়ে গেছে।'

১৭

রথীন সরের অ্যান্টি চেম্বারে বসে আছেন প্রোজ্জ্বল। একের পর এক লোক আসছে। নানা ধরনের কথা হচ্ছে। নিজের কথা বলার সময়ই তিনি পাচ্ছেন না। দেওয়ালের একদিকে কার্ল মার্কস, অন্য দিকে ভ্লাদিমির লেনিন। তাদের সাক্ষী রেখে যে সব কথা আলোচনা হচ্ছে, তা আর যাই হোক, সমাজবাদ নয়। প্রোজ্জ্বল বসে বসে সে সব কথা শুনছেন। আর মাঝে মাঝে চমকে উঠছেন। মানুষের জীবন কত ঠুনকো হয়ে গেছে এখন। কে বেঁচে থাকবে, কে নয়, সেটা ঠিক হয়ে যাচ্ছে এই অ্যান্টি চেম্বারে।

রথীন সরের পার্টি অফিস সোনারপুরে। কিন্তু ভগবানপুরে ঝামেলা শুরু হওয়ার পর থেকে উনি সেখানে বসছেন না। গোপন জায়গা থেকে অপারেট করছেন। সেই জায়গাটার হদিশ পেয়েই প্রোজ্জ্বল আজ দেখা করতে এসেছেন। ধাপা আর চিংড়িহাটার মাঝামাঝি, এই নতুন পার্টি অফিস বাইপাসের পূর্বদিকে, এক দেড় কিলোমিটার ভেতরে একেবারে গ্রাম্য পরিবেশে। বাইপাসের ধারে সার সার বিরাট হোর্ডিং, ফলে পার্টি অফিসটা আড়ালে চলে গেছে। কাঁচা

সড়ক দিয়ে নামার সময় প্রোজ্জ্বল বুঝতে পারছিলেন, জায়গাটা বেছে নেওয়ার অন্য কারণ আছে। ভগবানপুর বেশি দূরে নয় এবং দ্রুত আক্রমণ চালিয়ে নিরাপদ স্থানে ফিরে আসা সম্ভব । এছাড়াও, চারপাশটা ফাঁকা বলে, হঠাৎ আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম।

অ্যান্টি চেম্বারে বসে কথা শুনতে শুনতে প্রোজ্জ্বল বুঝতে পারছেন, ভগবানপুরে জমি দখলের লড়াইটা পুরোপুরি আর রথীন সরের হাতে নেই। এই পার্টি অফিসে না এলে, ওখানকার প্রকৃত অবস্থাটা তিনি বুঝতেও পারতেন না। আলোচনা শুনে মনে মনে তিনি ছটফট করছেন। ভগবানপুরে জমি দখলের ওপর তাঁর ভাগ্য অনেকটা নির্ভর করছে যে! জমি দখল না হলে, ওখানে চিড়িয়াখানা নিয়ে যাওয়া যাবে না। আর তা না হলে, আলিপুরের চিড়িয়াখানাও ফাঁকা হবে না। আলিপুরে তাঁর স্বপ্নের 'জু-সিটি' তা হলে প্রোজ্জ্বল গড়বেন কী করে? পার্টির ছেলেদের কথা শুনতে শুনতে তিনিও মাঝে মাঝে উত্তেজিত হয়ে পড়ছেন। রাফতানরা কি ভেবেছে? বাপের জায়গা? ছাড়ব না বললেই হল?

মুম্বই থেকে আজ ভোরেই প্রোজ্জ্বল ফিরে এসেছেন। কাল রাতে রাজা ফোন করে জানিয়েছিল, রথীন সরের সাংস্কৃতিক উৎসব বাতিল হয়ে গেছে। ভগবানপুরে গোলাগুলির মধ্যে ওই অনুষ্ঠান হোক, এটা নাকি চিফ মিনিস্টার চান না। ভোটারদের কাছে তা হলে খারাপ মেসেজ যাবে। সিঙ্গুর, নন্দীগ্রাম তার পর ভগবানপুর। পর পর তিনটে জায়গায় জমি নিয়ে অশান্তির জন্য নাকি সরকারের ইমেজ অনেকটা নষ্ট হয়ে গেছে। ধুত্তোর ইমেজ।
প্রোজ্জ্বল যে এ দিকে, রথীন সরকে পাঁচ লাখ টাকা ফেস্টিভ্যালের জন্য দিয়েছেন, এবং আরও

পাঁচ লাখ টাকা অ্যাডভ্যান্স দিয়ে এসেছেন হেমা মালিনীকে, তার কী হবে? সে টাকা তো ভোগে চলে যাবে।

৮৫

হাত ঘড়ির দিকে তাকালেন প্রোজ্জ্বল। বেলা প্রায় এগারোটা। ঘণ্টাখানেক বসে আছেন পার্টি অফিসে। কথা বলার ফুরসতই পেলেন না তিনি রথীন সরের সঙ্গে। নিজের অফিসে কত কাজ পড়ে আছে। রিমিতা ফোন করেছিল। সাড়ে দশটায় অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল ভুবনেশ্বরের এক পার্টির সঙ্গে। সেটা ক্যানসেল করে দিতে হল। পরের অ্যাপয়েন্টমেন্ট সাড়ে বারোটায়, সজ্জন আগরওয়ালের সঙ্গে। বালিগঞ্জ প্লেসে পুরনো একটা বাড়ি কিনেছে। সেটা ভেঙে দশতলা অ্যাপার্টমেন্ট করবে। তার ডিজাইন নিয়ে আলোচনা। কিন্তু পার্টি অফিসে যা চলছে, তাতে সেই অ্যাপয়েন্টমেন্টটাও প্রোজ্জ্বল রাখতে পারবেন কী না, বুঝতে পারছেন না। রথীন সর একবার ওঁকে দেখে ফেলেছেন। এখন দেখা না করে চলে যাওয়াও যায় না। চলে গেলে মনে মনে উনি চটে যেতে পারেন।

পার্টি অফিসের গুমোট পরিবেশে দরদর করে ঘামছেন প্রোজ্জ্বল। সারাদিন এ সি ঘরে কাটান। কষ্ট করার অভ্যেসটা অনেক দিন আগে চলে গেছে। তার ওপর শরীরটাও ভালো নেই। ভোরবেলায় প্লেন ধরবেন বলে রাতে ভালো করে ঘুমোতে পারেননি। মুম্বই থেকে প্লেনে ওঠার পর সেই যে মাথাব্যথা শুরু হয়েছে, এখনও কমেনি। প্রেসারটা বোধহয় বেড়ে গেছে আরও, পার্টির ছেলেদের কথাবার্তা শুনে। ওই হিংস্র পরিবেশে বসে থাকতে থাকতে হঠাৎই নিজেকে

হারিয়ে ফেললেন প্রোজ্জ্বল মিত্র। চোখের সামনে হঠাৎ একটা বিদ্যুৎ ঝলক। তার পর অদ্ভুত একটা অনুভূতি। তিনি দেখলেন পার্টি অফিসের সর্বত্র বাঘ, সিংহ, নেকড়ে, হায়েনারা ঘুরে বেড়াচ্ছে। টেবলের ওপর দু'হাত ছড়িয়ে সোজা হয়ে বসে কার সঙ্গে যেন কথা বলছিলেন রথীন সর। একটু আগে স্পষ্ট সেটাই দেখেছেন প্রোজ্জ্বল। হঠাৎ মনে হল, ওই হাত দু'টো বাঘের থাবা হয়ে গেছে। হ্যাঁ, থাবার নখগুলো পর্যন্ত দেখতে পেলেন

প্রোজ্জ্বল। চোখের ভুল কী না, তা বোঝার জন্য চশমা খুলে ফেললেন তিনি। না, মোটেও ভুল দেখেননি। পার্টি অফিসে থাকাটা বোধহয় নিরাপদ নয়। বুকের ভেতরে অদ্ভুত একটা শিরশিরানি নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন প্রোজ্জ্বল। আর তখনই চোখে পড়ে গেলেন রথীন সরের।

' আরে বসুন, বসুন ভাই। চলে যাচ্ছেন কেন?' বললেন রথীন সর। ' দেখছেনই তো অবস্থাটা। খারাপই লাগছে, আপনাকে এতক্ষণ বসিয়ে রেখেছি।'

না, পরিচিত সেই রথীন সরই তো কথা বলছেন। ধাতস্থ হতে একটু সময় নিলন প্রোজ্জ্বল। তার পর বললেন, 'স্যার আমি না হয় অন্য আরেকদিন আসব।'

'না না। আপনার সঙ্গে অনেক কথা আছে।' বলে রথীন সর ইঙ্গিত করে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে বললেন বাকিদের; 'নিজের কানেই তো এতক্ষণ শুনলেন সব। পরিস্থিতি কী জটিল হয়ে গেছে। তবে চিন্তা করবেন না। মার্চের মধ্যে ভগবানপুর এরিয়াটা আমি ফাঁকা করে দেব। শুয়ারের বাচ্চাগুলো এত বেড়ে যাবে, ভাবতেও পারিনি।'

প্রোজ্জ্বল বললেন, ' আপনার ক্যালকুলেশনে এত গড়বড় তো হয় না স্যার।'

'এ বার হয়ে গেল। কী আর বলব। পার্টির মধ্যেই কিছু রিঅ্যাকশনারি ফোর্স ঢুকে গেছে। মিসগাইড করল আমাকে। না হলে প্রথমে আমি যে স্ট্যান্স নিয়েছিলাম, সেটাই ঠিক ছিল। আমি বলেছিলাম, কিনে নাও। তার পর ওদের ভাগাও। তখন ছেলেরা শুনল না আমার কথা।'

'কতগুলো ফ্যামিলি এফেক্টেড হচ্ছে স্যার?'

' কত হবে? দু'শো-সোয়া দু'শো ফ্যামিলির বেশি হবে না। আমি অ্যাভারেজ দু'লাখ টাকা দিয়ে সেটল করে নিতে বলেছিলাম। চার-সাড়ে চার কোটি টাকা না হয় খরচ হত। কোনও রকম ব্লাডশেড হত না। মিডিয়াও টের পেত না। স্মুথলি সব ব্যাপারটা হয়ে যেত।'

'স্যার, কারা এদের মদত দিচ্ছে জানেন?'

'জানি। তবে মুশকিলটা কী জানেন, তাদের নামটা আমি করতে পারব না। ' অনেক খেলা চলছে ভাই। মনে করুন, আমাদেরই পার্টির ভেতরে কোনও ইন্টারেস্টেড লোক আছে। সে চায়, তার কেউ ওই জমিটা পেয়ে যান। আমার তো কম রাইভাল নেই। এই বয়সে এসে এখন সেটা টের পাচ্ছি। রাতারাতি সবাই নেতা হতে চাইছে, বুঝলেন ভাই। পার্টিতে এটাই প্রবলেম। আমার কাছে ডেফিনিট প্রমাণ আছে। তবুও আমি ডাইভালজ করতে পারব না। পার্টির ডিসিপ্লিন মেনে চলতেই হবে।'

'স্যার, আমি কিন্তু প্রোজেক্টটা নিয়ে অনেকটা এগিয়ে গেছি। অলরেডি কিছু ইনভেস্ট করে ফেলেছি। শুনলে আপনি খুশি হবেন, ডিজাইনার নিয়ে আসছি ইতালি থেকে। আপনি গ্রিন সিগন্যাল দিলেই তাঁকে নিয়ে এসে সাইট দেখাব। দেখবেন, প্রোজেক্টটা না আবার আমার হাত থেকে ফস্কে যায়।'

'ঘাবড়াচ্ছেন কেন প্রোজ্জ্বলবাবু? পার্টির পাওয়ারে যতদিন আছি, জানবেন, এই প্রোজেক্ট মিত্র কনস্ট্রাকশন ছাড়া আর কোনও কোম্পানি পাবে না। যে যতই চেষ্টা করুক না কেন। আমার সঙ্গে চিফ মিনিস্টারের কথা হয়ে গেছে। চিড়িয়াখানার পুরো জমিটা যদি নাও পান, একটা বড় অংশ আপনার জন্য থাকবেই। গ্যারান্টি দিচ্ছি।'

'আমি কিন্তু আপনার ভরসাতেই আছি স্যার।'

' ও হ্যাঁ, আপনাকে যে কাজটা করতে বলেছিলাম, সেটা চালিয়ে

যাচ্ছেন তো?'

'কোন কাজটা সার?'

'আরে, অ্যানিম্যাল লাভারদের হেল্প করার ব্যাপারটা। সেদিন কাগজে দেখলাম লিখেছে, কারা যেন চিড়িয়াখানার ভেতরেই একটা হরিণের ছাল চামড়া ছাড়িয়ে নিয়ে গেছে। সত্যি কী না, ম্যানেজমেন্ট কমিটির মিটিংয়ে আমি তা জানতে চাইব। এত বড় একটা ঘটনা ঘটে গেল, এই তো সুযোগ। ফের বলছি, চিড়িয়াখানায় রোজ রোজ ঝামেলা পাকানোর ব্যবস্থা করুন। যাতে লোকের মাথায় ঢুকে যায়, সিকিউরিটির কারণেই জু ওখানে থাকা উচিত না।'

'আসলে অ্যাদ্দিন মুম্বই ছিলাম। এ সব ঘটেছে, জানতামই না।'

'একটা কথা জানিয়ে রাখি, আপনার বোন যে অর্গানাইজেশনটার সঙ্গে যুক্ত, সেটা চালায় আশিস ভট্টাচার্য বলে একজন—দু নম্বরি লোক। সেটা অবশ্য আপনার বোন জানে না। ওকে জানানোর দরকারও নেই। দু'নম্বরি লোক দিয়েই দু'নম্বরি কাজ করানোটা সহজ হয় ভাই। ওকে টোপ দিয়ে টানুন।'

'বোনের সঙ্গে আজই আমি কথা বলব স্যার। কিন্তু অর্গানাইজেশনটা দু'নম্বরি... বোন কোনও প্রবলেমে পড়বে না তো?'

'মনে হয় না। আমার ছেলেরা ওয়াচ রাখছে আশিস ভট্টাচার্যের ওপর। গোবিন্দপুরে ওদের হসপিটালে আমার পার্টির তিন-চারটে ছেলেকে গোপনে ঢুকিয়ে দিয়েছি। ওরা হ্যান্ডলারের কাজ করে। হ্যান্ডলার মানে জানেন তো? মানে যারা অ্যানিম্যালদের দেখাশুনো করে।'

'অ্যানিম্যালদের নিয়ে কী ধরনের দু'নম্বরি হয় স্যার? জাস্ট ফর কিউরিওসিটি, জানতে চাইছি।'

'সে সব ভাবতেও পারবেন না। আমি জানতাম না। হ্যান্ডলারদের মুখ থেকে শুনে তাজ্জব হয়ে গেছি।'

জগতে কিছুই ফেলা যায় না, বুঝলেন ভাই। আশিস ভটচাযদের একটা ডগ ক্যাচিং স্কোয়াড আছে। রাস্তার কুকুর ধরার জন্য। কর্পোরেশনের রেকগনাইজড। ওরা তো পাড়া থেকে কুকুর ধরে নিয়ে গেল। তার পর কুকুরদের কী হল, তা নিয়ে কারও

মাথাব্যথা নেই। সেই কুকুর নিয়ে আশিস ভটাচার্যরা কতভাবে কামায় জানেন?'

প্রোফেসর অবাক হয়ে বললেন, 'কামায়? কী ভাবে?'

'পার্টির ছেলেদের মুখে শুনলাম, সেই কুকুরের একটা অংশ ওরা ট্রাকে করে নাগাল্যান্ডে পাঠায়। ওখানে মানুষ কুকুরের মাংস খেতে পছন্দ করে। ভালো দামে বিক্রি হয়। বেশ কয়েকটা কুকুর ভর্তি ট্রাব পুলিশ ধরেওছে। এ ছাড়া শুনবেন? মরা কুকুরের হাড়ও ফেলা যায় না। ওরা কেমিক্যাল কোম্পানিতে পাঠায়। কুকুরের চামড়া কাজে লাগে। দেখবেন, অনেক কুকুরের চামড়ার রঙ হরিণের মতো। আশিস ভটচাযরা করে কী, কুকুরের চামড়া ট্যান করে, তার গায়ে সাদা ছিটছিটে রঙ করে দেয়। আর সে সব হরিণের চামড়া হিসাবে বিকোয়। আপনি তফাতটা বুঝতেও পারবেন না। যাক গে, এ সব কথা আপনার বোনকে বলার দরকার নেই। ওর মাধ্যমে আশিস ভটচাযের সঙ্গে ঘনিষ্টতটা আপনি শুধু বাড়িয়ে নিন।'

'ঠিক আছে স্যার।'

'আরেকটা কথা, অর্ক সান্যাল বলে একজন রিপোর্টার আছে। একটু ডেয়ার ডেভিল টাইপের। যে ভাবেই হোক, ছেলেটাকে কনফিডেন্সে আনুন। ওকে দিয়ে চিড়িয়াখানা সম্পর্কে নানা ধরনের কালি ছেটান। কী ভাবে সেটা করবেন, আপনিই জানেন। যাক ,আপনার আর কিছু বলা র আছে? আমাকে এ বার উঠতে হবে। বেলা দেড়টার সময় চিফ মিনিস্টারের চেম্বারে মিটিং আছে।' প্রশ্নটা করেই চেয়ার

ছেড়ে উঠে পড়লেন রথীন সর।

‘ ফেস্টিভ্যালটা বাতিল করলেন কেন স্যার?’

‘বাতিল তো করিনি। ডেটটা খালি পিছিয়ে দিয়েছি। জুন জুলাইয়ে করব। হেমা মালিনীকে এটা জানিয়ে দিন। একটা প্রবলেম অবশ্য আছে। ওই সময়টায় বৃষ্টি হওয়ার চান্স থাকে। তবে প্যান্ডেলটা সেভাবে করে নিলেই হবে।’

রথীন সরের সঙ্গেই ঘরের বাইরে বেরিয়ে এলেন প্রোজ্জ্বল। প্রায় বারোটা বাজে। মিনিট দশেকের মধ্যেই অফিসে পৌছতে হবে। সজ্জন আগরওয়ালের সঙ্গে মিটিংটা কোনওভাবেই মিস করা যাবে না। মিত্র কনস্ট্রাকশনের অফিস অবশ্য খুব কাছেই। যেতে মিনিট দশেকও লাগবে না। তবু গাড়িতে উঠে মনে একটু অস্বস্তিতে রইলেন প্রোজ্জ্বল। রথীন সর কেন বললেন, ‘পার্টির পাওয়ারে আমি যদ্দিন আছি...’ ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার কি কোনও সম্ভাবনা আছে রথীন সরের ? তা কি করে হয়? ওঁদের পার্টি তো অন্যদের মতো নয়। একটা নিয়মমাফিক চলে।

দুশ্চিন্তাটা মন থেকে তাড়ানোর চেষ্টা করলেন প্রোজ্জ্বল, কিন্তু পারলেন না। সত্যিই যদি রথীন সর যদি কোনও কারণে ক্ষমতায় না থাকেন, তা হলে? মিত্র কনস্ট্রাকশনের বেশ কয়েকটা প্রোজেক্ট আটকে যাবে। বিশেষ করে রাজারহাট আর অজয়নগরে।
প্রচুর টাকা ইনভেস্ট করা আছে ওই সব প্রোজেক্টে। দু’তিনদিন আগে, মুম্বাইয়ে সুমতির বলা একটা কথা হঠাৎই মনে পড়ে গেল প্রোজ্জ্বলের। ‘আমাদের এখানে সব পার্টির সঙ্গেই বিজনেসম্যানরা সমান হৃদ্যতা রাখে। কখন কাকে দরকার হয়, বলা যায় না।’ সাফল্যের এই ফর্মূলা প্রোজ্জ্বল যে জানেন না, তা নয়। তবুও রথীন সরের প্রতি কৃতজ্ঞতাবোধ থেকেই তিনি অন্য কোনও পার্টির কোনও প্রভাবশালী নেতার সঙ্গে তেমন সম্পর্ক গড়ে তোলার চেষ্টা করেননি কোনওদিন। অন্য কারও সঙ্গে বেশি মাখামাখি করলে, সেটা নির্ঘাত রথীন

সরের কানে যেত। কে বলতে পারে, তার পর এ কুল ও কুল-দুকুলই যেত না? কিন্তু এই মুহূর্তে পরিস্থিতিটা যেন আগের মতো নেই। মুম্বই থেকে ফিরে এসে সেটা রন্ধ্রে রন্ধ্রে টের পাচ্ছেন প্রোজ্জ্বল।

নিজের অফিসের সামনে গাড়ি থেকে নামার সময় মনটাকে ঠিক করে নিলেন প্রোজ্জ্বল। মনে মনে বললেন, সরপুরিয়ারা যদি সবাইকে নিয়ে চলতে পারেন, তা হলে 'আমি কেন নয়'? আর তখনই টের পেলেন, মাথার যন্ত্রণাটা ভ্যানিশ হয়ে গেছে। ফুরফুরে মেজাজেই তিনি অফিসের ভেতর ঢুকলেন।

১৮

'কুমিরের বাচ্চাগুলোকে না কি পাওয়া যাচ্ছে না। কী ব্যাপার শিউচরণ? তোমার লোকেরা তো আমাকে পাগল করে দেবে।'

ডিরেক্টর সাহেবের কথাগুলো শুনে একটু অবাকই হল শিউচরণ। চিড়িয়াখানায় হচ্ছেটা কী? এই কয়েক দিন আগে গয়ালের শিংয়ের গুঁতোয় মারা গেল রামভজন। তার পর রাতের অন্ধকারে হরিণের [illegible] চামড়া ছাড়িয়ে গেল একজন। আজ আবার প্রবলেম, কুমির ছানাগুলোকে পাওয়া যাচ্ছে না। কেউ [illegible]তাজ করছে নাকি? দেশের বাড়ি থেকে মায়ের কাজ-কাম সেরে শিউচরণ গতকালই কলকাতায় [illegible]ছে। মাঝে একদিনই ডিরেক্টর সাহেবকে ফোন করে, ছুটিটা কয়েক দিন বাড়িয়ে নিয়েছিল। মায়ের মৃত্যু, হনুমানের কিডনি রহস্য—সব মিলিয়ে এত ব্যস্ত ছিল যে, বাগানের কোনও খবর রাখতে পারেনি। এখানে যে এত গণ্ডগোল পাকিয়ে আছে, জানতই না।

সাহেবের ফর্সা মুখটা রাগে লাল হয়ে আছে। উনি খুব চেঁচামেচি করছেন শুনে, হাসপাতাল থেকে সাত সকালেই শিউচরণ দৌড়ে এসেছে বাগানে। পরিস্থিতিটা হালকা করার জন্যই ও বলল, 'কবে থেকে পাওয়া যাচ্ছে না স্যার?'

' সে কী আমি জানি? মর্নিং ওয়াক করার সময়, আজ সকালে হঠাৎ খেয়াল হল, কুমিরের বাচ্চাগুলো কত বড় হল, যাই দেখে আসি। গিয়ে দেখি, একটা বাচ্চাও নেউ। এনক্লোজারে কোনও লোকই নেই। অল বাঞ্চ অব ইডিয়টস।'

স্যারের রাগ কমানোর জন্য শিউচরণ বলল, 'আমি দেখছি স্যার। বাচ্চাগুলো কোথায় আর যাবে?
তারা তো এদিক ওদিক কোথাও আছে। আপনি চিন্তা করবেন না।'

' একটা ঘন্টা সময় দিচ্ছি। তার মধ্যে খুঁজে পাওয়া চাই। না পেলে ওই এনক্লোজারের কিপারকে আমি সাসপেন্ড করব।'

দাঁড়িয়াল, কুমির এনক্লোজারের দায়িত্বে রয়েছে বান্টি। ওর ইউনিয়নের মেম্বার। স্যারের ঘরে ঢোকার মুখে শিউচরণ দেখে এসেছে, বাইরে মুখ কালো করে বান্টি দাঁড়িয়ে আছে। তার মানে, ভালো ঝাড় খেয়েছে। খাওয়াই উচিত। এই প্রজন্মের ছেলেগুলো একদম সিরিয়াস নয়। চাকরি করতে হয় বলে। ভালোবাসাটাই নেই। যে জন্তুগুলো তোর দেখাশুনো করার কথা, তাদের লক্ষ রাখবি না। স্যারের কী দোষ? এই খবরটা কাগজের লোকেদের কাছে গেলে, রিপোর্টররা কি স্যারকে ছেড়ে দেবে? এমনিতেই ওরা স্যারের যথেষ্ট বদনাম করে দিয়েছে, লাগাতার বাজে বাজে খবর লিখে অথবা দেখিয়ে

[illegible] স্যারের ঘরের সামনে শিউচরণ দাঁড়িয়ে রইল। কুমির

ছানাগুলোর ওপর স্যারের কেন এত মায়া, ও তা জানে। চিড়িয়াখানার ইতিহাসে, এতদিন নাকি কুমিরের বাচ্চা জন্ম দেওয়ার চেষ্টা কোনও ডিরেক্টর করেননি। বাঘের বাচ্চা জন্মেছে, সিংহেরও। এমন কী, বাঘ-সিংহের মিলনে টাইগনও । এই ডিরেক্টর স্যারই প্রথম ক্যাপটিভ ব্রিডিংয়ের উদ্যোগ নেন। মানে, বন্দীদশায় কুমিরের বাচ্চা করার। তখন স্যারের কী উৎসাহ। রেপ্টাইল হাউসের ভেতর কয়েকটা কুমির আছে। তা সত্ত্বেও , স্যার বেছে নিয়েছিলেন বাগানের একেবারে দক্ষিণ দিকে, মিষ্টি জলের কুমিরদের। পুরুষ আর মাদী কুমিরের মিলনের ব্যবস্থা করেন । মাদী কুমিরের যাতে ডিম পাড়তে অসুবিধে না হয়, তার জন্য বালির ,স্তূপ করে দিলেন। কুমির সাধারণত একসঙ্গে অনেকগুলো করে ডিম পাড়ে। দশ থেকে আশি-পঁচাশিটা। সবগুলো অবশ্য ফোটে না। শিউচরণের মনে আছে, কুমিরের এনক্লোজারে যেদিন একসঙ্গে অনেকগুলো ডিম পাওয়া গেছিল, সেদিন খুশিতে স্যারের মুখ চকচক করছিল। রোজ সকাল সন্ধে খোঁজ নিতেন । তার পর মোটে ছ'টা ডিম ফুটে বাচ্চা বেরোল। সেই বাচ্চাগুলো আস্তে আস্তে বড় হচ্ছিল। তার মধ্যে এই বিপত্তি।

স্যারের ঘরের বাইরে এসে শিউচরণ দেখল বান্টির সঙ্গে আরও তিন চারজন জুটে গেছে। তার মানে স্যারের বিরুদ্ধে গজল্লা করছে। দেখেই মনটা শক্ত করে ফেলল। বান্টিকে ও কোনও রকম প্রশ্রয় দেবে না। কাজের গাফিলতি সহ্য করা যায় না। সিঁড়ি দিয়ে নেমে শিউচরণ বাঁ দিকের রাস্তা দিয়ে হাঁটতে থাকল। জেব্রা ঘরের পাশ দিয়ে খানিকটা এগোনোর পর ও শুনতে পেল, বান্টি পিছন থেকে ডাকছে, 'শিউদা, ও শিউদা শোনো। একটা কথা বলার ছিল।'

দাঁড়িয়ে পড়ে শিউচরণ দেখল বান্টি একা নয়, ওর সঙ্গে আরও

তিন-চারজন রয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে ও
খিঁচিয়ে উঠল, 'তোদের হারামিপনার জন্য কদ্দিন আমাকে গাল শুনতে হবে বল তো?'

বান্টি বলল, 'রাগ করছ কেন, বস। একটা গলতি হয়ে গেছে। মাফি চাইছি। তুমি এ বারটা বস, না হয় ম্যানেজ করে দাও।'

'কুমিরের বাচ্চাগুলো গেল কোথায় বল তো?'

'তুমি তখন ছিলে না বস। দু'দিন খুব বৃষ্টি হল। খালের জল ডাঙ্গায় উঠে পড়েছিল। মনে হয়, বাচ্চাগুলো জলের সঙ্গে বেরিয়ে গেছে।'

'তখন চোখে পড়েনি?'

'কী করে পড়বে? গিরগিটির মতো সাইজ সব। পুট করে কোথায় লুকিয়ে পড়ে। অত বড় এনক্লোজারে রোজ রোজ খুঁজে দেখা সম্ভব? মাইরি, তুমি বলো?'

সাসপেনশনের ভয়ে বান্টি বেশ গুটিয়ে গেছে। মনে মনে খুশি হল শিউচরণ। একটু ভয় পাওয়া দরকার। তবে যদি সিরিয়াস হয়। ও যা বলছে, সেটা হওয়া সম্ভব। বাগানের দক্ষিণ দিক থেকে খাল নানা এনক্লোজারের পাশ দিয়ে গিয়ে মিশেছে একেবারে বড় ঝিলটাতে। দীর্ঘ দিন সংস্কার করা হয় না বলে, খাল সবুজ পানায় ভর্তি। কুমির ছানাগুলো যদি ওই খালের ভেতর ঢুকে থাকে, তা হলে খুঁজে পাওয়া মুশকিল। জাল ফেলে দেখতে হবে। কিন্তু শীতের এই সময়টায় কুমিরের বাচ্চা নিশ্চয়ই জলের ভেতর থাকবে না। ডাঙায় উঠে রোদ পোহাবেই।

শিউচরণের অভিজ্ঞতা বলল, একটু খুঁজে দেখলে বাচ্চাগুলো পাওয়া যাবে। কুমিরের এনক্লোজারের পর টানা কয়েকটা হরিণের এনক্লোজার। সম্ভবত, ওখানেই কোথাও বাচ্চাগুলো শেল্টার নিয়েছে। নরম গলায় বান্টিকেও বলল, 'হরিণদের এনক্লোজারগুলো

তন্নতন্ন করে দ্যাখ। পেয়ে যাবি।'

কথাগুলো বলে শিউচরণ রেলিংয়ে ভর দিয়ে দাঁড়াল। ভগবানের কাছে মনে মনে ও প্রার্থনা করল,

'।চ্চাগুলোকে যেন পাওয়া যায়। এই ডিরেক্টর সাহেব এমন কড়া, যা বলেছেন, তা করবেনই। কেউ ।।সপেন্ড হলে ফের কর্মী অসন্তোষ শুরু হবে। আগে যখন লাহিড়ি সাহেব ডিরেক্টর ছিলেন, সেই সময় ।নিয়নের ঝামেলায় চিড়িয়াখানার খুব বদনাম হয়ে গেছিল। লাল ঝাণ্ডা নিয়ে রোজ রোজ মিটিং, ।।।ছল ভিজিটরের সামনেই। সরকারি কর্মীদের স্কেলে মাইনে দেওয়ার দাবিতে। লোকে তখন বিরক্ত ।ত। সেই পরিস্থিতিটা আবার ফিরে আসুক, শিউচরণ তা চায় না।

তিন-চারজন একেকটা এনক্লোজারে ঢুকে খোঁজাখুজি করছে। হঠাৎ একজন চিৎকার করে বলল, '।শউদা, একটাকে পেয়ে গেছি। এই দেখো।'

বলে হাত উঁচু করে বাচ্চাটাকে ও দেখাল। সত্যি, গোসাপ সাইজের। হাঁফ ছেড়ে বাঁচল শিউচরণ। ।।কটাকে যখন পাওয়া গেছে, তখন বাকিগুলোকেও পাওয়া যাবে। ও বলল, 'বাঁচালি। খুঁজে দ্যাখ, অন্য ।।চ্চাগুলোকেও পাবি। আমি কাছাকাছি আছি। সবগুলো পেলে সঙ্গে সঙ্গে আমায় খবর দিবি। মনে ।।কে যেন, স্যার মাত্তর এক ঘণ্টা সময় দিয়েছে।'

কথাগুলো বলে শিউচরণ আর দাঁড়াল না। কাল কে যেন খবর দিয়েছিল, নীল গাইটা খাচ্ছে না। নীল গাই-কে দেখার জন্য এগোতে লাগল। জন্তুরা অসুস্থবোধ করলে কিছু খেতে চায় না। খাওয়া- দাওয়া বন্ধ করে দেওয়ার মানেই অসুস্থতার লক্ষণ। বাগানে নীল গাই মাত্র একটা। ও অসুস্থ হলে পুরো এনক্লোজারটা খালি হয়ে থাকবে। বেলা দশটা বাজে। সবে ভিজিটররা বাগানে ঢুকতে শুরু করেছে। পা চালিয়ে খানিকটা রাস্তা এগোনোর পরই শিউচরণ ডান দিক থেকে দুমদাম আওয়াজ শুনতে পেল।

কে যেন লোহার দরজায় আঘাত করছে। ও দিকটায় শিম্পাজিদের এনক্লোজার। তার মানে, ওখানে কোনও ঝামেলা হয়েছে। দিক পরিবর্তন করে শিউচরণ শিম্পাজিদের এনক্লোজারের দিকে হাঁটতে লাগল। নিত্যিনতুন প্রবলেম। কত দিক আর ও সামলাবে?

বছর পাঁচেক আগে শিউচরণ শিম্পাজিদের কিপার ছিল। ওদের খুঁটিনাটি সব জানে। তখন থেকেই বাগানে চারটে শিম্পাজি। দু'টো পুরুষ আর দু'টো মাদী। একসঙ্গে চারটে শিম্পাজিকে বাইরে ছাড়া হয় না। তা হলে নিজেদের মধ্যে মারপিট শুরু করে দেয়। ওদের প্রত্যেকের নামও আছে। পুরুষ দু'টোর নাম জনি আর বাবু। মাদীদের নাম ডেইজি আর রানি। জনি আর ডেইজি একটা জুড়ি, অন্য জুড়ি হল বাবু আর রানি। বিদেশ থেকে জনি আর ডেইজি নাম নিয়েই চিড়িয়াখানায় এসেছিল। সেজন্য ওদের নামগুলো বিদেশী। তখন শিউচরণ ছিল পাখিদের দেখাশুনো করার দায়িত্বে। কিন্তু টাঙ্গানিকা থেকে যখন বাকি দু'জন এল, তখন ওদের বাবু আর রানি নামটা রেখেছিলেন সেই সময়ের বনমন্ত্রী।

শিম্পাজিদের এনক্লোজারের সামনে এসে শিউচরণ দেখল, বাবু দোলনায় বসে ঝুল খাচ্ছে। আর ভিজিটরদের গ্যালারির খুব কাছে একটা কম্বল পেতে, কাৎ হয়ে শুয়ে রয়েছে রানি। দেখে শিউচরণ মুচকি হাসল। মাদী শিম্পাজিগুলো পুরুষদের তুলনায় বেশি চালাক হয়। রানি ভান করছে, যেন রোদ পোহাচ্ছে। আসলে

কিন্তু তা নয়। ইচ্ছে করেই ও ভিজিটরদের কাছাকাছি শুয়ে আছে। যাতে ওকে দেখে ভিজিটররা ফলমূল ছুড়ে দেয়। শীতের এই সময়টায় প্রতিদিনই কোনও না কোনও স্কুল থেকে বাচ্চারা চিড়িয়াখানা দেখতে আসে। আর বাচ্চারা এলেই শিম্পাজিদের পোয়া বারো। নিজেদের ভাগের কমলালেবু, শসা, কলা আপেল ছুড়ে দিতে বাচ্চারা কার্পণ্য করে না।

রেলিংয়ের ধারে স্কুলের ছেলেমেয়েদের গিজগিজে ভিড়। ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের প্রাইমারি সেকশনের। বাচ্চাগুলো নিজেদের মধ্যে বাংলা ইংরেজি মিশিয়ে কথা বলছে। একটু দূরে দাঁড়িয়ে শিউচরণ ওদের কথা শুনতে লাগল। দু'জনের মধ্যে তর্ক বেঁধেছে বাঘ আর সিংহের মধ্যে লড়াই হলে কে জিতবে? একজন বলছে বাঘ, অন্য জন সিংহ। শুনে শিউচরণ হাসল। বহু বছর আগে এই চিড়িয়াখানাতেই একবার বাঘ আর সিংহীর লড়াই হয়েছিল। সিংহীটা সদ্য এসেছিল আরব দেশ থেকে। যারা ওদের নিয়ে এসেছিল, তারা কখনও বাঘ দেখেনি। তাদের মধ্যে ঠিক এই তর্কটাই হয়। বাঘ-সিংহীর পাশাপাশি খাঁচা। দুপুরবেলায় বাঘের খাঁচায় কীভাবে তারা যেন ওই সিংহীটা ঢুকিয়ে দেয়। ব্যস, বাঘের সঙ্গে সিংহী কখনও পারে নাকি? অনেকক্ষণ মারামারির পর বাঘটা শেষ পর্যন্ত সিংহীকে মেরে ফেলে।

শিম্পাজিদের ঘর থেকে ফের দুমদাম আওয়াজটা আসছে। কয়েক দিন আগে ওই ঘরের তালা ভেঙেই বাবু আর রানি বাইরে

বেরিয়ে এসেছিল। অনেক কষ্টে ধরে, ওদের ভেতরে পাঠানো হয়। আজ আবার কী হল? ঘরের ভেতর এখন আছে জনি আর ডেইজি। সবথেকে পাজি হচ্ছে ডেইজি। ঝামেলা পাকাতে ওস্তাদ। কী চলছে, নিজের চোখে দেখার জন্য শিউচরণ ওদের ঘরের দিকে হাঁটতে লাগল। মোরামের রাস্তায় পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে খটিককে ও দেখতে পেল। কালু খটিক শিম্পাজিদের কিপার। ওকে দেখামাত্র খটিক বলল, 'আরে শিউদা, তোমার কাছেই যাচ্ছিলাম।'

শিউচরণ বলল, ' কেন রে কী হয়েছে?'

'ডেইজিটা ফের বদমায়েসি শুরু করেছে। সকালে খাবার দিতে গিয়ে দেখি, জনির হাতে চোট লেগেছে। বোধহয় কোথাও খোঁচা-টোচা খেয়েছে। রক্ত পড়ছে। দেখেই ভাবলাম, তোমার ওখানে নিয়ে যাওয়া দরকার। ওকে খাইয়ে দাইয়ে যখন আলাদা করার চেষ্টা করছি, তখনই ডেইজিটা খচরামি শুরু করল। কিছুতেই জনিকে কাছছাড়া করে না।'

'কী করছিল ডেইজি?'

'দু'জনকে আলাদা করার জন্য ওপর থেকে যতবার লোহার গারদটা ফেলছি, ততবারই জনিকে, নিজের দিকে টেনে নিচ্ছিল ডেইজি। বুঝতে পেরেছে, জনিকে সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছি। শেষে দিলাম লাঠি দিয়ে দু'চার ঘা। তখন সরে গেল। জনিকে যেই না খাঁচায় পুরেছি, অমনি ডেইজিটা বুক চাপড়ে কাঁদতে শুরু করল। এখন দেখো, এত রেগে গেছে, লোহার দরজায় ঘুষি মারছে।'

'হ্যাঁ আমিও আওয়াজ শুনে তোর কাছে যাচ্ছিলাম। যাক গে, ভিজিটরদের ভিড় বাড়ার আগেই তুই জনিকে নিয়ে হাসপাতালে চলে যা। ডাক্তারবাবু আর একটু পরেই এসে পড়বেন।'

শিম্পাজিঘরের পিছন দিক দিয়ে হরিণদের এনক্লোজারে যাওয়ার একটা শর্টকার্ট রাস্তা আছে। সেটা ভিজিটরদের জন্য নয়। দরজা খুলে শিউচরণ ফের পিছনের রাস্তায় এল। মিনিট কুড়ি কেটে গেছে।

pathagar.net

বান্টিরা কী করল, একবার দেখা দরকার। দূর থেকে ও দেখল, মণিপুরি হরিণদের এনক্লোজারের সামনে ছোটখাটো একটা ভিড়। বান্টির সঙ্গে তুমুল কথা কাটাকাটি হচ্ছে দু'তিনজন ভিজিটরের। ছেলেটার কোনও কাণ্ডজ্ঞান নেই। যাকে কুমিরের বাচ্চা খোঁজার দায়িত্ব দেওয়া হল, সে কী না ফালতু ঝগড়ায় জড়িয়ে পড়েছে?

পা চালিয়ে ভিড়ের কাছে গিয়ে শিউচরণ বুঝল, মামলা আরও গম্ভীর। একটা কুড়ি-একুশ বছর বয়সী মেয়ে হাপুস নয়নে কাঁদছে। তার হাত শক্ত করে ধরে আছে বান্টি। মেয়েটা সুন্দরী, পোশাক আশাক দেখে মনে হয়, ভদ্র পরিবারের। তাকে নিয়ে ঝামেলাটা বান্টির সঙ্গে বাঁধেনি। মাঝবয়সী এক ভদ্রলোকও চেঁচাচ্ছেন। তাঁর অভিযোগ, মেয়েটা তাঁর পকেট থেকে পার্স তুলে নিয়েছে। তর্কাতর্কিতে জড়িয়ে পড়েছেন কয়েকজন ভিজিটরও। তাঁরা বলছেন, 'একজন ভদ্রমহিলাকে এ রকম অপদস্থ করছেন। আপনারা ভেবেছেনটা কী?'

শিউচরণ কয়েক মুহূর্তের মধ্যে পরিস্থিতিটা বুঝে নিল। বাগানে পকেটমারের উৎপাত এর আগেও হয়েছে। কিন্তু মেয়ে পকেটমার ধরা পড়ল এই প্রথম। ও ভিড়ের মাঝে ঢুকে বলল, 'এই বান্টি, অত কথা বলার তো দরকার নেই। পুলিশ আছে, পুলিশের কাছে নিয়ে যা। ওরা

বুঝে নেবে।'

পুলিশের নাম শুনে ভিড়টা পাতলা হতে শুরু করল। বান্টি বলল, 'আমি তো পুলিশের কাছেই ।।য়ে যাচ্ছিলাম। তুমি জানো না বস, এরা কী র'ম এঁড়ে তক্ক করছিল। ভিজিটর বলে কী মাথায় তুলে ।।চতে হবে?'

ধমক দিয়ে ওকে থামিয়ে দিল শিউচরণ, 'চুপ কর। পকেটমার ধরাটা কি তোর কাজের মধ্যে পড়ে? ।গ জন্য সিকিউরিটি এজেন্সির লোক আছে। তোকে যে কাজটা করতে বললাম, তার কী হল?'

পাঁচটা বাচ্চা খুঁজে পাওয়া গেছে, বস। একটাকে এখনও পাইনি।'

'ঠিক আছে, আমি সাহেবের ঘরে যাচ্ছি। খবরটা আগে দিয়ে রাখছি।'

নীল গাইটাকে দেখে পাঁচ-সাত মিনিট পর ডিরেক্টরের অফিসের কাছে গিয়ে শিউচরণের চক্ষুস্থির।

।। গেছে, মেয়ে পকেটমার ধরা পড়েছে। গেটের সামনে মারাত্মক ভিড়। শিউচরণ দেখল, একুশ

।। বছরের সুন্দরী মেয়েটার চুল ধরে টানতে টানতে বাইরে নিয়ে আসছেন একজন মেয়ে পুলিশ ।।।সার। একটু আগে তড়পাচ্ছিল। এখন মেয়েটা মিনতি করছে। ঘরে ঢুকতেই ডিরেক্টর সাহেব ।।লেন, 'মানুষ চেনা বড় কঠিন শিউ। এর থেকে জন্তুদের ডিল করা বোধ হয় অনেক সহজ। দেখে মনে হয়, মেয়েটা পকেটমার?'

শিউচরণ হাসল, 'ঠিক বলেছেন স্যার। যাক গে, আপনাকে একটা সুখবর দিই। কুমিরের পাঁচটা বাচ্চা পাওয়া গেছে।'

'থ্যাঙ্ক গড। না-পাওয়া গেলে আমার লস অব ফেস হয়ে যেত। আসলে, কুমিরের ক্যাপটিভ ব্রিডিং ।।য়ে একটা আর্টিকেল লিখেছিলাম জু গার্ডেন্স ডিরেক্টরদের সুভেনিরে। সেটা পড়ে মুম্বই চিড়িয়াখানার ।।ডরেক্টর আমাদের এখানে কাল আসছেন নিজের চোখে বাচ্চাগুলোকে দেখতে

pathagar.net

। কী প্রবলেম হত বল তো, যদি বাচ্চাগুলোকে দেখাতে না পারতাম? থ্যাংক ইউ শিউ। তোমার জন্য কিছু করতে পারলে খুশি হব।'

সাহেবকে খুশি দেখে শিউচরণ বলল, 'আমার জন্য কিছু করতে হবে না স্যার। একটা কথা বলব বলব ভাবছিলাম। শুনলাম, কুড়িজন নতুন এমপ্লয়ি নেওয়া হবে। রামভজনের বউয়ের জন্য যদি কিছু করে দিতে পারেন, তা হলে মেয়েটা বেঁচে যায়।'

'ডান। একটা পোস্ট আছে, আমি সিলেক্ট করতে পারব। তুমি মেয়েটর নাম আমাকে আগে দিয়ে রেখো। ম্যানেজিং কমিটিকে দিয়ে কাজটা আমি করিয়ে নেব।' বললেন ডিরেক্টর সাহেব।

শুনে শিউচরণও খুশি মনে বেরিয়ে এল।

১৯

ল্যান্ড লাইনের ফোনটা অনেকক্ষণ ধরে বাজছে। সোফায় বসে কাগজগুলোতে চোখ বোলাচ্ছিল অর্ক। ইচ্ছে করেই রিসিভারটা ও তুলল না। সবাই জানে, সকালবেলা ছাড়া ল্যান্ডলাইনে ওকে পাওয়া যায় না। এই সময়টায় ওকে যারা ফোন করে, কোনও কাজ বাগানোর জন্যই করে। যত সব ফালতু ঝামেলা। এই কারণে অর্ক সকালের দিকে, প্রথম বার বাজলে ফোন তুলতে চায় না। যার আর্জেন্সি আছে, সে দ্বিতীয় বার করবে। রিঙের শব্দটা থেমে যেতেই অর্ক তাই কাগজের দিকে মন দিল। সিবিআই রিজওয়ানুর রহমান সম্পর্কে রিপোর্টটা হাইকোর্টে জমা দিয়েছে। বলেছে আত্মহত্যা।

সেই খবরটাই খুঁটিয়ে পড়ছিল অর্ক। ফোনটা ফের বেজে উঠল। রিসিভার কানে দিয়ে গলাটা শুনে অর্ক বুঝতে পারল, দীপিকা সেন। খুব আগ্রহের সঙ্গে ও বলল, 'খবরটা কী বলুন দীপিকাদি।'

'ঘুমোছিলেন নাকি মশাই। এতক্ষণ ধরে রিং হচ্ছিল। আপনার বান্ধবীর বাড়িতেও ফোন করেছিলাম। শুনলাম, উনি এখনও বিছানা ছেড়েই ওঠেননি।'

অর্ক বলল, 'উনি রিচ অ্যান্ড ফেমাস। ওর পক্ষে যা করা সম্ভব, আমার মতো রিপোর্টারের কি সেটা মানায়? ফর ইয়োর ইনফর্মেশন ম্যাডাম, ঘুম থেকে উঠে ব্যায়াম, চা পান ইত্যাদি আমার হয়ে গেছে। এখন কাজের মেয়ের প্রতীক্ষায় বসে আছি। না এলে ব্রেকফাস্ট করা হবে না।'

'বান্ধবীটিকে ঘরে নিলে এলেই তো পারেন। তা হলে শুধু ব্রেকফাস্ট নয়, ডিনার পর্যন্ত জুটবে।'

'না ম্যাডাম, পশুপ্রেম আর সাংবাদিকতা এক খাতে মিলবে বলে মনে হয় না। যাক গে, কী জন্য ফোন করেছিলেন বলুন।'

'কাল বিকেল থেকে থ্রেট কল পাচ্ছি। হনুমানের আলট্রাসোনোগ্রাফি নিয়ে কোনও রিপোর্ট দিলে, আমার লাশ ফেলে দেওয়া হবে।'

'আমিও দু'তিন দিন ধরে থ্রেট কল পেয়েছি। ও সব নিয়ে ভাববেন না। আমাদের কাগজে খবরটা বেরোনোর পর রাইটার্সে খুব হই চই হয়েছে। সেই কারণে, যারা দুষ্কর্মটা করেছে, তারা ভয় দেখাচ্ছে।'

'কিন্তু আমার ল্যান্ড লাইনের নাম্বারটা ওরা পেল কী করে বলুন তো?'

'দীপিকাদি, আপনি একটা এনজিও চালান। আপনার নাম্বার পাওয়া কি কঠিন?'

'আপনার রিপোর্টে কোথাও আমার নাম দেননি। তা সত্ত্বেও কী করে ওরা জানাল, আমি হনুমানগুলোর আলট্রাসোনোগ্রাফি করেছি?'

' হয় ওরা আপনার পরিচিত এবং জানে, একমাত্র আপনার কাছেই একটা পোর্টেবল মেশিন আছে। না হয়, নয়াগ্রাম সোর্স থেকে ওরা জেনেছে। মনে হয় আমার প্রথম ধারণাটা ঠিক। পুরো র‍্যাকেটটা কলকাতার। এমন কেউ রয়েছে, অ্যানিম্যাল নিয়ে ডিল করে। এবং আমাদের খবর পেয়ে যাচ্ছে।'

'আচ্ছা, নুরুলের সঙ্গে আপনার যোগাযোগ হয়েছে কি? নয়াগ্রামের কোনও খবর আছে?'

'ওর সঙ্গে রোজই আমার কথা হচ্ছে। আপনাকে একটা খারাপ খবর দিই। ওদের ওখানে যে ছেলেটা গুড়গুড়ি পালের জঙ্গলে একটা জিপসি গাড়ি দেখতে পেয়েছিল, তার কথা মনে আছে আপনার?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেই ছেলেটাকে তো পাওয়া যাচ্ছিল না।'

'তার ডেড বডি পাওয়া গেছে, নদীর একটা খালে। মেরে তাকে কাদায় পুঁতে ফেলা হয়েছিল। পুলিশের কুকুর ওকে আবিষ্কার করে।'

'মাই গড, কী বলছেন? আপনি তো ভয় ধরিয়ে দিলেন মশাই। যারা মানুষ খুন করতে পারে, তারা তো খতরনাক ক্রিমিনাল। কী হবে?'

'কী আবার হবে? আজকের কাগজটা পড়েননি? পাপ কখনও বাপকে ছাড়ে না। দেখছেন তো, কিডনি চক্রের পাণ্ডা অমিতকুমারকে সিবিআই কীভাবে কাঠমাণ্ডু থেকে ধরে নিয়ে গেল। নয়াগ্রামের র‍্যাকেটটার সঙ্গে ওর যোগাযোগ থাকলে আমি অবাক হব না।'

'হতেও পারে, জানেন। আমার এক পিসতুতো ভাই সিবিআইয়ের বড় অফিসার। ও হঠাৎ কলকাতায় এসেছে। কাল আমাক ফোন করেছিল।'

' থ্রেট কল-এর কথাটা ওকে জানান না।'

'জানিয়ে লাভ হবে? আমার হাজব্যান্ড কিন্তু বলছিলেন, পুলিশকে জানিয়ে লাভ নেই।'

'পুলিশকে আমি জানিয়েছি। লালবাজারের অনেকের সঙ্গে আমার জানাশোনা আছে। ওরা কাজ

শুরু করে দিয়েছে। আপনি আপনার পিসতুতো ভাইকে একবার বাজিয়ে দেখুন সঙ্গে অমিতকুমারের কোনও লিঙ্ক আছে কী না।'

তো, নয়াগ্রামের ঘটনার

'একটা কাজ করবেন অর্কবাবু, আজ রাতের দিকে আমার বাড়িতে একবার আসুন না। ভাইকেও ডেকে নিচ্ছি। পেট থেকে

কায়দা কানুন জানেন।'

আপনিই না হয় কথা বের করে নিন। রিপোর্টার তো, আপনারা অনেক

শুনে হাসল অর্ক। তার পর বলল, 'আমার তো মনে হয়, পেট থেকে কথা বের করে নেওয়ার কায়দাটা আপনিও ভালো জানেন। নয়াগ্রাম থেকে ফেরার পথে সাঁঝেলির পেট থেকে যেভাবে কথা বের করে নিলেন, তা শুনে আমি মুগ্ধ।'

'আরে মশাই, সে তো আগের রাত্তিরে বারান্দায় আপনাদের কথাবার্তা শুনেছিলাম বলে। একটা কথা বলি ভাই, সাঁঝেলি মেয়েটা একসেপশনাল। নয়াগ্রামে সেদিন আমাকে কী বলেছিল জানেন? আচ্ছা দীপিকাদি, এই হনুমানটাকে যদি আমার একটা কিডনি দিই, তা হলে কি বাঁচানো যাবে? অ্যান্ড শি মেন্ট ইট। শুনে আমি চমকে উঠেছিলাম। ক'টা মানুষ এই ধরনের কথা বলতে পারে বলুন? অ্যাদ্দিন নিজেকে আমি সবথেকে বড় অ্যানিম্যাল লাভার ভাবতাম।

ওর তুলনায়তো আমি কিছুই না।'

শুনে অর্কর খুব ভালো লাগল। প্রসঙ্গ বদলানোর জন্যই ও বলল, 'আজ অফিস থেকে বেরোতে আমার দেরি হবে। ধরুন, রাত আটটার সময় যদি আপনার বাড়ি যাই, ঠিক আছে?'

'কোনও অসুবিধে নেই। এখানেই ডিনার করবেন। আপনার বান্ধবীকেও ডাকছি। ছাড়ি তা হলে?'

রিসিভারটা ক্রেডলে রেখে অর্ক মুচকি হাসল। দীপিকা সেনের সঙ্গে আলাপ মাত্র দু'দিনের। অথচ

আপন হয়ে গেছেন। ভদ্রমহিলা খুব রোমান্টিক ধরনের। ধরেই নিয়েছেন সাঁঝেলির সঙ্গে ওর

একটা প্রেমের। নয়াগ্রামে নুরুলের বাড়িতে সেই চাঁদনি রাতটার কথা অর্কর মনে পড়ল। ঘুম আসছিল না। সিগারেট টানার জন্য ঘরের বাইরে বেরোতেই ও দেখে, সাঁঝেলিও বারান্দায় দাঁড়িয়ে। দু'জনে মিলে অনেক রাত্তির অবধি গল্প করেছিল। জোৎস্না আলোয় সাঁঝেলিকে সেদিন ওর পরম রূপসী বলে মনে হয়েছিল। অর্ক প্রেম নিবেদন করে বসতেও পারত। কিন্তু কথাবার্তা বলার পরে ওর মনে হয়েছিল, চাঁদের দিকে হাত বাড়িয়ে লাভ নেই। নিজেকে ও সাবধান করেছিল, 'আর এগিও না বৎস। সাঁঝেলির মতো একটা খাঁটি মেয়ের সঙ্গে যে তোমার পরিচয় হয়েছে, এটাই যথেষ্ট।'

সাঁঝেলির চিন্তা মন থেকে জোর করে হটাল অর্ক। হঠাৎ ওর খেয়াল হল, সাড়ে আটটা বাজতে চলল, অথচ কাজের মেয়ে রমলা এখনও আসেনি। রোজ এই এক টেনশন। রমলা না এলে সারাদিন ঘরটা অগোছালো হয়ে পড়ে থাকে। একেক সময় অর্কর মনে হয়, পেয়িং গেস্ট হয়ে কোথাও চলে যায়। তা হলে কোনও টেনশন ভোগ

করতে হয় না। কিন্তু ফ্ল্যাট ছেড়ে কোথাও চলে যাওয়ার ইচ্ছেটা ও দমন করে দাদুর কথা ভেবে। দাদুর কত স্মৃতি এই ফ্ল্যাটের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। এই ফ্ল্যাটটা যেন একটা শেকড়। ওর পূর্বপুরুষদের যোগসূত্র। ও চলে গেলে সেই শেকড়টা উপড়ে যাবে।

খবরের কাগজে চোখ বোলানো হয়ে গেলে রোজ অর্ক সারাদিনের কাজটা ছকে নেয়। কোনস্টোরির পিছনে দৌড়বে, ঠিক করে। প্রয়োজন মতো কয়েকটা ফোন সেরে নেয় বাড়ি থেকে। ওর মনে পড়ল, ওয়াটগঞ্জ থানায় তিন-চার দিন কোনও খবর নিতে পারেনি। হরিণ মার্ডার কেসটার কী ডেভেলপমেন্ট হল, জানা হয়নি। ও সি তালুকদারকে ও ফোন করল, 'খবর টবর কিছু দিন?'

তালুকদার রসিক মানুষ, বললেন, 'খবর নেই। টবর আছে নেবেন? চিড়িয়াখানায় একজন এমপ্লয়িকে কাল রাতে তুলে এনেছি।'

'কেন ইনভলভ নাকি?'

'আমাদের তো তাই মনে হচ্ছে। ছেলেটার নাম মন্টু পালিত। আসল কালপ্রিট অবশ্য এখনও ফেরার। মনে হয়, বাংলাদেশে গিয়ে গা ঢাকা দিয়েছে।'

'আপনি সেদিন বলছিলেন, কেউ ওদের কাজটা করার জন্য সুপারি দিয়েছে। সেই লোকটা কে জানতে পারলেন?'

'জেনেছি। রাজা বলে একটা ছেলে। সে চাকরি করে মিত্র কনস্ট্রাকশন বলে এক কোম্পানিত। কিন্তু তার মোডাস অপারেন্ডিটা কী, সেটাই আমরা বুঝতে পারছি না। রাজা মেনলি পি আর জব করে। পাস্ট কোনও ক্রাইম রেকর্ড নেই। পাড়ায় ভালো ছেলে বলে লোকে জানে।'

pathagar.net

' আচ্ছা, পালিতকে যে অ্যারেস্ট করেছেন,জু-ডিরেক্টর কি তা জানেন?'

'বলতে পারব না । কোয়ার্টারটা রং করাচ্ছি মশাই বুঝলেন ।তাই এখন খুব ব্যস্ত। রং করার লোকজন এসে গেছে। বদলি হওয়ার চান্স কম তো। তাই সাজিয়ে গুছিয়ে এ থানায় যতদিন থাকা যায় আর কী। আপনাকে বলে কয়েও তো কিছু হল না।'

তালুকদারের কথা শুনে অর্ক হেসে ফেলল। আগের দিন কথায় কথায় তালুকদার জানতে চেয়েছিলেন, লালবাজার সোর্স থেকে একটু খবর নিন তো মশাই, ওয়াটগঞ্জ থেকে আমার বদলি হওয়ার চান্স আছে কী না? অর্ক তখন আশ্বাস দিয়েছিল, খবর নেবে। কিন্তু একদম ভুলে গেছে। কায়দা করে সেই কথাটাই তালুকদার মনে করিয়ে দিলেন। ও হেসে বলল, 'সরি দাদা, আপনার খবরটা নেওয়া হয়নি। সিপি-র কাছ থেকে আজই আমি জানার চেষ্টা করব।'

ফোনটা ছেড়ে অর্ক লক্ষ করল, ওর ফ্ল্যাটের দেওয়ালগুলোও কেমন যেন বিবর্ণ হয়ে গেছে। গৃহপ্রবেশের সময় দাদু অনেক শখ করে রং করিয়েছিল। সেই রং গত আট বছরে জ্বলে গেছে। যত্নই নেওয়া হয় না। কখন-ই বা নেবে? সারাদিনই তো ও বাড়ির বাইরে থাকে। কয়েকদিন আগে, একটা

রবিবারে, আড্ডা মারার জন্য সাঁঝেলি হঠাৎ এসে হাজির। ঘর আলো করে বসে ছিল ।ও চলে যেতেই অর্ক আবিষ্কার করে, এই ঘরে সাঁঝেলিকে মানায় না। নাহ, ফ্ল্যাটে নতুন রং করাতেই হবে। তার জন্য

।দ ওকে হপ্তা দুয়েক ছুটি নিতে হয়, তাও নেবে। টাকা পয়সা আছে। দাদু যা রেখে গেছে কাফি।

দরজায় নক করার শব্দ। কাজের মেয়েটা তা হলে এল। সোফা ছেড়ে উঠে গিয়ে অর্ক দরজা খুলতেই দেখল চারতলার মাসিমা। বিপন্ন মুখে দাঁড়িয়ে। বললেন,' ও বাবা অর্ক। খুব বিপদে পড়েছি। আমাদের রানু লাফিয়ে কার্নিশে চলে গেছে। নামতে পারছে না।'

চারতলার মেসোমশাই আর মাসিমার সঙ্গে একটা সময় দাদুর সম্পর্ক খুব ভালো ছিল। প্রায়ই ওরা আসা যাওয়া করতেন। মেসোমশাই চাকরি করতেন ফাইজার কোম্পানিতে। এখন রিটায়ার্ড। ওদের একমাত্র ছেলে সুনীল থাকে হায়দরাবাদে। ইঞ্জিনিয়ার, ভালো চাকরি করে। বাবা-মা অন্তপ্রাণ। বছরে দু'তিন বার করে কলকাতায় আসে। এখনও বিয়ে থা করেনি। বাড়িতে মেসোমশাই আর মাসিমা ছাড়া আর কেউ আছে বলে অর্কর জানা নেই। ও প্রশ্ন করল, 'রানু কে মাসিমা?'

' ও মা, তাকে চেনো না। এ হাউসিংয়ে তো আমার চে' লোকে বেশি ওকে চেনে। আমার সুনীলের মেনি বেড়াল। গোল্ডেন কালারের। কার্নিশে বসে খুব কান্নাকাটি করছে। তুমি ওকে নামাবার একটা ব্যবস্থা করো বাবা। টেনশনে তোমার মেসোমশাইয়ের ব্লাড প্রেসার বেড়ে গেছে। যদি চারতলা থেকে আমার রানু পড়ে যায়, তা হলে যে বাঁচবে না গো।'

আঁচল দিয়ে চোখের জল মুছলেন মাসিমা। অর্কর ভয়ানক হাসি পেল। পরক্ষণেই সাঁঝেলির কথা

মনে হল ওর। সাঁঝেলিই ঠিক, পৃথিবীতে সত্যিই পশুপ্রেমীদের সংখ্যা বাড়ছে। ও বলল, 'ঠিক আছে মাসিমা আপনি ওপরে যান। আমি দেখছি, কী করা যায়।'

ফ্ল্যাটের দরজা লক করে, বারমুডা আর টি শার্ট পরা অবস্থাতেই অর্ক বাইরে লনে বেরিয়ে এল। ফ্ল্যাটের সামনে ছোটখাটো ভিড়। হাউসিংয়ের কয়েকজন ছেলেমেয়েকে ও দেখতে পেল। ভিড়ের মাঝে মহিলাকেও। সবাই চারতলার কার্নিশের দিকে তাকিয়ে। চারটে ছেলে নীচে বেডকভার ধরে আছে।

pathagar.net

তিনতলার বারান্দা থেকে এক জন লাঠি দিয়ে বেড়ালটাকে খোঁচা মারছে। নীচে যাতে বেডকভারের ওপর পড়ে। কিন্তু বেড়ালটা লাফাতে ভরসা পাচ্ছে না। বার বার কার্নিশের অন্য দিকে সরে যাচ্ছে। টাউসিংয়ের খুব বেশি মানুষের সঙ্গে অর্কর আলাপ নেই। যা কিছু দেখা সাক্ষাৎ হয় পুজোর সময়। চার দিন ধরে প্যান্ডেলে খাওয়া দাওয়া। তখন অর্কর সঙ্গে যেচে যেচে কয়েকজন কথা বলে।

ওকে দেখে একটা ছেলে এগিয়ে এসে বলল, 'অর্কদা, আমি বুবাই। তিনতলায় থাকি। ঘণ্টা খানেক ধরে চেষ্টা করছি। তবুও বেড়ালটাকে নামাতে পারছি না। কী করা যায়, বলুন তো?'

অর্ক বলল,' বেড়াল গেল কী করে কার্নিশে?'

' আমি বলছি অর্কদা, ইদানীং ওই কার্নিশটায় রোজ রাতে একটা পেঁচা এসে বসছিল। মা বলল, লক্ষ্মী পেঁচা। তাড়িয়ে দিস না। রাতে আসত, আবার ভোরবেলায় কোথায় চলে যেত। চ্যাটার্জি মেসোর রানু পেঁচাটাকে টার্গেট করেছিল। ও লাফ দিয়ে কার্নিশে নামতেই পেঁচাটা উড়ে যায় আমগাছের দিকে। আর বেচারা রানু ফেঁসে গেছে।'

অর্ক বলল, ' দমকলে খবর দিতে হবে। ওদের কাছে বড় ল্যাডার আছে। কার্নিশ থেকে বেড়ালটাকে ওরা নামিয়ে আনতে পারবে। দাঁড়াও, আমি ওদের বলে দিচ্ছি।'

পাঞ্জাবির পকেট থেকে মোবাইল সেটটা বের করে আনল অর্ক। পুলক দাশগুপ্তকে ফোন করে দিলেই হবে। দমকলের বড় অফিসার। নন্দরাম মার্কেটে আগুন লাগার পর ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। পরে অর্ক জানতে পারে, পুলকবাবু নন্দিনীর খুড়তুতো দাদা। ভদ্রলোকের ফোন এনগেজড। বার চারেক চেষ্টা করার পর পুলকবাবুকে ধরতে পারল অর্ক। পুরো ব্যাপারটা বলতেই উনি বললেন, 'আমি টালিগঞ্জ স্টেশনকে বলে দিচ্ছি। মিনিট দশের

মধ্যেই ওরা পৌঁছে যাবে । চিন্তা করবেন না।'

আর দাঁড়িয়ে থাকার কোনও মানে হয় না। অর্ক ওর ফ্ল্যাটের দিকে চলে আসছিল। হঠাৎ বুবাই বলল, 'অর্কদা, একটা প্রবলেম তো সলভ করে দিলেন, আরেকটার কী হবে?'

'আবার কোন সমস্যা?'

' পেঁচাটা। উড়ে গিয়ে আম গাছে তো বসেছিল বেচারা। দিনের আলোয় দেখতে পায় না। তাই গাছ থেকে নীচে পড়ে গেছিল । কয়েকটা কাক কোত্থেকে উড়ে এসে ওকে অ্যাটাক করে । পেঁচাটাকে আমি

উদ্ধার করি। একটা খাঁচায় পুরে, রেখে দিয়ে আসি কমিউনিটি হল-এ। কিন্তু দেখবেন চলুন, পেঁচাটার কী অবস্থা।'

' কেন কী হয়েছে?'

' কোত্থেকে মা-দিদিমারা লক্ষ্মী পেঁচার খবর পেয়েছে। মা লক্ষ্মীর বাহন বলে কথা। সবাই ওর মাথায় সিঁদুর দিচ্ছে। ওকে আর চেনাই যাচ্ছে না।'

'বারণ করো। পেঁচাটার কিছু হলে, তোমরা কিন্তু মুশকিলে পড়ে যাবে। যেভাবেই হোক, তোমরা ওকে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের হাতে তুলে দিয়ে এসো।'

'কাউকেই তো আমরা চিনি না অর্কদা। আপনি একটু হেল্প করুন না।'

সাঁঝেলির কথা মনে পড়ল অর্কর। ও বলল, 'এক ভদ্রমহিলার ফোন নাম্বার তোমাকে দিচ্ছি। কাছেই থাকেন, লেক গার্ডেন্সে। সাঁঝেলি মিত্র। ওর সঙ্গে যোগাযোগ করো। উনি তোমাদের হেল্প করতে পারবেন ।' কথাগুলো বলেই অর্ক আর দাঁড়াল না। রমলাকে ডেকে ফ্ল্যাটের ভেতর ঢুকে পড়ল । স্নান করে ওকে এখুনি রেডি থাকতে হবে। সাঁঝেলি আসার আগেই।

pathagar.net

সাঁঝেলি আজ খুব খুশি, শেষ পর্যন্ত ও অর্ককে গোবিন্দপুরে নিয়ে যেতে পারছে। অনেক দিন ধরেই ওর ইচ্ছে ছিল, অর্ককে হসপিটালটা দেখানোর। ভাগ্যিস পেঁচাটার জন্য হাউসিং থেকে ছেলেগুলো ফোন করেছিল। পেঁচাটাকে নিয়ে ও অর্কর ফ্ল্যাটে যায়। তার পর প্রায় জোর করেই ওকে গাড়িতে তোলে। অর্ক যে রাজি হয়ে যাবে, সাঁঝেলি ভাবেইনি। সুকান্ত সেতুর ওপর দিয়ে বাইপাসের দিকে যাওয়ার সময় ও বলল, 'হসপিটালে পৌঁছতেআমাদের মিনিট সাতেক লাগবে। আশিসদাকেও আসতে বলে দিয়েছি। তোমার সঙ্গে ওঁর দেখা হয়ে যাবে।'

'কোত্থেকে আসবেন তোমার আশিসদা?'

সাঁঝেলি বলল 'ফের ঠেস দিয়ে কথা বলছ। তোমার আশিসদা... মানেটা কী। সকালবেলায় ঝগড়া শুরু করলে। আশিসদা থাকে পাকপাড়ার দিকে। কিন্তু এখন কী একটা কাজে বেরিয়েছে। বলল, রাইটার্সে ফেঁসে না গেলে আধ ঘণ্টার মধ্যেই পৌঁছে যাবে,'

গাড়ি চালাচ্ছে সাঁঝেলি। সামনের সিটে ওর পাশে বসে আছে অর্ক। পিছনের সিটে বুবাই। পেঁচার খাঁচা হাতে নিয়ে। সাঁঝেলি ওকেও নিয়ে এসেছে হাসপাতালটা চেনানোর জন্য। যাতে পরে হাউসিংয়ের লোক জানতে পারে, গোবিন্দপুরে এত ভালো একটা ভেটেরনারি হাসপাতাল আছে। সাঁঝেলি এখন অবশ্য বুঝতে পারছে, ছেলেটাকে না নিয়ে এলেই ভালো করত। অর্কর সঙ্গে দু'দিন পর দেখা হল। অথচ মনে হচ্ছে, কতদিন পর যেন। পেছনে বসা ছেলেটার জন্য ও মন খুলে কথা বলতে পারছে না।

'কী হল, কথা বলছ না যে।' সাঁঝেলি জানতে চাইল।

অর্ক বলল 'তোমার আশিসদা কিন্তু আজ আসবেন না।'

'হতেই পারে না। তোমার সম্পর্কে আমি এত কথা বলেছি, আশিসদা তোমাকে দেখার জন্য আসবেই।

pathagar.net

ত কাজ থাক। বাজি?'

'আমার সঙ্গে বাজি ধর না সাঁঝেলি। তুমি কিন্তু হেরে যাবে।'

জেদ বজায় রাখার জন্যই সাঁঝেলি বলল, 'ঠিক আছে, আশিসদা যদি না আসে, তা হলে তোমাকে

আমি লাঞ্চ খাওয়াব। আর যদি আসে , তা হলে তুমি খাওয়াবে।'

'তার মানে? আমার অফিস?'

'কে যেতে দিচ্ছে তোমাকে? আমিও ডুব মেরে

আছে। আজ সেখানে দিনভর আড্ডা, আর গল্প।'

দেব। চিংড়িহাটায় ভালো একটা চাইনিজ রেস্টুরেন্ট

[illegible]

[illegible] শার্ট

ও তাকাল অর্কর দিকে। আজকে খুব হ্যান্ডসাম লাগছে ওকে। নীল জিন্সের। সদা শেভ করেছে বোধহয়, তাই গাল চকচক করছে। গাড়ি চালাতে চালাতেই

সাঁঝেলির মনে হল, অর্ককে যদি হালকা পিঙ্ক কালারের ফুল স্লিভ শার্ট পরানো যায়, তা হলে ওর পার্সোনালিটি আরও ফুটে উঠবে। সেদিন সাউথ সিটি শপিং মল-এ ওই রকম একটা শার্ট দেখে এসেছে ও। ইস,তখনই কিনে রাখলে ভালো করত। আজ তা হলে গিফট দেওয়া যেত।

আজকে একটা বিশেষ দিন । ভ্যালেন্টাইস ডে। অর্কর মতো ব্যস্ত রিপোর্টারের মনে রাখার কথা নয়। ওরও মনে ছিল না। আজ সকালই দীপিকাদি মনে করিয়ে দিয়েছেন। উনি এত রোমান্টিক, বললেন, 'যদি পারো, আজই মনের কথা খুলে

বল। আমাদের সময় ভ্যালেন্টাইন্স ডে ছিল না। এটা যখন ভাবি, তখন খুব আপশোস করি।'

সার্ভে পার্ক এসে গেছে। কথা বলা বন্ধ করে মন দিয়ে গাড়ি চালাতে লাগল সাঁঝেলি। অনেকদিন পর ও স্টিয়ারিংয়ে হাত দিল। ভাগ্যিস, ড্রাইভার মনা আজ আসেনি। তাই নিজে ড্রাইভ করতে পারছে। ব্রিজের বাঁ দিক দিয়ে নীচে মোরামের রাস্তায় গাড়িটা ও নামিয়ে আনল। ডান দিকের পাকা রাস্তা দিয়েও বাইপাসে পৌঁছানো যায়। কিন্তু ইদানীং সাঁঝেলি এই কাঁচা রাস্তাটা দিয়ে যাতায়াত করে, শর্ট কাট হয় বলে। রাস্তার সমান্তরাল একটা খাল আছে। সম্ভবত সেটা বুজিয়ে দিয়ে পাকা ও চওড়া করা হবে। চার-পাঁচ দিন হল, ওই খাল সংস্কার করার জন্য লেবাররা কাজ করছে। রাস্তায় ডাঁই করা পাঁক, কচুরিপানা। তার পাশ দিয়ে সাবধানে গাড়ি চালানোর সময় সাঁঝেলি লক্ষ করল, কয়েকটা ছেলে কী নিয়ে যেন কাড়াকাড়ি করছে। তখনই ওর চোখে পড়ল, ওটা সাপ। আগে এই অঞ্চলটায় প্রচুর ভেড়ি ছিল। এ দিকে সাপ থাকাটা খুব স্বাভাবিক।

ভ্যালেনটাইন্স ডে আর অর্কর কথা ভুলে গেল সাঁঝেলি, গাড়ি থামিয়ে চট করে ও নেমে পড়ল। হ্যাঁ, একটা ছেলের হাতে তিন সাড়ে তিন ফুট লম্বা একটা সাপই। গায়ে সাদা ছিটছিট রঙ দেখে মনে হচ্ছে, কেউটে। কত বয়স হবে ছেলেগুলোর? বারো-তেরো? ওরা কি জানে, কী ধরনের বিষধর সাপ নিয়ে ওর খেলা করছে? এক ছোবলেই কিন্তু শেষ। খালের আশপাশে হয়তো কোনও গর্ত থেকে বেরিয়ে এসেছে। শীতের এই সময়টায় সাপ সচরাচর বেরোয় না। খালের ধারে মাটি কোপাকুপি হচ্ছে। সে জন্য বেরিয়ে পড়েছে। সাপের মুখের কাছটা ধরে আছে ছেলেটা। সাপ ওর সারা হাত পেঁচিয়ে ধরেছে। কী ধরনের ডাকাবুকো ছেলে রে বাবা। সাঁঝেলির মাথায় এল না, সাপ নিয়ে এরা করবেটা কী? মেরে ফেলবে নাকি? সিডিউল টু অ্যানিম্যাল। এ ভাবে মেরে ফেলা যায় না। দূর থেকে

ও চিৎকার করে বলল, ' এই, এই ছেলেটা, সাপটাকে এখুনি ছেড়ে দে। না হলে কিন্তু আমি খবর দেব পুলিশে।'

পুলিশের কথা শুনে বাকি ছেলেগুলো ছুটে পালিয়ে গেল। কিন্তু হাতে সাপ ধরা ছেলেটা দাঁড়িয়ে রইল। দাঁড়ানোর ভঙ্গিতেও বেশ বেপরোয়া ভাব। খালি গা, পরনে ময়লা ছেঁড়া হাফ প্যান্ট। ব্রিজের আশপাশে বস্তি আছে। সম্ভবত সেখানকার। সাঁঝেলি ধমক দেওয়ার মতো করে বলল, 'কী হল, কথা শুনছিস না যে? সাপটাকে ছেড়ে দে।'

ছেলেটা বলল, 'না, ছাড়বুনি। বাবা তা'লে মারবে।'

'মারবে? কেন, তোর বাবা কী করবে সাপটা নিয়ে?'

'পুষবে। সাপের বিষ বের করে লিবে, তার পর বিকরি করবে।'

সরকারি অনুমতি ছাড়া সাপ পোষা যায় না। অ্যান্টি ভেনাম সিরাম তৈরি করার জন্য ওষুধ কোম্পানিগুলো সাপের বিষ কেনে। সাঁঝেলি জানে, একশো মিলিগ্রাম শুকনো বিষের দাম কম নয়। চিনির দানার মতো সাদা, কখনও বা সামান্য হলদেটে, দাম প্রায় তিনশো টাকা। কিন্তু সেই বিষ বিক্রি

করতে গেলেও সরকারি অনুমতি লাগে। নিশ্চয়ই তা এই ছেলেটার বাবার নেই। তার মানে সাপের বিষ বিক্রির একটা কালোবাজার আছে। কোনও এজেন্ট হয়তো এক-দেড়শো টাকায় এদের কাছ থেকে কিনে নিয়ে যায়। আর কোম্পানির কাছে বিক্রি করে দু' আড়াইশো টাকায়। মাঝে মিলিগ্রাম পিছু শ'খানেক করে টাকা লাভ। বাঃ, বিনা ইনভেস্টমেন্টে জন্তুদের নিয়ে ভালো ব্যবসা! সাঁঝেলি

জিজ্ঞেস করল 'তোর বাবা কোথায় বিক্রি করে সাপের বিষ?'

'বড় রাস্তার ওই পাশে, হুই একটা কুকুরদের হাসপাতাল আছে, ওখানে এক কাকু থাকে। সে লিয়ে যায় বাবার কাছ থিকে।'

অর্ক গাড়ি থেকে নীচে নেমে এসেছে। সবই শুনতে পাচ্ছে। পাছে ওর ভুল ধারণা হয়, সে জন্য প্রতিবাদ করল সাঁঝেলি, 'এই, মিথ্যে কথা বলছিস কেন? আমি ওই হসপিটালের লোক। আমাদের ওখান থেকে কোন লোকটা বিষ নিতে আসে, তার নাম বল অ্যাঁ। ওই হসপিটালে সাপের বিষ লাগে?'

'হুই তো বাবা দাঁইড়ে আছে ব্রিজের কাছে। জিজ্ঞেস করো, লেয় কী না?'

'তোদের বাড়িতে আরও সাপ আছে নাকি?'

'অনেকগুলো আছে। এই এত্ত বড় বড়।'

'সাপ পোষা বেআইনি, তোর বাবা কি জানে? কী করে তোর বাবা? কী নাম?'

'ডাঙ্গু সর্দার। বাবা রিকশা চালায়। হুই বাবা এ দিক পানে আসতেছে।'

ব্রিজের দিকে তাকিয়ে সাঁঝেলি দেখতে পেল, চোয়াড়ে মার্কা মাঝবয়সী একটা লোক হাঁটতে হাঁটতে ওদের দিকে আসছে। সেটা দেখে অর্ক ওর হাত ধরে টানল, 'চলো, ঝামেলা বাড়িয়ে লাভ নেই।'

গজগজ করতে করতে ফের গাড়িতে উঠে স্টিয়ারিং ধরল সাঁঝেলি। বাইপাসে ওঠা পর্যন্ত গুম হয়ে রইল। মনে মনে ও ঠিক করে নিল, আশিসদাকে সব বলতে হবে। হাসপাতালের বদনাম হচ্ছে। কেউ ইচ্ছে করেই এ সব রটাচ্ছে। আসলে আশিসদাকে অনেকে সহ্য করতে পারে না।

তাদেরই কেউ হবে। বললেই হল, হাসপাতাল থেকে একটা কাকু আসে সাপের বিষ কিনতে? ছেলেটাকে একটা চড় মারতে ইচ্ছে করছিল। পাজি, বদমাস। জন্তু জানোয়ার নিয়ে ব্যবসা ! রোজগারের আর কোনও উপায় নেই? পরক্ষণেই সাঁঝেলির মনে হল, ইস, খুব ভুল হল। ছেলেটার হাতে কয়েকটা টাকা গুঁজে দিলেই হয়তো সাপটা ছেড়ে দিত।

একদিকে রাগ হতে লাগল সাঁঝেলির, অন্য দিকে আফশোস। এরা তো আর সাপের বিষ সায়েন্টিফিক্যালি বের করে না। নিশ্চয়ই খুব নিষ্ঠুরভাবে কাজটা করে। ইস্।

'পিপি, আমরা কিন্তু প্রায় রুবি হসপিটালের কাছাকাছি চলে এসেছি। কোথায় যাচ্ছ বলো তো?'

অর্কর কথা শুনে সম্বিত ফিরল সাঁঝেলির। ছি ছি, ছেলেটাকে গাল দিতে দিতে কোথায় চলে এসেছে। হেসে ও বলল, 'আগে বলতে পারলে না মশাই। এখন পুরো গোল চক্করটা ঘুরে আবার ব্যাক করতে হবে।'

অর্ক ঠাট্টা করল, 'সেদিন হাসপাতালে তোমায় নামিয়ে দিলাম, সঙ্গে ছিল শকুন। আজ রয়েছে পেঁচা। কী কপাল দেখ আমার।'

শুনে হো হো করে হাসতে লাগল সাঁঝেলি। তার পর হাসি থামিয়ে বলল, 'আমার কোনও ধারণা ছিল না, রিপোর্টারদের সেন্স অব হিউমার থাকে।'

'তোমার সেই শকুনটার কী খবর পিপি?'

'ভালো হয়ে গেছে। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট ওকে নিয়ে গেছে রাজাভাতখাওয়া বলে একটা জায়গায়।

ওখানে গভর্নমেন্ট একটা ব্রিডিং সেন্টার করেছে শকুনদের।'

' দেখ, হাউসিংয়ের এই পেঁচাটাকে হাওয়াই আইল্যান্ডস-এ পাঠাতে পার কী না। সিঁদুর মেখে যা কালারফুল হয়েছে, হাওয়াই আইল্যান্ডস ছাড়া আর কোথাও ওকে মানাবে না।

'সত্যি গো, মানুষের মধ্যে এত কুসংস্কার... । জান, আমাদের কলেজে জয়ন্তী আগরওয়াল বলে একটা মাড়োয়ারি মেয়ে পড়ত, থাকত বড়বাজারের দিকে, সে নাকি রোজ সকালে গরুদের জিলিপি খাওয়াত। তাতে নাকি পুণ্যি হয়।'

অর্কর সঙ্গে গল্প করতে করতেই সাঁঝেলি এক সময় গাড়িটা এনে দাঁড় করাল হাসপাতালের আউটডোরের সামনে। নেমেই উঁকি মেরে দেখল, অন্নপূর্ণা সামন্ত ভেতরে রয়েছেন। হসপিটালের ভেট সার্জেন। দেখে ও নিশ্চিন্ত হল। আউটডোরে দেখানোর জন্য আগে একটা টিকিট করতে হয়। কুড়ি টাকার একটা নোট বের করে, একজন হ্যান্ডলারকে ডেকে সাঁঝেলি বলল, 'অফিস থেকে একটা টিকিট কেটে নিয়ে এস। বলবে আমার পেশেন্ট।' তার পর পিছন ফিরে বুবাইকে বলল, 'একটু দেরি হবে ভাই। আজ অনেক পেশেন্ট। পেঁচাটাকে নিয়ে তুমি আউটডোরের ভেতরে গিয়ে বসা। আমি ততক্ষণ তোমার অর্কদাকে হসপিটালটা ঘুরিয়ে দেখাই।' ইচ্ছে করেই ও 'তোমার অর্কদা' কথাটা বলল।

আউটডোর বাড়িটাকে ডান দিকে রেখে হাঁটতে শুরু করল সাঁঝেলি। সঙ্গে অর্ক। হাসপাতাল চত্বরটা প্রায় চার একর জমির ওপর।

সবকিছু ঘুরে দেখাতে আধ ঘণ্টা সময় তো লাগবেই। হাসপাতালে যখন

ও আসে, তখন আর বাড়ি ফিরতে ইচ্ছে করে না। বাইপাস থেকে প্রায় এক-দেড় কিলোমিটার ভেতরে। শহরের কোনও কোলাহল নেই। পশুপাখিদের নিয়ে ওই জগতটা আলাদা। সাঁঝেলি মনে মনে বলল, অর্ককে বুঝিয়ে দিতে হবে, আশিসদা একাই কত বড় একটা অর্গানাইজেশন দাঁড় করিয়েছেন।

মিনিট দুয়েক হাঁটার পর অর্ককে নিয়ে ঘোড়াদের আস্তাবলের কাছে পৌঁছল সাঁঝেলি। বলল, 'এই যে ঘোড়াগুলো দেখছ, একটা সময় এরা পুলিশে ছিল। এখন রিটায়ার করেছে। বুড়ো বয়সে প্রত্যেকে এরা পেনশন পাচ্ছে। আমৃত্যু আমাদের এখানেই থাকবে। দেখ, কী রকম খেলা করছে? জান, এটা আমাদের কাছে একটা বড় ধরনের ভিকট্রি। এর পর থেকে সরকারি কাজ করে এমন সব অ্যানিম্যালকেই পেনশন দিতে হবে।'

অর্ক বলল, ' কিন্তু ওরা জানবে কী করে, জাস্টিস আদায় করার জন্য এখানে একজন অ্যানিম্যাল ল'ইয়ার আছেন?'

'আবার তুমি ঠাট্টা করছ? আশিসদাকে নিয়ে ইয়ার্কি আমার ভালো লাগে না।'

' তিনি কোথায়? এখনও তো এলেন না। আজ কিন্তু তুমি আমায় খাওয়াচ্ছ।'

' আরে, এত দেরি হওয়ার তো কথা নয়। দাঁড়াও, একবার ফোন করে দেখি।' রাস্তায় দাঁড়িয়ে মোবাইলে আশিসদাকে ধরার চেষ্টা করতে লাগল সাঁঝেলি। বারবারই আউট অব রিচ বলছে। মোবাইল সেট হাতে রেখে অর্ককে ও বলল, 'ধরতে পারছি না। গেল কোথায় মানুষটা? দাঁড়াও, বাড়িতে একবার ফোন করে দেখি। বাড়ি চলে গেল না তো?'

আশিসদার বাড়িতে ফোন করেতেই সাঁঝেলি বুঝতে পারল, ও প্রান্তে ধরেছেন পিসিমা। নিজের পরিচয় দিয়ে ও জিজ্ঞেস করল, 'আশিসদা এখন কোথায়, বলতে পারেন?'

পিসিমা বললেন, 'সকালবেলায় তো ডাক্তারের কাছে গেল। ঠাকুরপুকুরের দিকে কোন এক হাসপাতালে। কয়েকদিন ধরেই

দেখছি, শরীরটা ওর বেশ খারাপ। কী হয়েছে, আমায় তো কিছু বলে না। জিজ্ঞেস করলে আমার কথা হেসে উড়িয়ে দেয়।'

আশিসদা হাসপাতালে গেছে ? তবে যে বলল, রাইটার্সে যাবে। হাসপাতালে যাওয়ার কথা আশিসদা

কাল কেন, সাঁঝেলির মাথায় ঢুকল না। ঠাকুরপুকুরের দিকেই বা কোন হাসপাতাল আছে? আজকাল শ্য আশিসদার সঙ্গে রোজ দেখা হয় না সাঁঝেলির। ফোনেই বেশি কথাবার্তা হয়। গলা শুনে ইদানীং কখনও মনে হয়নি, আশিসদা অসুস্থ? কী হয়েছে আজ জিজ্ঞেস করতেই হবে। ভেবে নিয়ে সাঁঝেলি ল, 'ঠিক আছে পিসিমা। পরে আবার ফোন করব।'

তার পরই ঘুরে ও অর্ককে বলল 'আশিসদাকে পাচ্ছি না। চল, তোমায় ডগিজ কোয়ার্টারস দেখাই।

আমাদের এখানে কুকুরদের জন্য এয়ারকন্ডিশন্ড রুমও আছে। দূর থেকে না কুকুরদের ডাক কানে আসছে। অর্ক জিজ্ঞেস করল, 'এগুলো কি স্ট্রিট্র ডগ? রাস্তা থেকে ধরে আনা?'

'না, না। এটা ক্রেশ বা গেস্ট হাউসও বলতে পার। লোকে কুকুর রেখে যায়। ধর, স্বামী-স্ত্রী বাইরে কোথাও বেড়াতে যাচ্ছে, পেট ডগ দেখাশুনো করার লোক নেই বাড়িতে। আমাদের কাছে দিয়ে যায়। আমরা কুকুরদের আদর যত্ন করি। তার বিনিময়ে একটা চার্জ নিই। তবে টানা দু'মাসের বেশি কোনও কুকুরকে আমরা রাখি না। প্রায় তিরিশটা রুম আছে কুকুরের। এখন সব ভর্তি।'

নানা প্রজাতির কুকুর বড় বড় খাঁচার মধ্যে। হ্যান্ডলাররা খাবার দিচ্ছে। তাই এত চেল্লামেল্লি। সেদিকে তাকিয়ে অর্ক বলল, 'একটা প্রশ্ন করব তোমাকে?'

'কী, বল।'

'কুকুর যখন খায়, তখন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খায়। কিন্তু বেড়াল বসে বসে খায় কেন?'

প্রশ্নটা শুনে একগাল হেসে সাঁঝেলি বলল, 'তুমি তো সাগ্নিকের মতো প্রশ্ন করছ। মানে... আমার এক কাজিন। মাত্তর বারো বছর তার বয়স। ও খুব এই ধরনের প্রশ্ন করে। এটা পশুপ্রেমের প্রথম লক্ষণ। যাক সে কথা। তোমার প্রশ্নের উত্তরটা দিই। কুকুর হল দলবদ্ধ প্রাণী। খাওয়ার জন্য বনে ওরা শিকার করত দল বেঁধে। উচ্ছিষ্ট জোগাড় করত দল বেঁধে। খেতও এক সঙ্গে। সেই সময় নিজেদের মধ্যে কামড়াকামড়ি বা কাড়াকাড়ি না-করলে ভাগ পাওয়া কঠিন। তাই দাঁড়িয়ে খাওয়া ওদের অভ্যেস। ওরা এমন তাড়াহুড়ো করে খায়, যেন শেষবারের মতো খেয়ে নিচ্ছে। কিন্তু বিড়াল জাতীয় প্রাণীর, যেমন বাঘ, সিংহর স্বভাব অন্য রকমের। ওরা শিকার করে খায়। সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু খায় না। খাবারটাকে ওরা অনেক সময় ফেলে রাখে। তার পর ধীরে সুস্থে বসে আধশোয়া হয়ে যায়। কী উত্তরটা পাওয়া গেল? এর বেশি কিছু জানতে হলে মশাই, আমাকে কিন্তু আইসক্রিম খাওয়াতে হবে।'

হ্যান্ডলারদের সঙ্গে টুকটাক কথা সেরে নিল সাঁঝেলি। তার পর অর্ককে বলল, 'চল, তোমাকে একটা মাস্তান ষাঁড় দেখাই।'

'এখানে গরু-মোষও রাখ নাকি তোমরা?'

'অসুস্থ হয়ে কেউ এলে, রাখি। তার ট্রিটমেন্ট হয়। কিন্তু যে ষাঁড়টার কথা বলছি, ওই দেখ বসে আছে। [illegible] আমরা এনেছি সহবত শেখানোর জন্য। রাজপুর বাজারের কাছে চরে বেড়াত। হঠাৎ [illegible] এক [illegible] লোককে হাসপাতালে পাঠিয়েছে। একে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট এখানে দিয়ে [illegible] আমাদের [illegible] অ্যানিম্যাল সাইকোলজিস্ট আছেন। মানে ইথোলজিস্ট। তিনি এই ষাঁড়টার [illegible] প্যাটার্ন [illegible] করে যাচ্ছেন। গত একমাস অবশ্য এ ভদ্রভাবেই আছে।'

[illegible] হাসপাতালের [illegible] ক্যাটস কর্নার, এক্স রে রুম, অপারেশন

থিয়েটার, মেডিক্যাল রুম, ডক্টরস

[illegible] দেখাতেই ঘণ্টাখানেক সময় লেগে গেল সাঁঝেলির। তার পর হাঁটতে হাঁটতে ফের আউটডোরের কাছে চলে এল। প্রায় সাড়ে বারোটা বাজে। এতক্ষণে নিশ্চয়ই আশিসদার এসে যাওয়া উচিত ছিল। এল না কেন? যদি না আসে, তা হলে অর্কর কাছে মুখ থাকবে না। মনে মনে অভিমানও হতে লাগল সাঁঝেলির। ঝড় হোক, জল হোক, রোজ বেলা দশটার সময় এখানে হাজির হবেই আশিসদা। কোনওদিন রুটিন বদলায় না। বাইরে যত কাজই থাকুক, আগে পেশেন্টদের একবার অন্তত নিজের চোখে দেখে যায়। কী এমন হল, আজ আশিসদা ওদের এড়িয়ে গেল? মনে একটু অস্বস্তি

নিয়েই ও ভেতরে ঢুকল ভেট সার্জেনের সঙ্গে কথা বলার জন্য।

pathagar.net

আশিস ভটচাযের জন্য তাজ বেঙ্গলের চাইনিজ রেস্তোরাঁয় বসে অপেক্ষা করছেন প্রোজ্জ্বল মিত্র। উল্টো দিকের চেয়ারে বসে সাঁঝেলি ।

বেলা ঠিক একটায় আসার কথা আশিস ভটচাযের। প্রায় দু'টো বাজতে চলল, এখনও তাঁর দেখা নেই। সকালের ফ্লাইটে সুমতি কলকাতায় এসেছে। উঠেছে হোটেল হিন্দুস্থানে। প্রোজ্জ্বলের সেখানে যাওয়ার কথা বেলা তিনটের মধ্যে। সারা শরীর উদগ্র কামনায় ছটফট করছে। আর মিনিট দশের মধ্যে আশিস ভটচায না এলে, ধৈর্য হারিয়ে ফেলবেন তিনি। এই এনজিও টেনজিও যারা চালায়, তাদের ওপর কোনও আস্থা নেই প্রোজ্জ্বলের। এদের ধারণাই নেই, টাইম ইজ মানি। শালা, উপযাচক হয়ে তিনি কিছু অর্থ সাহায্য করতে চান। সেটা নেওয়ার ব্যাপারেও কী আশ্চর্য রকমের গড়িমসি। আর অপেক্ষা করা যায়?

আশিস ভটচায কী ধরনের মাল, সেটা রথীন সর সেদিন বলে দিয়েছেন। সেভাবেই হ্যান্ডেল করতে হবে লোকটাকে। প্রোজ্জ্বল মনে মনে ঠিকই করে এসেছেন, লোকটাকে প্রচুর টাকার লোভ দেখাবেন। একদিনে রাজাও লোকটার সম্পর্কে কিছু খবর এনে দিয়েছে। পাইকপাড়ায় থাকে খুব দীন

দরিদ্র সেজে। কিন্তু জনাইয়ের কাছে নাকি বিরাট একটা খামার বাড়ি করেছে। চরিত্রও সুবিধের নয়। [illegible]া বলল, শিবানী দত্ত নামে এক মহিলাকে নাকি প্রেগনেন্ট করে দিয়েছিল। সেই বিধবা মহিলা [illegible]ন প্রচুর সম্পত্তির মালকিন। ওদের অর্গনাইজেশনকে নানা ভাবে সাহায্যও করতেন। ওঁর [illegible]বাজারের বাড়িতে তখন আশিস ভটচাযের অবারিত দ্বার। এই শিবানী দত্ত নাকি আত্মহত্যা করেন। [illegible]ক পরে জানা যায়, তিনি নাকি সম্পত্তির পুরোটাই কেয়ার ফর অ্যানিম্যাল'স-কে দান করে গেছেন। [illegible] নিশ্চয়ই এ সব কথা জানে না। সত্যি, মেয়েটা একটা হাবাগোবা টাইপের।

সময় কাটানো এবং সেই সঙ্গে বোনকে বাজিয়ে দেখার জন্য প্রোজ্জ্বল বললেন 'হ্যাঁরে লিলি,

শিবানী দত্ত বলে কাউকে তুই চিনতিস?'

মেনু কার্ড থেকে মুখ তুলে লিলি বলল, 'ভালো করে চিনতাম। আমাদের অর্গানাইজেশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন। রঞ্জিত মল্লিকের সঙ্গে একটা ছবিতে অ্যাক্টিংও করেছিলেন। ওঁর হাসব্যান্ড ধীরেন দত্ত ছিলেন নামকরা প্রোডিউসার। দু'জনের বয়সের অনেক তফাত ছিল। ভদ্রলোক যখন মারা যান, তখন শিবানীদির বয়স পঁয়ত্রিশ। কেন গো?'

'শিবানী দত্ত নাকি সুইসাইড করেছিলেন?'

' বাজে কথা। আমি আশিসদার মুখে আসল কারণটা শুনেছি। শিবানীদির ভাসুরপোরা সম্পত্তি হাতিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছিল। উনি তা হতে দেননি। আশিসদার প্রেমে পড়েছিলেন। বিয়ে করতেও চান। কিন্তু আশিসদা রাজি হননি। জান, ভাইপোদের ওপর রাগ করেই শিবানীদি ওঁর পুরো সম্পত্তি আমাদের অর্গানাইজেশনকে দান করে যান। আশিসদা কিন্তু তখন বারণ করেছিল।'

'কীভাবে উনি মারা যান, তুই জানিস?'

'শুনেছি, ডিপ্রেশনে ভুগছিলেন। রান্নার গ্যাস ওভেন থেকে আগুন লেগে উনি পুড়ে যান। নার্সিং হোমে নিয়ে গিয়ে আশিসদা বাঁচানোর চেষ্টা করেছিল, পারেনি।'

শুনতে শুনতে প্রোজ্জ্বল ভাবছেন, আশিস ভটাচায লোকটা কত খলিফা। পুরো ঘটনাটা কত বিশ্বাসজনকভাবে গুলে খাইয়েছে বোনকে। আসল কারণটা বললে, কিছুতেই এখন বিশ্বাস করবে না লিলি। আশিস খচ্চরটা বোনকে কতটা ফাঁদে ফেলেছে, সেটা জেনে রাখা বোধ হয় দরকার। তাই জিজ্ঞেস করলেন, 'তোদের এই অর্গানাইজেশনটা কতদিনের রে?

সাঁঝেলি বলল। 'অর্গানাইজেশনটা অনেক দিনের, আমি সঠিক জানি না। আগে অন্য নাম ছিল। শুনেছি শিবানীদিরা আসার পর

নাম বদলে কেয়ার ফর অ্যানিম্যাল'স রাখা হয়। আশিসদার সঙ্গে আমার আলাপ হয় একটা সিম্পোজিয়ামে। বছর দুয়েক আগে।'

'তুই কি কোনও পোস্ট-এ আছিস?'

'না। আমি ইচ্ছে করেই পোস্ট নিইনি। কেননা, আমার খুব ইচ্ছে, নিজে একটা এনজিও করব।'

' বেশ তো, কর না তুই। আমি তোকে জায়গা দেব। রথীনদাকে বললেই দু'তিন একর জমি তোকে দিয়ে দেবে। তবে কাছাকাছি তো হবে না, তোকে যেতে হবে কামালগাজির ওই দিকে। বলিস তো, আমি কালই কথা বলব।'

'এখন না দাদা, থাক।'

'হ্যারে বোন, তুই অর্ক স্যান্যাল বলে কোনও রিপোর্টারকে চিনিস?'

'ভালো করে চিনি। আমার খুবই ভালো বন্ধু। হঠাৎ ওর কথা জানতে চাইছ?'

'আমার সঙ্গে ছেলেটার পরিচয় করিয়ে দিতে পারবি? নিয়ে আসতে পারবি আমার অফিসে।'

' কেন পারব না? তুমি যবে বলবে, নিয়ে যাব। ওর কথা তোমাকে... ' এটুকু বলেই সাঁঝেলি হঠাৎ উৎফুল্ল, 'ওই তো আশিসদা এসে গেছে। দাঁড়াও, আমি ডাকছি।'

হাত তুলে লিলি কাউকে ইঙ্গিত করছে। পিছন ফিরে প্রোজ্জ্বল দেখলেন, সাদা হাফ হাতা শার্ট, ধুতি আর চশমা পরা একজন মাঝবয়সী লোক হাসিমুখে এসে দাঁড়াল। 'মাফ চাইছি মি মিত্র। অনেক লেট হয়ে গেল। আসলে জু গার্ডেন অথরিটি অব ইন্ডিয়ার ডিরেক্টরের সঙ্গে একটা মিটিং ছিল সোনার বাংলায়। উনি এত ব্যস্ত, দেখা পেতেই অনেকটা সময় চলে গেল।'

অজুহাতটা শুনে মনে মনে চটলেন প্রোজ্জ্বল। রথীন সরের পার্টি অফিসে বসে সেদিন তিনি চারপাশে বাঘ, সিংহ, নেকড়েদের দেখতে পেয়েছিলেন। তার পর থেকে প্রায়ই মানুষের মধ্যে কোনও না

কোনও জন্তুর আদল দেখতে পাচ্ছেন তিনি। আশিস ভটচাযকে দেখে মনে মনে তিনি বললেন, শালা আধবুড়ো ভাম। একজন সামান্য সরকারি অফিসারের জন্য আমাকে এক ঘণ্টার বেশি বসিয়ে রেখেছ। পরে তোমাকে মাপব। মনের ভাব অবশ্য মুখে প্রকাশ করলেন না প্রোজ্জ্বল। বললেন, 'ডাজন্ট ম্যাটার। আপনারা সোশ্যাল ওয়ার্কার। দেরি হতেই পারে। কী খাবেন, বলুন। আগে অর্ডারটা দিয়ে রাখা যাক।'

আশিস ভটাচায বললেন, 'আমি? মাত্র একটা স্যুপ। তার বেশি কিছু না। আপনার বোন জানে, আমি কী খাই।'

বাস্টার্ড, ইয়ার্কি মারা হচ্ছে? মাত্র একটা স্যুপ। নিশ্চয়ই কোথাও থেকে ভালো মতো সাঁটিয়ে এসেছে। সেই কারণেই এত দেরি করে এল। মনে মনে এটা ভাবলেও, সাঁঝেলির উদ্দেশ্যে প্রোজ্জ্বল বললেন 'অডার্রটা তুই-ই করে দে বোন। আমরা কাজের কথা শুরু করে দিই। আমাকে আবার এখুনি অফিসে ফিরতে হবে। হ্যাঁ, বলুন আশিসবাবু, আপনার অর্গানাইজেশনের জন্য আমি কী করতে পারি।'

' আপনার প্রোপোজালটা ট্রাস্টি কমিটির মিটিংয়ে আমরা একপ্রস্থ আলোচনা করেছি মিঃ মিত্র। সাঁঝেলি অবশ্য সেই মিটিংয়ে ছিল না। তাই ও ডিসিশনটা জানে না। আপনি যদি একটা বিল্ডিং বানিয়ে দেন, তা হলে আরও উইং আমরা খুলতে পারি।'

লায়ার, একটু আগে লিলি বলল, ও কোনও পোস্ট -এ নেই। এর মধ্যেই ট্রাস্টি কমিটির মেম্বার হয়ে গেল? বললেই হল, ও মিটিংয়ে ছিলনা? অর্গানাইজেশন তুই কীভাবে চালাস, এই বার বুঝতে পারছি। এক ধাক্কায় আপনি ছেড়ে তুইয়ে নেমে এলেন প্রোজ্জ্বল। কিন্তু মনের ভাব চেপে রেখে বললেন, ' কত টাকা খরচা হতে পারে

বলুন তো? লাখ কুড়ি?'

'মনে হয় না। অনেক বেশি লাগবে। জাপানের হোক্কাইডোতে একটা অ্যানিম্যাল কেয়ার সেন্টার দেখে এসেছিলাম। ভাবতে পারবেন না, কী অ্যারেঞ্জমেন্ট। ওই রকম একটা কিছু করে যেতে না পারলে জীবনটাই বৃথা মিঃ মিত্র।'

ভাম নয়, এ শালা খচ্চর। তোর বাপের টাকা নাকি? মাথার ঘাম পায়ে ফেলে কোনওদিন রোজগার করেছিস? আমাকে হোক্কাইডো দেখাচ্ছিস? তুই জানিসও না, তোকে হুড়কো দেওয়ার জন্য রথীন সর তৈরি হচ্ছে। কিন্তু দ্রুত নিজেকে সামলে নিয়ে প্রোজ্জ্বল বললেন, 'বেশ তো, করুন না। কী করতে চান, আমায় বলুন। মিত্র কনস্ট্রাকশন করে দেবে। ভালো কিছু কাজ করতে চাই। বিশেষ করে, যাদের কথা কেউ ভাবে না, তাদের জন্য। বদলে আমি কিন্তু কিছু চাই না।'

বলেই আশিস ভটচাযের মুখের দিকে তাকালেন প্রোজ্জ্বল। অসম্ভব ধূর্ত লোকটা। চোখে চোখ রেখে কথা বলছে না। প্রতি কথায় সাক্ষী রাখছে বোনকে। শালা হারামি, রথীন সরের থেকেও দু'গুণ বেশি খচ্চর। তবু রথীন সর কিছু নিলে কিছু দেয়। এ তো শুধু হাত পেতে আছে। রথীন সর যা চাইছিল, একে দিয়ে তা হবে? মানে লাগ্যাতার চিড়িয়াখানার বিরুদ্ধে ক্যাম্পেন? এমন যেন না হয়, টাকাগুলো গলে গেল, অথচ কাজের কাজ কিছু হল না।

তিনজনের জন্য স্যুপ এসে গেছে। গরম গরম ধোঁয়া উঠছে। নিজের ব্যোল টেনে নিয়ে লিলি এ বার বলল 'দাদা, চিড়িয়াখানা নিয়ে আমাদের কিছু প্রোগ্রাম আছে। কিছু হেল্প করা যাবে?'

'প্রোগ্রাম মানে? কী রকম টাকার ইনভলভমেন্ট বল তো?'

'খুব বেশি না। আপাতত লাখ খানেক। পেট অ্যানিম্যাল নিয়ে বাচ্চাদের মধ্যে একটা অ্যাওয়ারনেস তৈরি করতে চাই বুঝলে। তার জন্য স্কুলে স্কুলে গিয়ে ক্যাম্পেন করা দরকার। ডিবেট, কম্পিটিশন, ওয়ার্কশপ, সিট অ্যান্ড ড্র, ক্যাপশন কনটেস্ট অনেক কিছু করা যায়।'

তাতে আমার কি লাভ হবে? নিজের মনে প্রশ্নটা তুললেন প্রোজ্জ্বল। বোনটার কোনও বুদ্ধি শুদ্ধি নেই। সঙ্গে সঙ্গে তিনি বলটা ঠেলে দিলেন আশিস ভটচাযের কোর্টে। 'আপনি কী বলেন? করা যায় ? মানে করলে কিছু লাভ হবে আপনাদের?'

'নিশ্চয়ই করা যায়। আমরা অবশ্য ইতিমধ্যেই দু'একবার ক্যাম্পেন করেছি বাচ্চাদের নিয়ে। এই তো ছাব্বিশ জানুয়ারি, রেড রোডে রিপাবলিক প্যারেডের দিন সকালবেলায় ট্যাবলো বের করেছিলাম। একেকটা বাচ্চাকে একেকটা অ্যানিম্যালের মুখোশ পরিয়ে। আর ওদের হাতে ক্যাপশন দিয়েছিলাম, 'আমাদের বাঁচান', 'আমরাও ঈশ্বরের সৃষ্টি', এই রকম আর কী। চিড়িয়াখানার গেটের বাইরেও একদিন ক্যাম্পেন করেছি স্কুল স্টুডেন্টদের নিয়ে পঁচিশে ডিসেম্বর। খুব ইমপ্যাক্ট হয়েছিল।'

চিড়িয়াখানার কথা লোকটা নিজের মুখে তুলুক, মনে মনে এটাই চাইছিলেন প্রোজ্জ্বল। সময় না দিয়ে তিনি বললেন, 'আমাদের জু নিয়ে কিছু ভাবছেন না মিঃ ভটচায? যে ভাবে অ্যানিম্যালদের রাখা হয়েছে, সেটা তো ক্রাইম। বোন সেদিন বলছিল, চিড়িয়াখানার হালত নাকি খুব খারাপ হয়ে গেছে।'

'সাঁঝেলি ঠিকই বলেছে। কিন্তু কে বলল, আমরা এ নিয়ে ভাবছি না? যা করার তো, আমরাই করছি। মাঝে মাঝে গিয়ে বিক্ষোভ দেখাচ্ছি। চিঠি দিয়ে প্রতিবাদ করছি। আজই তো জু অথরিটির ডিরেক্টরকে অব্যবস্থার কথা জানিয়ে এলাম। উনি কী বললেন জানেন? কলকাতা জু আমাদের গাইড লাইন মানছে না। ওরা

যদি এ ভাবে চালিয়ে যায়, তা হলে আমরা কড়া অ্যাকশন নেব। গ্র্যান্ট বন্ধ করে দেব। তার মানেটা কী জানেন? ওই গ্র্যান্ট আটকে গেলে এখানকার জু বন্ধ করে দিতে হবে।'

কথাবার্তা এ বার ঠিক লাইনে এগোচ্ছে। একটা ইনফর্মেশন পাওয়া গেল। জু অথরিটি যদি টাকা না দেয়, তা হলে জু বন্ধ হয়ে যাবে। কবে বন্ধ করবে গ্র্যান্ট? চিড়িয়াখানার প্রসঙ্গ চালিয়ে যাওয়ার জন্য তিনি বললেন,' এই ক'দিন আগে ইতালি থেকে আমার এক বিজনেস পার্টনার এখানে এসেছিলেন। তিনি যে এত অ্যানিম্যাল লাভার, তা জানতাম না। আমাদের জু দেখতে গেছিলেন। কী রকম লাগল, জিজ্ঞেস করায় যাচ্ছেতাই বললেন আমাকে।'

'মিঃ মিত্র, রিসেন্টলি কি আপনি চিড়িয়াখানায় গেছেন?'

আর কিছুদিন পর তো ওখানেই পড়ে থাকব। মনে মনে এ কথা ভেবে প্রোজ্জ্বল বললেন, 'না মশাই, সে সুযোগ হয়নি। কেন বলুন তো?'

' কী যে শ্যাবি লুকিং, ভাবতে পারবেন না। আরে , জন্তুদের ঠিকঠাক রাখতে পারিস না পারিস ,

জায়গাটা তো একটু দেখনদার করে রাখবি। কত বছর রঙ হয়নি জানেন? আমি বলে বলে এই রঙ করার কাজ শুরু করিয়েছি। চিড়িয়াখানার সামনের গেটটার দিকে ভালো করে কোনও দিন নজর করেছেন? বাঘ-হরিণের ছবি, তার সঙ্গে বিরাট বিরাট দু'তিনটে কোম্পানির বিজ্ঞাপন। কেন এটা হবে? ভারতের আর কোনও জু-তে কিন্তু আপনি দেখতে পাবেন না।'

প্রোজ্জ্বল বললেন, ' আপনারা জনমত তৈরি করছেন না কেন?'

' সেজন্য তো টাকার দরকার। আপনাদের মতো লোকেরা যদি পিছনে থাকেন, তা হলে আমরা লড়তে পারি ।'

না, না খচ্চর নয়, এ শালা শকুন। নজর ঠিক কাঁচা টাকায়। যে টাকার কোনওদিন হিসেব দিতে হবে না। আন্দোলনে কত টাকা খরচ হল, কে তার খোঁজ রাখবে পরে? ফের ঠিক নিজের লাইনে নিয়ে যাচ্ছে। বুঝেও প্রোজ্জ্বল বললেন, 'বললাম তো, আমি আছি। আপনারা লড়ুন।'

'আমার তো মনে হয়, চিড়িয়াখানাটা আলিপুরে রাখাই উচিত না। বণ্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন বদলে গেছে। বলা হচ্ছে, বণ্যপ্রাণীদের জন্য স্পেস দাও। যাতে ন্যাচারাল কন্ডিশনে থাকতে পারে। আলিপুরে স্পেস কোথায়? বাঘ-সিংহের খাঁচাগুলো দেখেছেন? নড়াচড়ার জায়গা নেই। ওরা দুপুরবেলাতেও ঝিমোয়। অন্য দিকে ভুবনেশ্বরের নন্দনকাননে যান। দেখবেন, ওরা ওপেন স্পেস দিয়েছে বাঘ-সিংহদের জন্য। তাই জন্তুগুলোর সাইজও বড় বড়।'

ভালো, খুব ভালো। এই তে ঠিক লাইনে কথা বলছে আশিস ভটচায। উসকে দেওয়ার জন্যই প্রোজ্জ্বল বললেন, 'কী বলছেন আপনি? আলিপুর থেকে জু যদি সরিয়ে নিতে হয়, তা হলে যাবেটা কোথায়? এত বড় জায়গা কলকাতার আশপাশে আর আছে?'

' আছে মশাই, আছে। সেই সাজেশনটাই দিয়ে এলাম সেন্ট্রাল জু অথরিটির ডিরেক্টরকে। ঠাকুরপুকুরের ও দিকে প্রায় সোয়াশো একর জমি আছে। এই চিড়িয়াখানার তিনগুণ। শুনে ভদ্রলোক ৎসাহ দেখালেন। কালই ওকে সেই জায়গাটা দেখাতে নিয়ে যাচ্ছি।'বলে কী লোকটা! চিড়িয়াখানা কুরপুকুরে নিয়ে যাবে? যদি যায়, তা হলে অবশ্য মন্দ হবে না। ভগবানপুরে যা গণ্ডগোল পাকিয়েছে, বে ঠাণ্ডা হবে কে জানে? অন্য কোথাও যদি জু চলে যায়, তা হলে রথীন সরের হাত থেকে অন্তত চা যাবে। আরও খবর নেওয়ার জন্য প্রোজ্জ্বল বললেন, 'অতদূরে লোকে যাবে চিড়িয়াখানা

দেখতে? ত দিনের অভ্যেস।'

আশিস বললেন, 'দূর কোথায়? এই তো ঠাকুরপুকুর বাজারের দু'তিন কিলোমিটার পশ্চিমে। লতা শিলিগুড়ি হাইওয়ে হয়ে গেলে দেখবেন, ওটা কোনও ডিসট্যান্সই না। তখন চার দিক থেকে গাকে যেতে পারবে। এমনিতে কলকাতার খুব কম লোকই চিড়িয়াখানা দেখতে যায়। ভিজিটরদের

ত্তর ভাগই তো দূর জেলা থেকে আসে। আলিপুরে আসতে পারলে,ওরা ঠাকুরপুকুরেও যেতে পারবে।'

প্রসঙ্গটা অন্য দিকে গড়াচ্ছে। প্রোজ্জ্বল তাই বললেন, 'ঠাকুরপুকুরের জায়গাটা কার কন্ট্রোলে াছে আশিসবাবু?'

'নিবারণ নস্কর। নাম শুনেছেন বোধহয়? পার্টির উঠতি নেতা। রথীন সরের দিন প্রায় শেষ। পার্টি ই নিবারণ নস্করকেই এবার পার্লামেন্ট ইলেকশনে দাঁড় করাচ্ছে।'

'জু শিফট হয়ে গেলে আলিপুরের ওই জায়গাটার কী হবে আশিসবাবু?'

' আমি তো সাজেশান দিয়েছি, ওখানে তখন একটা পাখিরালয় করার। মানে, ওখানে শুধু পাখি খা হবে। মাইগ্রেটেড বার্ড এখন খুব বেশি আসে না। ওরা ডেস্টিনেশন বদলে এখন নেমে যাচ্ছে তরাগাছির ঝিলে। আমি বলেছি, মাইগ্রেটেড বার্ডদের জন্য একটা ওপেন স্পেস রাখা দরকার। রকার হলে, ওবা যাতে ফের চিড়িয়াখানায় আসে, তার একটা ব্যবস্থা রাখতেই হবে।'

শুনে মারাত্মক চটে গেলেন প্রোজ্জ্বল। খচ্চরটা আমি আমি করে কথা বলছে। যেন ও-ই ফরেস্ট ;পার্টমেন্টের মিনিস্টার। টেবলে খাবারের প্লেট সাজানো হচ্ছে। খাবারে মন দেবেন কী, প্রোজ্জ্বলের

ন হল উঠে গিয়ে আশিস ভটচাযের গলা টিপে ধরেন।

দীপিকা সেনের বাড়িতে যাওয়ার জন্য অফিস থেকে বেরোচ্ছিল অর্ক। পিছন থেকে ডাকলেন রমাপদদা, 'এই শোন, তোকেই আমি খুঁজছিলাম। কোথায় থাকিস আজকাল বল তো?'

রমাপদদা কাগজের অ্যাসিস্ট্যান্ট এডিটর। এখন দেখেন বই রিভিউয়ের বিভাগটা। ফ্রি ল্যান্স করার সময় রমাপদদার পাতায় অনেক লিখেছে অর্ক। বলা উচিত, তখন রমাপদদাই ডেকে ডেকে লেখাতেন। চাকরি পাওয়ার পর, খবরের পিছনে ছুটতে ছুটতে এখন অন্য কিছু আর লেখার সময় পায় না অর্ক। লিফটের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে ও বলল, 'একটু ব্যস্ত ছিলাম। খুঁজছিলেন কেন রমাপদদা?'

' তোর জন্য একটা বই রেখে দিয়েছিলাম। রিভিউ করে দিতে হবে। খুব তাড়াতাড়ি। পারলে কাল-পরশুর ভেতর। এই শনিবারের পাতায় যাবে। ' বলেই ফোলিও ব্যাগ থেকে বইটা খুঁজতে লাগলেন রমাপদদা।

হাতে দু'তিনটে বড় খবর। চেজ করতে হবে। সময় কম, তাই অর্ক বলল, 'এত তাড়াতাড়ি? নেক্সট

উইকে দিলে হবে না।?'

বইটা বের করে এগিয়ে দিয়ে রমাপদদা বললেন, 'না রে। লিখেছে আমারই এক বন্ধু। ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে চাকরি করে। বুঝছিস তো, ওরা আমাকে কত হেল্প করে। আমি চলে যাওয়ার আগে রিভিউটা করে দিতে চাই।'

'চলে যাবেন মানে?'

'আমি তো সামনের মাসেই রিটায়ার করে যাচ্ছি। অনেক বছর এই আপিসে হয়ে গেল। লাস্ট রিকোয়েস্টটা অন্তত রাখ।'

কী বই তা দেখার জন্য অর্ক মলাটের দিকে নজর দিল। রামব্রহ্ম স্যান্যাল: কলকাতা চিড়িয়াখানার প্রাণপুরুষ। বইয়ের নামটা দেখেই ও চমকে উঠল। রামব্রহ্ম সান্যাল নামটা আগেও কোথাও শুনেছে। কার

pathagar.net

কাছে অর্কর তা মনে নেই। ও বলল, 'এ কী, এই বইটা আমায় দিচ্ছেন কেন?'

'আরে , তুই ভালো পারবি। চিড়িয়াখানা সম্পর্কে তোর মতো এক্সপার্ট এখন ক'জন আছে? কত ভালো ভালো স্টোরি করলি বল তো এ ক'দিনে?'

শুনে হাসি পেয়ে গেল অর্কর। ও চিড়িয়াখানা বিশেষজ্ঞ হয়ে গেল? হেসে বলল, 'আপনি পারেনও বটে রমাপদদা।'

অফিস থেকে বেরিয়ে গাড়িতে উঠে, হাত ঘড়ির দিতে তাকিয়ে আঁতকে উঠল অর্ক। সাড়ে সাতটা বাজে। মাই গড, দীপিকাদি কী ভাবছেন কে জানে? আসলে নেমন্তন্নটা দু'দিন আগেকার। কিন্তু শেষ মুহূর্তে উনিই ক্যানসেল করে দেন, সি বি আই অফিসার ওর পিসতুতো ভাই সেদিন ডিনারে থাকতে

পারবেন না বলে। আজ উনি আসছেন। অর্ক লাফ মেরে অফিস থেকে বেরোবার সময় ভেবে নিল কোন রাস্তা দিয়ে গেলে তাড়াতাড়ি পাম অ্যাভেনিউ পৌঁছতে পারবে। কপাল ভালো থাকলে আধ ঘণ্টা, না হলে আরও বেশি। গাড়িতে উঠে ও হাতের বইটা পিছনের সিটে ফেলে দিল। ঠিক করল,

পাতলা বইটা আজ রাতেই পড়ে ফেলবে। রামব্রহ্ম স্যান্যাল কে ছিলেন জানতে হবে। কাল অফিসে গিয়েই লেখাটা ও তৈরি করে দেবে। রমাপদদা ওর জন্য একটা সময় অনেক করেছেন। এই সব পুরনো লোক চলে গেলে কাগজের কী হবে? চিন্তাটা অবশ্য ও দূরে সরিয়ে রাখল স্টিয়ারিংয়ে হাত দেওয়ার পর। এতদিন কাগজ ছাড়া

আর কিছুই অর্ক ভাবত না। এখন বুঝতে পারছে, কাগজের বাইরেও একটা জীবন আছে। সাঁঝেলির সঙ্গে দেখা হওয়ার পর থেকে জীবনের একটা অন্য মানে খুঁজে পাচ্ছে অর্ক। সাঁঝেলির সঙ্গে কথা বলতে ওর ভালো লাগে, সময় কাটাতে ভালো লাগছে। ভ্যালেন্টাইন্স ডে-র সারাটা দিন সত্যিই অর্কর খুব সুন্দর কেটেছিল। সেদিন ও ঠিকই আন্দাজ করেছিল, আশিস ভটচায ওর মুখোমুখি হবেন না। সাংবাদিক বলে ওকে অ্যাভয়েড করবেন। ঠিক তাই হল। বাজি হারার জন্য লাঞ্চ খাওয়াতে হয়ে- ছিল সাঁঝেলিকে।

গোবিন্দপুরের হসপিটাল থেকে বেরিয়ে, সেদিন লাঞ্চের জন্য সাঁঝেলি ওকে নিয়ে গিয়েছিল কান্ট্রি ক্লাবে। বাইপাসের ধারে যে এত সুন্দর একটা রিসর্ট আছে, অর্ক জানতই না। লাগোয়া বিরাট ঝিল, অনেকটা লেক ক্লাবের মতো। আছে বোটিং করার সুযোগও। সেদিন ক্লাবে ওদেরই বয়সী প্রচুর যুবক-যুবতী নিভৃতে সময় কাটানোর জন্য ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। অর্ক চমকটা দিয়েছিল, বোটিং করার সময়, ঝিলের মাঝখানে গিয়ে। মাথার ওপর ঝকঝকে সূর্য। ঝিলের ঢেউয়ে টুকরো টুকরো হয়ে দুলছে। বোটে উঠে প্যাডেল করতে করতে ক্লান্ত হয়ে সাঁঝেলি 'আর পারছি না' বলে তখন হাসছিল।

ওর দু'পাশের গালে ঘামের বিন্দু, সুন্দর মুখটার দিকে তাকিয়ে অর্ক আর পলক ফেলতে পারছিল না। 'কী হল, তাকিয়ে আছ কেন'

বলে সাঁঝেলি হঠাৎ মুখ নিচু করে ফেলেছিল। বোধহয় চোখের ভাষা পড়ে নিতে পেরেছিল। সেটা বুঝে তখনই মনের কথাটা বলে ফেলে অর্ক। আগে থেকে তৈরি হয়ে গেছিল। পকেট থেকে হিরের আংটি বের করে সাঁঝেলির অনামিকায় পরিয়ে দেয়। আংটিটা রেখে গেছিল ওর দাদু। সাঁঝেলি তখন শুধু বলেছিল 'থ্যাঙ্ক ইউ।' বোটে বসে একের পর এক রবীন্দ্রসংগীত শুনিয়েছিল সেদিন সাঁঝেলি। বিকেলের দিকে বাড়ি ফেরার সময় ও জোর করে ধরে নিয়ে গেছিল সাউথ সিটির শপিং মলে। প্যান্টালুন'স থেকে কিনে দিয়েছিল পিঙ্ক কালারের একটা দামি শার্ট।

... দীপিকা সেনের বাড়িতে অর্ক পৌঁছাল প্রায় সোয়া আটটার সময়। তিনতলা বাড়ি, পার্টি রুফ টপ গার্ডেনে। ছাদে পায়ের তলায় মসৃণ ঘাস। নানারকম বাহারি আলো নিয়ে ছাদটা সাজানো। এক কোণে একটা ঝর্নাও দেখতে পেল অর্ক। কোত্থেকে হালকা মিউজিক ভেসে আসছে। দীপিকাদি অথবা ওঁর হ্যাজব্যান্ড ডাঃ সত্যব্রত সেন—এটা যাঁরই শখ হোক না কেন, মনে মনে প্রশংসা করল অর্ক। ওকে দেখে দীপিকাদি হই হই করে ছুটে এলেন।'বাব্বা, এতক্ষণে সময় হল? আমি তো ভাবলাম, আপনি আসবেন না। আসুন, সবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই।'

লোক বেশি নয়। সত্যব্রতবাবু, দীপিকাদির পিসতুতো ভাই দীপঙ্কর দাশগুপ্ত আর ওদের পরিবারের ঘনিষ্ঠ তিন চারজন।

সত্যব্রতবাবুকে অর্কর খুব চেনা চেনা মনে হল। ভদ্রলোককে কি আগে কোথাও দেখেছে? কোনও কনফারেন্সে হতে পারে। হয়তো ও সেখানে রিপোর্ট করতে গেছিল। অথবা টিভিতে কোনও প্রোগ্রামে। পরিচয় পর্ব শেষ হওয়ার পর দীপিকাদি ফিসফিস করে বললেন, 'আরেকজনও আছে। সে নীচের তলায় আমার শ্বশুরমশাইয়ের সঙ্গে দিব্যি আড্ডা জমিয়েছে।'

১১১

অর্ক বলল, 'আমিও যাই তা হলে সেখানে। ভয় লাগছে, যদি হাতছাড়া হয়ে যায়?'

'আমার শ্বশুরমশাইকে নিয়ে ইয়ার্কি মারা হচ্ছে? হি ইজ রানিং এইট্টি ফোর। যাকগে, কী নেবেন বলুন? ভালো স্কচ আছে।'

'দিন তা হলে। তার আগে বলুন তো, ভাইয়ের কাছে কোনও খবর টবর পেলেন?'

'কথা বলেছি। মুখ খুলতে চাইছে না। আপনি বরং ওই কোণটায় চলে যান। নিরালায় বসে ওর সঙ্গে কথা বলুন। কায়দা করে ভাইকে আমি আপনার কাছে বসিয়ে দিচ্ছি। ইচ্ছে হলে সত্যব্রতকেও সঙ্গে রাখতে পারেন।'

স্কচে চুমুক দিতে দিতে অর্ক লক্ষ করতে লাগল দীপিকাদিকে। ভদ্রমহিলা যেন দশভূজা। সব দিক একা সামলাচ্ছেন। একটা সময় সত্যব্রতবাবু আর দীপঙ্করবাবুকে বসিয়ে দিয়ে গেলেন ওর সামনে।

দু'জনের বয়স-ই পঞ্চাশের কাছাকাছি। দু'চারটে কথা বলার পর

অর্ক সরাসরি জিজ্ঞেস করল, 'দিল্লির
অমিতকুমারের কিডনি চক্রের কেসটা শেষে কী দাঁড়াবে, বলুন তো দীপঙ্করবাবু?'

'কী আর হবে। আপনারা কাগজের লোকেরা কয়েকটা দিন হইচই করবেন। তার পর চুপ করে
যাবেন। ব্যস, একদিন ইনফ্লুয়েন্স খাটিয়ে ঠিক ও জামিন পেয়ে যাবে।'

'কার দোষে এদের মতো জানোয়ারগুলো ছাড়া পেয়ে যায় বলুন তো? কেস সাজানোয় আপনাদের
কি কোনও ত্রুটি থাকে?'

'কোনও কোনও ক্ষেত্রে তো থাকেই। কিছু করা যাবে না এই অমিতকুমার লোকটাকে। প্রায়
ছ'শোটা কমপ্লেন আছে ওর বিরুদ্ধে। কিন্তু আমাদের ও যা কাগজপত্তর দেখিয়েছে, তাতে প্রত্যেকটায় কিডনি ডোনারের সই আছে। মানে... প্রত্যেকে জেনেশুনে তাদের কিডনি দিয়েছে। খবরের কাগজে আপনার ডোনারদের যে বিবৃতি লিখছেন, সেগুলো হয়তো ঠিক। কিন্তু প্রমাণ করা যাবে না।'

'কী বলছেন আপনি? এত বড় দুষ্কর্ম করা সত্ত্বেও লোকটাকে শাস্তি দেওয়া যাবে না?'

' কেস সে দিকেই গড়াচ্ছে। অমিতকুমারের কেসে তদন্ত করার জন্য মুর্শিদাবাদের কান্দি থেকে কাল ঘুরে এলেন আমাদের একজন। তার কাছে শুনলাম, ওখানকার দু'টি মুসলিম ছেলে কমপ্লেন
করেছিল, চাকরি দেওয়ার নাম করে ওদেরই গ্রামের কে এক আফজল নাকি দু'জনকে দিল্লিতে নিয়ে
যায়। তার পর একদিন বেহুঁশ করে, ওদের অজান্তে কিডনি কেটে নেয়। কে কেটেছে, এবং কোথায়,
ওরা কিন্তু তা বলতে পারেনি। অবভিয়াসলি অমিতকুমারকে ওরা চোখেই দেখেনি। এক সপ্তাহ পর
ট্রেনের টিকিট কেটে, ওদের সেই আফজল দু'জনকে ফেরত পাঠিয়ে দেয়। ফেরার সময় কয়েকটা

কাগজে নাকি টিপ সই করিয়ে নিয়েছিল। সেই সময় তিনহাজার করে টাকাও দেয় ট্রিটমেন্টের জন্য।

দু'জনই লেখাপড়া জানে না। বুঝতেই পারছেন, কীভাবে অমিতকুমারেরা আইনকে বুড়ো আঙুল দেখাতে পারে?'

সত্যব্রতবাবু এতক্ষণ চুপ করে দু'জনের কথা শুনছিলেন। এ বার বললেন, 'কারও অজান্তে কেউ কিডনি কেটে নেবে, তা কিন্তু হতে পারে না। দীপু, তুমি যে লোকগুলোর কথা বলছ, তারা কিন্তু জেনেশুনেই, টাকার লোভে কিডনি দিয়েছে। মনে হয়, টাকা পয়সা নিয়ে অমিতকুমাররা কথা রাখেনি। যত টাকা দেবে বলেছিল, তা দেয়নি। গণ্ডগোল সেখানে।'

'কিন্তু জামাইবাবু, কিডনি বেচা-কেনার যে একটা র‍্যাকেট আছে, সেটা তো স্বীকার করবেন?'

'থাকতে পারে। তবে ইচ্ছে করলেই যে কিডনি কেনা যাবে, বা বিক্রি করা যাবে, তা কিন্তু সম্ভব নয়। অনেক প্রসিডিওর আছে। হেলথ ডিপার্টমেন্ট-এর কাছে অ্যাপ্লাই করতে হয়। একটা কমিটি আছে, যারা ডোনার... মানে যে কিডনি দিচ্ছে, তাকে ডেকে পাঠাতে পারে। ডোনারের স্পাউসের সম্মতি লাগে। অনেক নিয়মকানুন পেরিয়ে তার পর ট্রান্সপ্ল্যান্টেশনের প্রশ্ন আসে। যত লোক অ্যাপ্লাই করে, তার ষাট ভাগ অনুমতি পায় না। কাগজে অমিতকুমারের খবরটা যত পড়ছি, ততই আমার হাসি পাচ্ছে। রিপোর্টাররা কী বল তো, জেনেশুনে তবে তো লিখবে?'

সত্যব্রতবাবুর কথাগুলো অর্কর পছন্দ হল না। প্রসঙ্গ ঘোরানোর জন্য ও বলল, 'দীপঙ্করবাবু, আপনি কি হনুমানের কিডনি কাটার র‍্যাকেট সম্পর্কে কিছু শুনেছেন?'

'দিল্লিতেই কাগজে পড়েছি। ইন্টারেস্টিং কেস। কাল সকালে নিজাম প্যালেসে গিয়ে আমি জানতে চাইব, এখানকার কোনও অফিসার এই ব্যাপারটা ট্রেল করছেন কী না।'

সত্যব্রতবাবু বললেন, 'হনুমানের কিডনি কীভাবে মানুষের বডিতে ট্রান্সপ্ল্যান্ট করা যাবে, দীপু সেটাই আমি বুঝতে পারছি না। হিউম্যান বডি অ্যাকসেপ্ট ই করবে না। কোন ডাক্তার এ কাজ করবেন?'

দীপঙ্করবাবু বললেন, 'ইল মোটিভ থাকলে, সবই সম্ভব জামাইবাবু।'

কথা বলতে বলতে অর্ক প্রথম পেগটা শেষ করে ফেলেছিল। উঠে গিয়ে দ্বিতীয় পেগ আনার সময় ওর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল সাঁঝেলির। উজ্জ্বল হলুদ, বিভিন্ন শেড-এর একটা রাজস্থানী ঘাঘরা আর চোলি পরে এসেছে। দুর্দান্ত লাগছে ওকে দেখতে। ওর মুখ থেকে বেরিয়ে গেল, 'ওয়াও'।

সাঁঝেলি বলল, 'কী রকম লাগছে গো? কয়েক দিন আগে সাউথ সিটির শপিং মল থেকে কিনেছি। পাপ্পিক জোর করে কেনাল।'

অর্ক বলল, 'আমি কিছু বললেই তো তুমি বলবে, রিপোর্টাররা খুব হিংসুটে হয়।'

'হয়ই তো। এই তো একটু আগে শুনলাম, আমি যাতে হাতছাড়া হয়ে না যাই, তার জন্য তুমি নীচে নামতে চাইছিলে। তোমার কথা শুনে দীপিকাদির শ্বশুর কী বললেন জান, ওপরে উঠে আসবেন তোমার সঙ্গে পাঞ্জা লড়তে।

'তুমি কি রেফারিং করার জন্য আগে উঠে এলে?'

'না তোমার নার্সিং করার জন্য। চুরাশি বছর বয়স হলে কী হবে, দীপিকাদির শ্বশুরের কবজিটা শক্ত হাতুড়ির মতো। গায়ে প্রচণ্ড জোর। সাবধান অর্ক।'

pathagar.net

'নার্সরা আজকাল ঘাঘরা-চোলি পড়ছে নাকি?'

পাল্টা কথা খুঁজে না পেয়ে সাঁঝেলি হাসতে লাগল। তার পর হঠাৎ কী মনে হওয়ায় হাসি থামিয়ে বলল, 'এই, তোমাকে একটা কথা বলার আছে। কথাটা শুনলে তুমি অবাক হয়ে যাবে। জান, আজ চিড়িয়াখানার লাইব্রেরিতে কাজ করার সময় একটা অদ্ভুত জিনিস আবিষ্কার করেছি।'

খুনসুটি করার জন্য অর্ক বলল, 'ককটেল পার্টিতে কি চিড়িয়াখানার কথা আলোচনা করা উচিত? আমি মস্তি করার জন্য এসেছি।'

'এখন শুনছ না তো। পরে কিন্তু পস্তাবে।'

'কথাটা কিন্তু তুমি আরও একবার বলেছিলে। নয়াগ্রামে হনুমানের খবরটা দেওয়ার আগের দিন। এখন সত্যিই পস্তাচ্ছি। রোজ একটা করে থ্রেট কল পাচ্ছি।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। দীপিকাদি বলছিল। কিন্তু আমি তো কোনও থ্রেট কল পাইনি। অদ্ভুত না?'

'এমনও তো হতে পারে, তোমার জানাশুনো কেউ আমাদের থ্রেট করছে।'

'যাঃ, কে হতে পারে, তোমরা রিপোর্টাররা না, খুব প্যারানয়েড টাইপের হও।'

অর্ক বলল, 'যাক গে ও সব কথা। লাইব্রেরিতে তুমি কী আবিষ্কার করলে সেটা বল।'

'তুমি হাসবে না বল প্লিজ। তা হলে বলব। আজ লাইব্রেরিতে বইয়ের ক্যাটালগ করার সময় হঠাৎ খুব পুরনো একটা ছবি খুঁজে পেলাম। ছবিটা চিড়িয়াখানার সুপারিনটেনডেন্ট রামব্রহ্ম স্যান্যালের

। ধুলোয় একশা। পরিষ্কার করার পর দেখে চমকে উঠলাম। এক্কেবারে তুমি। মানে... ওই বয়সে উনি যে রকম দেখতে ছিলেন, ঠিক এখনকার তুমি। শুধু তোমার চোখে চশমাটা নেই।'

কী আশ্চর্য কোইনসিডেন্স। আজই রমাপদদা রামব্রহ্ম সান্যালের জীবনী নিয়ে লেখা একট বইয়ের রিভিউ করতে দিলেন। আর আজই ওর চেহারার সঙ্গে ভদ্রলোকের মিল খুঁজে পেল সাঁঝেলি? ও বলল, 'যাঃ, তাই হয় না কি? তুমি ভুল দেখেছ।'

'বিশ্বাস কর। আমি শিউচরণকে ডেকে দেখালাম। বল তো, অর্ক সারের মতো লাগছে কী না? ও বলল, বিলকুল ম্যাডাম। কী করে হয়? কাল প্লিজ, তুমি একবার চিড়িয়াখানায় যেও। ছবিটা তোমাকে দেখাব।'

'ঠিক আছে যাব। ভালো কথা, লাইব্রেরিতে তোমাকে কী কাজ করতে হচ্ছে পিপি?'

সাঁঝেলির গলায় অভিমান, ' তোমায় বারণ করেছি না? বন্ধুরা বলে বলুক, তুমি আমায় পিপি বলে ডাকবে না।'

'ঠিক আছে, ডাকব না। ভাবছি, তোমাকে না... আমি পার্টিকুলার একটা নামে ডাকব না। সকাল উষালি, সন্ধেবেলায় সাঁঝেলি আর রাতে নিশালি বলে ডাকব। আপত্তি নেই তো?'

শুনে সাঁঝেলি হাসতে লাগল। তার পরে বলল, 'কটা পেগ চলছে এখন অর্ক? দু'টোর বেশি হয়নি নিশ্চয়ই। তুমি তো দেখছি আমার দাদার মতো। দু'টো পেগের পরই কম্পিউটারের কন্ট্রোল ডি। উবে যাও।'

গ্লাসে চুমুক দিয়ে অর্ক বলল, 'বাঃ, ভালো বলেছ। বরাবর দেখেছি, আমার সঙ্গে যারা মেশে হঠাৎই তাদের সেন্স অব হিউমার বেড়ে যায়। তুমিও দেখছি, তার ব্যতিক্রম নও।'

'ড্যাম ইয়োর সেন্স অব হিউমার। আমার পেট চুঁই চুঁই করছে। চল, দু'জনে খেয়ে নিই।' বলেই কাছে এসে হাত ধরে টানল সাঁঝেলি, অর্কর বাঁ হাতটা বুকের সঙ্গে জড়িয়ে রাখল। তার পর আহ্লাদি গলায় বলল, 'স্টপ ড্রিঙ্কিং অর্ক।

pathagar.net

একটু আগেই বেরোই, চল। আজ তোমার ওখানে খানিকক্ষণ আড্ডা মেরে, তার পর বাড়ি ফিরব।'

২৩

দু'টো বাচ্চার জন্ম দিয়েছে গায়ত্রী। খবরটা মেয়ে পকেটমার ধরা পড়ার দিনই পেয়েছিল শিউচরণ। জগা মিস্তিরি রাতে চুপিচুপি কোয়ার্টারে এসে বলে গেছিল কথাটা। ক্যানাভোর এনক্লোজারের কিপার। মুন্নি রুটি পাকাচ্ছে, তখন শুয়ে শুয়ে টিভি-তে সা রে গা মা প্রোগ্রামটা দেখছিল শিউচরণ। জগার মুখে কথাটা শুনে লাফিয়ে উঠেছিল। আরে বাঃ। এ তো ভালো খবর। সঙ্গে সঙ্গে জগাকে নিয়ে ও বারান্দায় চলে গেছিল। জিজ্ঞেস করেছিল, 'ক'টা বাচ্চা দিয়েছে বললি? তুই ঠিক দেখেছিস?'

জগা বাজে কথা বলার লোক না। অনেক দিন ধরে ও চিড়িয়াখানায় চাকরি করছে। অভিজ্ঞ না হলে কাউকে বাঘ-সিংহের এনক্লোজারে পাঠানো হয় না। ও বলল, 'সকাল বেলাতেই সন্দেহটা হয়েছিল। তাই তিলককে

পাশের ঘরে সরিয়ে দিয়েছিলাম। বিকেলে টর্চ মেরে দেখলাম, ঘরের ভেতর সত্যিই দু'টো বাচ্চা রয়েছে।'

গায়ত্রী হল বাঘিনী। আর তিলক হল বাঘ। চিড়িয়াখানায় বছর তিনেক বাঘের কোনও বাচ্চা হয়নি। ডিরেক্টর সাহেব সেই কারণেই এ বার ব্রিডিংয়ের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। গায়ত্রী আর তিলককে এক খাঁচায় রেখে। কিন্তু ক্যাপটিভ ব্রিডিংয়ের আজকাল অনেক ঝামেলা। জু অথরিটি আর সরকারের অনেক ফতোয়া রয়েছে। চিড়িয়াখানায় নতুন অতিথি জন্মালে আগে বেশ হইচই হত। বিশেষ করে বাঘ বা সিংহের বাচ্চা হলে তো কথাই নেই। কিন্তু এখন মোটেই ঢাকঢোল পেটানো হয় না। বাচ্চাটা শেষ পর্যন্ত বাঁচানো যাবে কী না, সেটা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। বাচ্চা দেওয়ার পর কখনও বাপ-মা নিজেরাই খেয়ে ফেলে। কখনও বাঁচিয়ে রাখলেও বাঘিনী হঠাৎ বাচ্চার প্রতি উদাসীন হয়ে যায়। দুধ খাওয়াতে চায় না। এমনিতেই বাচ্চা তখন মরে যায়।

'স্যারকে সব কিছু বলেছিস?'

'বলতে গেছিলাম। রেগে টং হয়ে আছেন। দুপুরে প্রেসের কে একজন এসে নাকি স্যারকে জ্বালাতন করে গেছে। কোত্থেকে খবর পেয়েছে, বাঘের বাচ্চা হয়েছে। ওদের ছবি তুলতে দিতে হবে। স্যার এত খচে গেছে, বলেন কী না, আগে প্রেসের কাছে খবর দিয়ে তার পর আমার কাছে এসেছ? মাইনেটা আমি দিই, না প্রেস থেকে পাও? আমাকে সাসপেন্ড করবে বলে ভয় দেখাল। শিউদা, মায়ের দিব্যি,

আমি কাউকে কিছু বলিনি। এ শালা বরুণের কাজ। সকালবেলায় ক্লিন করতে নেমেছিল। তখনই মনে হয়, ফার্স্ট দেখতে পেয়েছে। আমি তো ওর কাছ থেকেই খবরটা প্রথম শুনলাম।' জগার কথায় অনেক গোলমাল টের পেয়েছিল শিউচরণ। নিজে দু'রকম কথা বলছিল।

আর তার ওপর নিজে বাঁচার জন্য জুনিয়ার কিপার বরুণের ওপর দোষ চাপাচ্ছিল। মুশকিল হল, দু'জনেই ওর ইউনিয়নের মেম্বার। রাত্তিরে অনেক ভেবে চিন্তে, আজ দুপুরে অনেক কষ্টে শিউচরণ

স্যারের রাগ ঠাণ্ডা করেছে। স্যারকে ও বুঝিয়েছে, জগাকে শাস্তি দেওয়ার থেকে অনেক বেশি জরুরি, বাচ্চাটাকে বাঁচানো। বাচ্চাটাকে যদি হাসপাতালে নিয়ে আসতে পারে, তা হলে ও নিজে একবার চেষ্টা করে দেখতে পারে।

স্যার কি অত সহজে বুঝতে চায়? বলেছিল, 'না শিউ, এ রিস্ক আমি নিতে পারব না। মায়ের কাছে
কোনও বাচ্চা মারা গেলে, আমার কোনও দোষ হবে না। কিন্তু প্রেসের লোক যদি শোনে, বাচ্চাটাকে আলাদা করার পর মারা গেছে, তা হলে আমাকেই কাঠগড়ায় দাঁড় করাবে। তুমি কোনটা চাও বল।'

'স্যার বাচ্চাটাকে আমার হাতে দিন। যে করেই হোক, বাঁচিয়ে তুলবই।'

'কিন্তু তোমার তো প্র্যাক্টিক্যাল কোনও অভিজ্ঞতা নেই। বাচ্চাকে খাওয়াবে কী?'

'স্যার, বেবি ফুড। বাচ্চারা যা খায়। আপনি পারমিশন দিন স্যার

। চোখের সামনে বাচ্চাটা মরে যাবে, ভাবতেই খারাপ লাগছে।'

অনেক কথা খরচ করার পর শেষ পর্যন্ত স্যার অনুমতি দিয়েছেন। গায়ত্রীর খাঁচা থেকে শিউচরণ বুকে করে বাচ্চাকে তুলে এনেছিল কাল বিকেলে। আশ্চর্য, লোহার গারদের ও পাশে গায়ত্রী তখন চুপ করে বসে দেখছিল। হাসপাতালে নিয়ে এসে বাচ্চাটাকে অনেকভাবে পাতলা দুধ খাওয়ানোর চেষ্টা করেছে শিউচরণ। তুলো দুধে ভিজিয়ে, কখনও ফিডিং বোতল মুখে গুঁজে দিয়ে। কিন্তু বাচ্চাটা খায়নি। কয়েক ফোঁটা জল শুধু মুখের ভেতর ঢুকিয়ে দিতে পেরেছিল ও।

রাত্তিরে বিছানায় শুয়ে দুশ্চিন্তায় ছটফট করছিল। তখন মুন্নি ওর কাছে জানতে চায়, কী হয়েছে।

শুনে বলে, 'কাল সকালে বাচ্চাটাকে আমার কাছে নিয়ে এস। আমি এক বার চেষ্টা করে দেখব।' কোয়ার্টারের গায়েই হাসপাতাল। সকালে ঘুম থেকে উঠে হাসপাতালে গিয়ে ঘরের তালা খুলে শিউচরণ দেখে, না, বাচ্চাটা মরেনি। দেখে ও স্বস্তির হাঁফ ছাড়ে। তোয়ালে জড়িয়ে বাচ্চাটাকে ও নিজের ঘরে নিয়ে আসে। মুন্নি কোত্থেকে একটা ঝিনুক জোগাড় করেছে। টাটকা দুধ বাটিতে ঢেলে রেখেছে। ঝিনুকে করে দুধ নিয়ে বাচ্চাটাকে ও খাওয়ানোর চেষ্টা করল। প্রথমে খেতে চাইছিল না। তার পর দিব্যি খেতে শুরু করল। এক পেট খেয়ে বাচ্চাটা শেষে মুন্নির কোলে ঘুমিয়েও পড়ল।

খবরটা দেওয়ার জন্য বাগানে ডিরেক্টরের অফিসে গেল শিউচরণ। ভালো খবরটা এখনই দেওয়া দরকার। পৌঁছে শুনল, ডিরেক্টর সাহেব বড় ঝিলের দিকে গেছেন। এত সকালে ঝিলের দিকে যাওয়ার কারণটা কী, ও বুঝতে পারল না। বাগান একেবারে সুনশান। বেলা দশটা

বাজে,তা সত্ত্বেও, একজন ভিজিটরও নেই। হঠাৎ ওর মনে পড়ল, আজ বেস্পতিবার। চিড়িয়াখানা বন্ধ রাখার দিন। পা চালিয়ে ও ঝিলের সামনে এসে দাঁড়াল, ব্রিজের ওপর দাঁড়িয়ে আছেন স্যার। ঝিল থেকে মাছ তোলা দেখছেন ।
ঝিলে প্রচুর মাছ। বছরে একবার করে মাছ তোলার দাদন পায় জেলেরা। চিড়িয়াখানার কিছু রোজগার হয়।

না, স্যারকে এখন ডিসটার্ব করা যাবে না। ততক্ষণে গায়ত্রীকে একবার নিজের চোখে দেখে আসা যাক। সেই কারণে শিউচরণ পশ্চিম দিকে এগোতে লাগল। এই জায়গাটাকে বলা হয় নিউ এক্সটেনশন। সামনেই হারকিউলিসের একটা মুর্তি, গোল পৃথিবী কাঁধে নিয়ে বসে। হাঁটু গেড়ে বসে। চিড়িয়াখানার জন্তু জানোয়ারের মধ্যে এই মানুষের মূর্তিটা রাখার কারণটা কী, শিউচরণ একবার জানতে চেয়েছিল আগেকার ডিরেক্টর স্যারের কাছে। উনি বলেছিলেন, অনেক আগে নাকি এই পাথরের মূর্তিটা ছিল চিড়িয়াখানার ঠিক পিছন দিকে আবহাওয়া অফিসের ভেতরে। একটা সময় চিড়িয়াখানার জন্য খানিকটা জায়গার দরকার হয়। তখন আবহাওয়া অফিস থেকে খানিকটা জায়গা চেয়ে নেওয়া হয়। তখন

হারকিউলিসের মূর্তিটা চিড়িয়াখানার ভেতরে এসে যায়।

মুর্তিটা বহু দিন ঝোপঝাড়ের মধ্যে অনাদরে পড়ে ছিল। ওই ডিরেক্টর স্যারই মূর্তিটাকে তুলে এনে বাগানের এই জায়গাটায় বেদি করে বসিয়ে দিয়েছেন। শিউচরণের চোখে পড়ল, হারকিউলিসের গায়ে কাক পায়খানা করেছে। দেখেই ওর রাগ হয়ে গেল। বাগান পরিষ্কার রাখার দায়িত্বে রয়েছে পাণ্ডুয়া। কী করে সারাটা দিন? এ সব

ওর চোখে পড়ে না। মূর্তিটার বাঁ দিকে লাইব্রেরি। এই নিউ এক্সটেনশনে এখন নতুন রং করানো হচ্ছে। লাইব্রেরির বাইরের দিকটা খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন লাগছে।

'শিউচরণ, একবার ভেতরে আসবে?'

সাঁঝেলি ম্যাডামের গলা শুনে শিউচরণ লাইব্রেরির দিকে তাকাল। মাসখানেক হল, ম্যাডাম লাইব্রেরিতে কাজ করছেন। প্রশান্তবাবু সেদিন কাকে যেন বলছিল, ম্যাডাম এই অল্প দিনের মধ্যেই লাইব্রেরিটা বেশ গুছিয়ে ফেলেছেন। শ্বেত পাথরের দু'ধাপ সিঁড়ি দিয়ে উঠে ও ভেতরে ঢুকে এল। দু'তিন দিন আগে ম্যাডামের ডাকে ও একবার লাইব্রেরিতে এসেছিল। তখনই দেখেছিল, আলমারি আর র‍্যাকেট থেকে প্রচুর বই নামিয়ে টেবলে ডাঁই করা রয়েছে। দু'তিন জন অল্পবয়সী ছেলে-মেয়েকে দিয়ে ম্যাডাম বইগুলোর ক্যাটালগ তৈরি করাচ্ছেন। আজ দেখল, অনেকগুলো আলমারিতে বই সাজানো হয়ে গেছে।

হঠাৎই মনে পড়ল, নয়াগ্রাম থেকে নুরুল কাল বিকেলে ওকে ফোন করে কয়েকটা খবর দিয়েছিল, সেটা ম্যাডামকে জানানো হয়নি। ও বলল, 'ম্যাডাম, নুরুল খুব প্রবলেমে পড়ে গেছে। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের চিফ কনজার্ভেটর কাল ওর কাছে একটা চিঠি পাঠিয়েছে।'

'তাই নাকি? কী লিখেছে চিঠিতে?'

' তোমার বাড়িতে একট রেসাস মাঙ্কি মারা গেছে। পোস্টমর্টেম করে আমরা জানতে পেরেছি, হনুমানটার একটা কিডনি কেটে নেওয়া হয়েছিল। কী করে এটা হল, জানাও।'

'কিন্তু নুরুল ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট আর পুলিশকে আগে সব জানায়নি? ওকে তো আমরা জানিয়ে রাখতে বলেছিলাম।'

'ম্যাডাম, ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের লোকেরা এসে হনুমানটাকে নিয়ে যেতে চেয়েছিল। গাঁয়ের মেয়ে- বউরা বাধা দেয়। আমাদের ও দিকে, গাঁয়ে হনুমানকে আমরা পুজো করি। নুরুল অবশ্য পুজোয় বিশ্বাস করে না। কিন্তু পার্টি করে। তাই গাঁয়ের মানুষের এগেনস্টে যেতে পারেনি।'

'তা হলে তো সত্যিই প্রবলেম শিউচরণ। বুঝতে পারছ, যে র‍্যাকেট এই কাজটা করেছে, তার হাত কতদূর লম্বা? চিফ কনজার্ভেটর পর্যন্ত চলে গেছে। অর্ক জানে এ সব?'

'হ্যাঁ, নুরুল সব জানিয়েছে। ও এত ক্ষেপে গেছে, আজ কলকাতায় এসে পার্টির হেড অফিসে কমপ্লেন করবে বলেছে, চিফ কনজার্ভেটরের এগেনস্টে। এখানকার বড় নেতারা সবাই ওকে চেনেন। পঞ্চায়েত ইলেকশন আসছে। বোঝেনই তো ম্যাডাম, এখন নুরুলদের ওপরই জেতানোর দায়িত্ব। পার্টি কিছুতেই চাইবে না, ওর বদনাম হোক।'

'বাপ রে। এ তো বিরাট পলিটিক্যাল ঝামেলায় গিয়ে দাঁড়াবে।'

'গাঁয়ের দিকে, জানেন না ম্যাডাম, পান থেকে চুন খসলে পার্টি ইন্টারফেয়ার করে। এ বার বেশ কিছুদিন দেশের বাড়িতে থেকে এটা বুঝতে পারলাম। ভাবতে পারেন, নুরুলের এগেনস্ট পার্টির লোকেরা গাঁয়ের মানুষকে কী বলে খেপিয়েছে? নুরুল মুসলিম, তাই হনুমানের কিডনি নিয়ে ব্যবসা করছে। কত বড় অন্যায় বলুন তো?'

সাঁঝেলি ম্যাডাম যত শুনছেন, অবাক হচ্ছেন। বললেন, 'এ বার বুঝতে পারছি, অর্ক কেন আজ বলল, ওকে হয়তো আরেকবার নয়াগ্রাম যেতে হতে পারে।'

শিউচরণ বলল, 'উনি যদি যেতে চান ম্যাডাম, তা হলে যেন একা না যান। সঙ্গে আমিও যাব। ওঁর সঙ্গে আমি কথা বলে নিচ্ছি। এ বার বলুন, আমাকে ডাকলেন কেন?'

'একটা ইনফরমেশন দিতে পারবে আমাকে? চিড়িয়াখানার পুরনো হিস্ট্রি ভালো করে জানেন, এমন কোনও লোককে তুমি চেনো?'

সঙ্গে সঙ্গে প্রতীপ ব্যানার্জির বাবার কথা মনে পড়ল শিউচরণের। চিড়িয়াখানার হেড ক্লার্ক এখন প্রতীপ ব্যানার্জি। ওর বাবা গুরুদাস ব্যানার্জি এই লাইব্রেরিতেই কেয়ারটেকার ছিলেন। ওঁর অফিসিয়াল ডেজিগনেশন ছিল, লেবেল রাইটার। মানে... বাগানে যত সাইন বোর্ড আছে, তার লেখাগুলো উনি লিখতেন। কাজের চাপ খুব বেশি ছিল না বলে, ওকে লাইব্রেরি সামলানোর দায়িত্বও দেওয়া হয়েছিল। বছর পনেরো আগে উনি রিটায়ার করেন। শিউচরণ দেখেছে, তখন পুরনো কোনও রেফারেন্সের দরকার হলে গুরুদাসবাবুর ডাক পড়ত। বেহালার ও দিকে কোথায় যেন থাকতেন। উনি বেঁচে আছেন কী না, শিউচরণ জানে না। প্রতীপবাবুকে জিজ্ঞেস করলেই সেটা জানা যাবে। সাঁঝেলি ম্যাডামকে ও বলল, 'একজন আছেন। কিন্তু কী কারণে খোঁজ করছেন ম্যাডাম?'

'আরে, রেজিস্টার খুলে দেখছি, অনেক দামি দামি বই এখানে নেই। কমিটি মেম্বাররা নিয়ে গেছেন, অথচ বইগুলো ফেরত দেননি। সেই বই উদ্ধার করতে হবে।'

'তা হলে ম্যাডাম গুরুদাসবাবু বেস্ট লোক। ওঁর বয়স এখন হবে সেভেন্টি ফাইভের মতো। কিন্তু পুরনো কথা ডিটেলে বলে যেতে পারেন। কমিটিতে আগে যাঁরা মেম্বর ছিলেন, তাঁদের সবার বাড়ির ঠিকানা উনি জানেন। তাঁদের বাড়িতে লোক পাঠিয়ে বইগুলো উদ্ধার করা যাবে। আজ বিকেলের মধ্যেই ওঁর ফোন নাম্বার আমি আপনাকে জোগাড় করে দিচ্ছি।'

' এখানে লাইব্রেরি ঘেঁটে কত কী জানতে পারছি শিউচরণ, জান? উফ, কী যে ভালো লাগছে পুরানো দিনের কথা জানতে, তোমাকে কী বলব। এই লাইব্রেরিটা একটা খনি। জান, কে এই লাইব্রেরিটা তৈরি করে দিয়েছিলেন?'

' কে ম্যাডাম?'

' পাথুরেঘাটা ঠাকুরবাড়ির যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর। ভাবতে পার? এই বাড়িটা তাঁর টাকাতেই তৈরি। জীবজন্তু সম্পর্কিত প্রচুর বইও আনিয়ে দিয়েছিলেন তিনি বিদেশ থেকে। এই লাইব্রেরিটা খুলে দিলে জুলজির স্টুডেন্টরা যে কত বেনিফিটেড হবে, ভাবতে পারবে না।'

শুনে খুশি হল শিউচরণ। নিজে লেখাপড়া করার সুযোগ পায়নি। যা কিছু শিখেছে, সব দেখে দেখে। কিন্তু শিক্ষিত লোকদের ও খুব সম্মান করে। ও বলল, 'ডিরেক্টর সাহেবকে বলুন না ম্যাডাম। লাইব্রেরিটা এমনি এমনি পড়ে আছে। যদি অনেকের কাজে লাগে, তা হলে তো ভালো।'

'কত নতুন নতুন কথা জানতে পারছি জান? চিড়িয়াখানার এই ঝিলের সঙ্গে আগে নাকি গঙ্গা মানে... আমাদের হুগলি নদীর যোগাযোগ ছিল। জোয়ারের সময় এখানকার ঝিলে কুমির চলে আসত, পাখি ধরে খেত। ঝিলে তখন বোটিংয়ের ব্যবস্থা ছিল। লোকে পয়সা দিয়ে টিকিট কেটে বোটিং করত। এখানে ডগ শো হত, ডিনার পার্টি বা ফ্যান্সি ফেয়ার আর নিউ ইয়ার্স ইভ-এর অনুষ্ঠানও।

জান, একবার দক্ষিণেশ্বর থেকে রামকৃষ্ণদেব এসেছিলেন, সঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ। সিংহ দেখে রামকৃষ্ণদেব সমাধিস্থ হয়ে যান। তার পর আর কোনও জন্তু না দেখে তিনি মন্দিরে ফিরে যান। অদ্ভুত, তাই না?'

'ম্যাডাম, আমি শুনেছি আগে নাকি ইলেকট্রিক ট্রেনের ব্যবস্থা ছিল। তাতে চেপে লোকে ঘুরে ঘুরে সব জন্তু জানোয়ার দেখত?'

'হতে পারে। একটা বইয়ে আমি দেখলাম, অযোধ্যার নবাব ওয়াজেদ আলি একবার জাপানি রিকশা চেপে চিড়িয়াখানায় ঘুরেছিলেন। আটজন মিলে সেই রিকশা টেনেছিল। নবাব সাহেব প্রচুর রঙিন মাছ উপহার দিয়েছিলেন চিড়িয়াখানাকে। নবাব কলকাতায় মারা যাওয়ার পর, ওঁর পোষা উনষাটটা বন্য পশু, দু'শোটা পাখি আর একশোটা সাপ চিড়িয়াখানায় নিয়ে এসে রাখা হয়। প্রায় একশো বছর আগেকার কথা। তখন পশুপাখি বিক্রি করা যেত। চিড়িয়াখানা থেকেও লোকে পশুপাখি কিনে নিয়ে যেত।'

শিউচরণ খুব খুশি হচ্ছিল ম্যাডামের কথা শুনে। ও বলল, 'সিনিয়রদের কাছে শুনেছি, তখন সারা পৃথিবীতে আমাদের এই জু খুব নামকরা ছিল।'

'ছিলই তো। আর এ সব হয়েছিল প্রথম সুপারিনটেন্ডেন্ট রামব্রহ্ম স্যান্যালের জন্য। জান, ওঁর এত

নাম হয়ে গেছিল, রেঙ্গুন থেকে ওঁকে ডেকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। রেঙ্গুনের চিড়িয়াখানা উনিই তৈরি করে দিয়ে এসেছিলেন। কাগজপত্তর ঘেঁটে দেখলাম, রামব্রহ্ম সান্যাল মারা যান ১৯০৮ সালের ১৮ অক্টোবর। ঠিক একশো বছর আগে। ওই দিন যদি একটা অনুষ্ঠান করা যায়, তা হলে খুব ভালো হয়। ডিরেক্টর সাহেবকে কথাটা বলব। যাক্ সে সব কথা, এদিকে তুমি যাচ্ছিলে কোথায় শিউচরণ? সরি, তোমাকে এতক্ষণ আটকে রাখলাম।'

গায়ত্রীর বাচ্চার কথা বলতে গিয়েও শিউচরণ নিজেকে সামলে নিল। না, কাউকে ও বলবে না।

pathagar.net

তাই বলল, 'না না ম্যাডাম, আমার খুব ভালো লাগছিল। আপনার কাছ থেকে কত কী জানতে পারলাম। আমি তা হলে আসি ম্যাডাম।' বলেই শিউচরণ লাইব্রেরি থেকে বেরিয়ে এল। বড় ঝিলের দিকে ও হাঁটতে লাগল, দূর থেকেই ও দেখতে পেল, ব্রিজের ওপর স্যারকে ঘিরে রয়েছে চার পাঁচজন। স্যারের মুখে চওড়া হাসি। তার মানে মেজাজটা ভালো আছে। পা চালিয়ে কাছে যেতেই, ওকে দেখে স্যার বলে উঠলেন, 'শিউ, দেখে যাও কী সারপ্রাইজিং একটা ব্যাপার হয়েছে।'

স্যারের হাতে ওটা কী? গোসাপের থেকে একটু ছোট সাইজের? ও কোনও প্রশ্ন করার আগেই স্যার বলে উঠলেন,' দেখ, সেই ছ'নম্বর কুমির ছানাটা। তোমরা যেটাকে খুঁজে পাচ্ছিলে না। খাল বেয়ে বেয়ে কোনও রকমে বড় ঝিলে এসে পড়েছিল। আজ মাছ ধরতে গিয়ে জেলেদের জালে ধরা পড়েছে। দেখ, এই ক'দিনে কত বড় হয়ে গেছে।'

শুনে শিউচরণ নিশ্চিন্ত হল। যাক বান্টির চাকরিটা তা হলে বাঁচানো গেল।

২৪

কোনও জন্তুর শরীরের অংশ মানুষের দেহে প্রতিস্থাপন করা যায় কী

না, সে সম্পর্কে তথ্য জানার জন্য নেট সার্চ করতে বসেছে অর্ক। প্রচুর তথ্য বিভিন্ন সাইটে। তাতে এত মেডিকেল টার্মস, অর্ক কিছুই বুঝতে পারছিল না। তখনই ও ঠিক করে ফেলে, সাঁঝেলির বাবার কাছে যাবে। গিয়ে বিষয়টা ভালো করে বুঝে নেবে।

উনি নামকরা ইউরোলজিস্ট।

উনি নিশ্চয়ই সহজ করে বুঝিয়ে দিতে পারবেন। কম্পিউটারের সামনে বসে তথ্য ঘাঁটতে ঘাঁটতে হঠাৎই অর্কর মনে হল, ইস, আট-ন'বছর আগে যদি মেডিকেল সায়েন্স এত উন্নত হত, তা হলে হয়তো দাদুকে বাঁচানো যেত। দাদুও কিডনি প্রবলেমে পড়েছিল। দু'টো কিডনিই ফাংশান করছিল না। সেই সময় অর্ক ছিল বেলুড়ের রামকৃষ্ণ মিশন কলেজের হোস্টেলে। পাছে ওর পড়াশুনোর ব্যাঘাত ঘটে, সেই কারণে দাদু কিছুই জানাতো না। পরে অর্ক শুনেছিল, দাদুর কিডনি অপারেশন হয়েছে।

পাঁচটা বছর দাদু বেশ ভালোই ছিল। তার পর ফের কিডনি ট্রাবল দিতে থাকে। পড়াশুনো শেষ করে অর্ক তখন খবরের কাগজে ঢুকে পড়েছে। সেই সময় ও দাদুর কাছেই জানতে পারে, দাদু কিডনি ট্রান্সপ্ল্যান্ট করেছিল। ডায়লিসিস করে দাদুকে বাঁচিয়ে রাখার অনেক চেষ্টা করেছিল অর্ক। শেষ দিকে ওখার্ডে ভর্তিও করেছিল। কিন্তু বাঁচাতে পারেনি। সেই দিনগুলোর কথা মনে হতেই অর্কর মনটা ভারি হয়ে গেল। আর তখনই কাজের মেয়ে রমলা ডাইনিং স্পেস থেকে ডাকল, 'দাদাবাবু, ব্রেক ফাস্ট রেডি। খেয়ে যাও।' কম্পিউটার বন্ধ করে অর্ক ডাইনিং স্পেসে এল। খেতে খেতেই ও ভাবতে লাগল, কিডনি ট্রান্সপ্ল্যান্টেশন সম্পর্কে ভালো করে না জানা পর্যন্ত হনুমান রহস্য নিয়ে আর কোনও স্টোরি

করবে না। হনুমানের কিডনি যদি মানুষের দেহে ট্রান্সপ্ল্যান্ট করা সম্ভব না হয়, তা হলে স্টোরির গুরুত্ব অনেকটাই কমে যাবে। অন্তত খবরের কাগজের দিক থেকে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, হনুমানের কিডনি নয়াগ্রামে কারা কাটছে এবং কেনই বা কেটে নিচ্ছে? একটা উদ্দেশ্য তো আছেই। সেদিন দীপিকাদির হাজব্যান্ড ডাঃ সত্যব্রত সেন বলার চেষ্টা করছিলেন, এর পিছনে আদিবাসীদের কোনও কুসংস্কার থাকলেও থাকতে পারে। অর্কর অবশ্য সেটা মনে হয় না। কেননা, যারা হনুমানকে প্রায় দেবতার আসনে বসিয়েছে, যৌনক্ষমতা বাড়ানোর জন্য তারা হনুমানের কিডনি কেটে নিয়ে যাবে,এটা বিশ্বাস করা যায় না। অন্য কোনও কারণ আছে।

রমলা কাজ করে বেরিয়ে যাওয়ার পর সাঁঝেলিকে ফোনে ধরল অর্ক। সমস্যাটা জানিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার বাবার সঙ্গে এ ব্যাপারে কথা বলা যাবে?'

' রাতের দিকে বাবা লেক গার্ডেন্সের চেম্বারে বসেন। এখুনি যদি দেখা করতে চাও, তা হলে তোমাকে যেতে হবে সেই ট্র্যাঙ্গুলার পার্কের কাছে। একটা নার্সিংহোমে।'

'তা হলে ওঁর ফোন নাম্বারটা আমায় দাও। আর যদি পার, বেলা বারোটার সময় একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে রাখ। ওর চেম্বার ঘুরে তার পর আমি অফিস যাব।'

' আমি এখুনি বলে দিচ্ছি। আর হ্যাঁ, তোমাকে শিউচরণ ফোন করেছিল?'

'হ্যাঁ। আমার সঙ্গে নয়াগ্রাম যেতে চাইছে। শিউচরণকে বললাম, একদিনের জন্য নয়াগ্রামে যাচ্ছি। কাল সকালে গিয়ে পরশুদিনই ফিরে আসব। তোমার যাওয়ার কোনও দরকার নেই। কিন্তু ও আমাকে একা যেতে বারণ করছে। কারণটা কী, বুঝতে পারছি না।'

'কারণ নিশ্চয়ই একটা আছে। শুনে দরকার নেই। প্লিজ, তুমি

একা নয়াগ্রামে যেও না।'

সাঁঝেলির গলায় অনুরোধের সুর। অর্ক বলল, 'ঠিক আছে। তুমি যখন বলছ, একা যাব না।'

...স্নান টান করে, রেডি হয়ে বেলা বারোটার সময় ডাঃ সুব্রত মিত্রের চেম্বারে গিয়ে অর্ক দেখল, একেবারে লোকজন নেই। দেখে ও নিশ্চিন্ত হয়ে গেল, অনেকক্ষণ ধরে কথা বলা যাবে। ডাঃ মিত্রকে দেখে অবশ্য ওর ধারণা পাল্টে গেল। এই প্রথম সাঁঝেলির বাবার সঙ্গে ওর পরিচয় হল। বয়স প্রায় ষাটের কাছাকাছি। দেখেই মনে হয়, জীবনে খুব সফল মানুষ। আমেরিকার এক হাসপাতালে হাত পাকিয়ে এসেছেন। বেলভিউ নার্সিংহোমে কিডনি ট্রান্সপ্ল্যান্ট করেছেন প্রায় শ'তিনেক। কথায় কথায় বেরিয়েও গেল, দাদুকে ডাঃ মিত্র ভালো করে চিনতেন। অর্ক জানত, একটা সময়ে দাদু প্রায়ই একজন ডাক্তারের কাছে যেত। তা হলে ইনিই সেই ডাক্তার। সময় নষ্ট না করে অর্ক নয়াগ্রামের ঘটনাটা অল্প কথায় বলল। তার পর জিজ্ঞেস করল, 'হনুমানের কিডনি কি মানুষের দেহে ট্রান্সপ্ল্যান্ট করা সম্ভব?'

ডাঃ মিত্র বললেন, 'না এটা কোনও ভাবেই সম্ভব নয়। স্পিসিস বেরিয়ার জাম্প করে অর্থাৎ একটা স্পিসিসের অর্গান কেটে নিয়ে অন্য একটা স্পিসিসের বডিতে লাগানোকে বলে জেনোট্রান্সপ্ল্যান্টেশন। যেমন ধরুন, হনুমানের কিডনি কেটে মানুষের দেহে প্রতিস্থাপন করা, বা বেড়ালের যকৃৎ কেটে বাঘের শরীরে লাগানো। এ নিয়ে প্রচুর কাজ হয়েছে, এখনও হচ্ছে সারা পৃথিবীতে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত তেমন সফল হয়নি।'

অর্ক বলল, 'কেন হয়নি ডাঃ মিত্র।'

'বলছি। এই বিষয়টা আগে আপনাকে বুঝে নিতে হবে। আমাদের শরীরের মধ্যে প্রায় ত্রিশ চল্লিশ কোটি কোষ আছে, যারা একেবারে ডেডিকেটেড টু দ্য ওয়ার্ক অব আইডেন্টিফাইং, কে আমাদের

নিজের, কে আমাদের পর। এই কোষগুলো বেশিরভাগই থাকে রক্তে। কিছু থাকে গ্রন্থি বা অন্য জায়গায়। [illegible]ক লাখ কোষ আছে, যাদের কাজ হল শরীরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে খবর সংগ্রহ করা। দেখা, [illegible]রের ভেতরে এমন কেউ ঢুকেছে কী না, যে আমাদের নিজের নয়,ফরেন অর্থাৎ বহিরাগত। খবরটা পেলেই হেডঅফিসে পাঠিয়ে দেয়।

হেডঅফিসের কাছেও কয়েক লাখ কোষ আছে। তারা তখন উঠে পড়ে লাগে বহিরাগত কোষগুলোকে ধ্বংস করার জন্য। এই যে সিস্টেমটা, তাকে এককথায় আমরা বলি ইমিউনিটি। আর একে ঘিরে যে সাবজেক্ট, সেটা ইমিউনোলজি। কী বোঝা যাচ্ছে?'

অর্ক বলল, 'হ্যাঁ ডক্টর মিত্র, বুঝতে পারছি।'

'ইমিউনোলজির একটা পার্ট হচ্ছে শরীরে সংক্রমণ আটকানো। আর একটা হচ্ছে ক্যান্সার ছড়িয়ে পড়া আটকানো। আরও একটা গ্রুপ আছে, তাদের কাজ হল বহিরাগত টিস্যুকে চিনে তাকে নষ্ট করা। এই গ্রুপটাকে বলা হয়, ট্রান্সপ্ল্যান্ট ইমিউনোলজি। অতএব, আমি যদি মানুষের রক্তের গ্রুপ মিলছে এমন দেখেও, একজন মানুষের কিডনি বের করে, সেই কিডনিটাকে বাঁচিয়ে রেখে, অন্য একজন মানুষের দেহে সেই কিডনি লাগিয়ে দিই, তা হলে এক ঘণ্টার মধ্যে, যার দেহে কিডনি লাগিয়েছি, তার শরীর কিন্তু চিনতে পারবে এটা আমার কিডনি নয়। তখনই সে কিডনিটাকে ধ্বংস করার জন্য উঠে পড়ে লাগবে। এই প্রক্রিয়াটাকে বলে রিজেকশন। এই প্রত্যাখ্যান রোধ করার জন্য যার দেহে কিডনি লাগানো হল, তার ইমিউনিটিকে সাপ্রেস করে দেওয়া হয়। একে বলে ইমিউনোসাপ্রেশন। এবার ধরুন, হনুমান বা অন্য কোনও জন্তু থেকে যদি কিডনি নিয়ে আমরা মানুষের দেহে লাগাই, তা হলে যে লেভেলের রিজেকশন হবে, তা কোনও ভাবেই ইমিউনোসাপ্রেসন করেও আটকানো সম্ভব নয়। কারণ, হিউজ

নিউরোলজিয়াল বেরিয়ার। স্পিসিসটাই যে আলাদা।'

'তা হলে জেনোট্রান্সপ্ল্যান্টেশনের গবেষণা কী নিয়ে হচ্ছে?'

'জেনোট্রান্সপ্ল্যান্টেশন যা রিসার্চ হয়েছে, সেটা হচ্ছে, জন্তু জানোয়ারের কোষগুলোকে... সেটা কিডনি হোক বা লিভারের... আগে থেকে এমন কোনও ভাবে ট্রিট করে নেওয়া, যাতে মানুষের দেহে লাগানোর পর, মানুষের দেহ সেগুলোকে বহিরাগত বলে চিনতে না পারে। এটাকে বলা হয়, ইনডাকশন অব ইমিউনোজেনিক টলারেন্স। প্রচুর কাজ হয়েছে এটা ইনডিউস করা নিয়ে। মোস্টলি শুয়োরের কিডনির ওপর। পরীক্ষা নিরীক্ষা হয়েছে, কীভাবে একটা অ্যানিম্যাল অর্গানকে মডিফাই করা যায়। যাতে সে নর্মাল বায়োলজিক্যাল, ফিজিওলজিক্যাল ফাংশানটা করতে পারে। দুর্ভাগ্যের বিষয়, এখনও পর্যন্ত এই রিসার্চ সাকসেসফুল হয়নি। আমাদের ট্রান্সপ্ল্যান্ট মেডিসিনের একজন কিংবদন্তী আছেন, তাঁর নাম প্রোফেসর পি কে মরিস। বছর পনেরো আগে উনি একটা কথা বলেছিলেন, এখন মনে হয় সেটাই সত্যি। দ্য সায়েন্স অব জেনোট্রান্সপ্ল্যান্টেশন হ্যাজ গট আ ব্রাইট ফিউচার। ইট উইল অলওয়েজ হ্যাভ আ ব্রাইট ফিউচার। কী বললাম, বুঝতে পারলেন কথাটা? আপনার আন্দাজ মতো, কোনও হনুমানের কিডনি কেটে নিয়ে এসে মানুষের দেহে লাগিয়ে দেওয়া, সিম্পলি ইম্পসিবল।'

'হনুমানের কিডনি কেটে নেওয়ার কারণটা তা হলে কী হতে পারে ডাঃ মিত্র?'

মাথা পাগল কেউ হয়তো, কোনও সার্জিক্যাল এক্সপেরিমেন্ট করতে চাইছে। অনেক সময় সার্জিক্যাল ট্রেনিংয়ের জন্য অ্যানিম্যাল ল্যাব তৈরি করা হয়। তার জন্যও দরকার হতে পারে। একটা উদাহরণ দিই। এখন হার্ট বাইপাস সার্জারি জলভাত হয়ে গেছে। বিশ বছর আগে তো ছিল না। অনেকেই জানে না, হার্টের বাইপাস সার্জারির পদ্ধতি নিয়ে আমাদের এই কলকাতাতেও তখন অনেক রিসার্চ হয়েছিল। যাঁরা করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন ডাঃ অজিত বাসু, ডাঃ ভূমেন গুহরায়রা। আমি জানি, ভূমেন গুহরায়রা স্পেশাল পারমিশন

নিয়েছিলেন তখন জন্তু জানোয়ারের ওপর এক্সপেরিমেন্ট করার জন্য। পাঁচটা না ছ'টা কুকুরের ওপর প্রথমে ওঁরা এক্সপেরিমেন্টটা করেন। তার পর ওঁরা মানুষের বাইপাস সার্জারি করেন। মেদিনীপুরে এই যে হনুমানগুলোর কথা আপনি বলছেন, তাদের ও পর কেউ কোনও ধরনের এক্সপেরিমেন্ট করছেন কী না, সেটা খুঁজে দেখতে পারেন।'

'আর কোনও পসিবিলিটি?'

'আরেকটা সম্ভাবনাও আছে। এই জেনোট্রান্সপ্ল্যান্টেশন বা ইমিউনোলজি নিয়ে যে লেভেলের রিসার্চ হচ্ছে, তার পরিকাঠামো আমাদের দেশে নেই। আছে আমেরিকা, ব্রিটেন, জার্মানির মতো দেশে। এশিয়াতে একমাত্র থাকতে পারে জাপানে। এই যে উন্নত দেশগুলোর কথা বললাম, সেখানে অ্যানিম্যাল রাইটস অ্যাকটিভিস্টরা ভীষণ স্ট্রং। ওখানে জন্তু জানোয়ারের ওপর কোনও এক্সপেরিমেন্ট করতে চাইলে, নানা আইনি জটিলতা পেরোতে হয়। আর তা ছাড়া খরচসাপেক্ষ ব্যাপারও। এমনও হতে পারে, ওরা কেউ আউটসোর্স করছে আমাদের মতো থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রিতে। হয়তো কোনও এক্সপেরিমেন্টের জন্য হনুমানের কিডনি ওদের দরকার। অনেক কম টাকায় এখানকার কেউ তা সাপ্লাই দিচ্ছে।'

'কিন্তু ডক্টর মিত্র, সেই কিডনি কতক্ষণ বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব।'

'গুড কোয়েশ্চেন। ব্লাড সাপ্লাই ছাড়া কোনও অর্গান বেঁচে থাকতে পারে না। হনুমান হোক অথবা মানুষের। ধরুন একটা কিডনির ভেতর কয়েক কোটি কোষ আছে। রক্ত সঞ্চালন না হলে তো সেই কোষগুলো মরে যাবে। একটা জিনিস অবশ্য করা যায়। সেলুলার মেটাবলিজম অর্থাৎ প্রত্যেক কোষ যে কাজগুলো করে, তা কমিয়ে দেওয়া বা কোষগুলোকে সাময়িক ঘুম পাড়িয়ে দেওয়া। এটা যদি করা

যায়, তা হলে সেই কিডনিকে কয়েক ঘণ্টা বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব। এই ঘুম পাড়িয়ে দেওয়া হয় হাইপোথেরামাইজ করে, অর্থাৎ টেম্পারেচার কমিয়ে। ওই কোষগুলোর ভেতর একটা ঠাণ্ডা সলিউশন পারফিউশন করা হয়, যাতে তখনকার মতো কোষগুলো ঘুমিয়ে পড়ে।'

'ম্যাক্সিমাম কতক্ষণ ঘুমিয়ে থাকতে পারে?'

'কোষগুলো দু'ঘণ্টা ঘুমিয়ে থাকবে, না কি চব্বিশ ঘণ্টা, সেটা নির্ভর করে কী ধরনের ফ্লুইড পারফিউশন করা হচ্ছে। এই ফ্লুইড নিয়েও রিসার্চ চলছে। সব থেকে সেরা হচ্ছে ইউ ডবলিউ সলিউশন, কলিন সলিউশন। এগুলো যদি ব্যবহার করা যায়, তা হলে ট্রান্সপ্ল্যান্ট করার সময় একটা কিডনি চব্বিশ থেকে ছাব্বিশ ঘণ্টাও বাঁচিয়ে রাখা যায়। তবে খুব খরচসাপেক্ষ বলে আমাদের দেশে আমরা এ সব ব্যবহার করতে পারি না। আমরা এক ধরনের ইনডিজেনাস সলিউশন ব্যবহার করি। আর খুব অল্প সময়ের মধ্যে কাজটা সেরে নিই। যিনি কিডনি দিচ্ছেন, আর যার দেহে ট্রান্সপ্ল্যান্ট করা হচ্ছে, তাদের দু'জনকে একই সঙ্গে তৈরি রাখি। ডোনারের দেহ থেকে কিডনি নিয়েই যাতে সঙ্গে সঙ্গে কয়েক মিনিটের মধ্যে অন্যজনের দেহে লাগিয়ে দেওয়া যায়।

'তার মানে... আপনি বলছেন, সলিউশনটা ইম্পর্ট্যান্ট।'

'ঠিক তাই। আমাদের কাজটা অনেক কঠিন। অনেক তাড়াতাড়ি করতে হয়।'

'আচ্ছা, এমন কী হতে পারে, যারা এখান থেকে হনুমানের কিডনি নিয়ে যাচ্ছে, তারা যদি ইউ ডবলিউ সলিউশন পাঠিয়ে দেয়, তা হলে স্বচ্ছন্দে কিডনিগুলো ঘুম পাড়িয়ে এখান থেকে ওদের দেশে পাঠিয়ে দেওয়া সম্ভব।'

'ইউ নেভার নো মিঃ স্যান্যাল। কিডনিগুলো বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব কী না, তা ডেফিনিট বলতে পারব না। তবু একটা কথা বলি, জেনোট্রান্সপ্ল্যান্টেশনের মলিকুলার রিসার্চ এখন এমন জায়গায় গেছে

যে, হয়তো জীবিত কিডনি ওদের দরকার নাও হতে পারে। রিসার্চ কী নিয়ে হচ্ছে, সেটাই তো আমরা জানি না। এমনও হতে পারে, হনুমানের কিডনি কেটে নিয়ে যদি চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে বিদেশের কোনও ল্যাবরেটরিতে পৌঁছে দেওয়া যায়, তা হলেও সেগুলো ওদের কাজে লেগে যাবে।'

বলতে বলতে ডাঃ মিত্র একবার হাতঘড়ির দিকে তাকালেন। তার পর উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'যাক সে কথা, আপনার আর কিছু জিজ্ঞেস করার আছে মিঃ স্যান্যাল? আমাকে কিন্তু এখন বেলভিউ নার্সিংহোমে যেতে হবে। একটা অপারেশন আছে।'

অর্কও উঠে দাঁড়িয়ে, বলে 'না আর কিছু জানার নেই। আমার লেখার সঙ্গে যদি আপনার কয়েকটা মন্তব্য জুড়ে দিই, তা হলে কি আপত্তি আছে।'

ডাঃ মিত্র হেসে বললেন, 'দেখবেন, ঠিক জায়গায় যেন ঠিক কথাটা বসে। রিপোর্টারদের বিশ্বাস নেই। একবার এক রিপোর্টারের জন্য আমি খুব প্রবলেমে পড়ে গিয়েছিলাম।'

'কী রকম প্রবলেম?'

'আর বলবেন না। আমার এক এন আর আই বন্ধু আর আমি মিলে ঠিক করেছিলাম, একটা কিডনি হসপিটাল করব। কলকাতার লোক কিডনির ট্রিটমেন্ট করার জন্য সাউথের হসপিটালে ছুটে যায়। সেটা আটকাতে হবে। এখানে এত ভালো ভালো ডক্টর আছেন। তাসত্ত্বেও, লোকে ভিন রাজ্যে যাবে কেন?

কার কাছ থেকে যেন খোঁজ পেয়ে এক রিপোর্টার আমাদের কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন, হসপিটালটা কোথায় করছেন? আমি বললাম, শহরের আশপাশে সরকারের কাছে আমরা একটা জমি চেয়েছি। জমিটা পেলে আমরা কাজ শুরু করে দেব। সব শুনে উনি তখন বললেন, যদি এখানে জমি না পান, তা হলে কী করবেন? তখন আমার বন্ধু বলল, না পেলে তখন আমাদের

বাঙ্গালোর বা অন্য কোনও শহরে যেতে হবে। পরদিন রিপোর্ট পড়ে তো আমাদের মাথায় হাত। রিপোর্টার ভদ্রলোক লিখেছেন, রাজ্য সরকার জমি দিচ্ছে না বলে, কিডনি হসপিটাল অন্য রাজ্যে চলে যাচ্ছে। ওই ঘটনার পর থেকে আমি আর কোনও রিপোর্টারকে ইন্টারভিউ দিই না। নেহাত লিলি রিকোয়েস্ট করল, তাই আপনার সঙ্গে কথা বললাম। আচ্ছা, এখন আসি তা হলে।'

শুনে অর্ক মনে মনে হাসল।

২৫

সকাল থেকেই শুধু খারাপ খবর শুনতে পাচ্ছেন প্রোজ্জ্বল। সাতটার সময় রাজা ফোন করে বলল, ওর বাড়িতে কাল রাতে নাকি পুলিশ গিয়েছিল। ফারুখ ছেলেটা সম্পর্কে নানা কথা জিজ্ঞেস করে গেছে। এই ছেলেটাকে রাজা চিড়িয়াখানায় ফিট করেছিল। একটা হরিণ মার্ডার করে ছেলেটা পুলিশের নজরে পড়ে গেছে। গাণ্ডুটার কী দরকার ছিল, একটা রেয়ার স্পিসিস টার্গেট করার? ওকে গণ্ডগোল পাকানোর সুপারি দেওয়া হয়েছিল। কাজটা তো অন্যভাবেও করতে পারত। কী ফালতু ছেলেকে ফিট করল রাজা? এত অল্প সময়ের মধ্যে পুলিশ আইডেন্টিফাই করে ফেলল? নাহ, রাজার ওপর আস্থা চলে যাচ্ছে প্রোজ্জ্বলের। ওর বোধবুদ্ধি লোপ পেয়ে গেছে। গাধা কোথাকার। না হলে মোবাইলে ফোন করে? এই নম্বরটা অবশ্য অন্য কাউকেই দেন না প্রোজ্জ্বল। নিজের খুব বিশ্বস্ত দু'চারজন ছাড়া আর কেউ জানে না।

সাড়ে ন'টার মধ্যে রাজাকে অফিসে আসতে বলে দিয়েছেন প্রোজ্জ্বল। সেখানেই বলে দিতে চান,

ফারুখ ছেলেটাকে কীভাবে ঝেড়ে ফেলবেন। রাজা বলল, ছেলেটা নাকি এখন বর্ডারের ওপারে। ধরা পড়ার কোনও সম্ভাবনা নেই। কিন্তু অ্যান্টিসোশ্যালদের বিশ্বাস নেই। হয়তো এখানেই কোথাও ঘাপটি মেরে বসে আছে। রাজা সেটা জানে না। ওর সঙ্গে যে ছেলেটার যোগাযোগ আছে, সেটা পুলিশ জানল কী করে, প্রোজ্জ্বল ভেবে পাচ্ছেন না। কে বলে দিল পুলিশকে কথাটা? রাজাকে শিখিয়ে দিতে হবে, ছেলেটাকে যে ও চেনে, সেটা পুলিশের কাছে কবুল না করতে। তার পর পুলিশকে তিনি দেখে নেবেন। ওয়াটগঞ্জ থানার ও সি এখন কে, সেই খবরটা রাজাকে তিনি জেনে আসতে বলেছেন। তেমন হলে রথীন সরকে দিয়ে, তাকে একটু টাইট দিয়ে দেবেন।

ন'টার সময় প্রোজ্জ্বল অফিসে পৌঁছতেই রিমিতা বলল, 'স্যার, মুম্বই থেকে মিঃ কারমারকর আপনাকে ফোন করেছিলেন। আপনাকে নাকি মোবাইলে উনি পাচ্ছিলেন না।'

পাবে কী করে? দু'টো মোবাইলই প্রোজ্জ্বল অফ করে রেখেছেন। রিমিতাকে তিনি বললেন, 'কারমারকরকে ধরে লাইনটা আমায় দাও।'

নিজের চেম্বারে এসে চেয়ারে বসতে না বসতেই ফোনটা বেজে উঠল। ও প্রান্তে কারমারকর বলল 'স্যার, সুমতি আজ রেজিগনেসন দিয়ে গেছে।'

ভূমিকম্প হলেও এতটা চমকে উঠতেন না প্রোজ্জ্বল। বললেন, 'হোয়াট, কী বলছ তুমি? সুমতি চাকরি ছেড়ে দিয়েছে?'

'হ্যাঁ স্যার। আমাকে বলে গেল, সরপুরিয়াদের কোম্পানিতে ও আরও বেশি মাইনের চাকরি পেয়েছে। তাই ছেড়ে দিচ্ছে।'

'ওকে আটকানোর চেষ্টা করলে না কেন?'

'করে লাভ হত না স্যার। চাকরি করার জন্য ও এখানে আসেনি। ওকে এখানে প্ল্যান্ট করেছিলেন সরপুরিয়ারা। প্রায়ই ওদের অফিসে ও যেত। ইন ফ্যাক্ট, এখন শুনতে পাচ্ছি, বান্দ্রায় সুমতি যে ফ্ল্যাটে থাকে,

সেটা সরপুরিয়াদের। এ সব ইনফর্মেশন আমি দু'তিন দিন আগে পেয়েছি। আগে জানলে আপনাকে অ্যালার্ট করে দিতাম।'

কারমারকর বলে যাচ্ছে বটে, প্রোজ্জ্বলের বিশ্বাস হচ্ছে না। সরপুরিয়া অনেক বড় কোম্পানি। ওদের টার্নওভার পাঁচ হাজার কোটি টাকার। মিত্র কনস্ট্রাকসনকে ওরা প্রতিদ্বন্দ্বী বলে মনে করতেই পারে না। না, না, কর্পোরেট রেষারেষি নয়। সুমতি চাকরি ছেড়েছে অন্য কোনও কারণে। মিত্র কনস্ট্রাকশনের সুবিধার জন্য এই ক'দিন আগেও সুমতি মহারাষ্ট্র গভর্নমেন্টের এক ডেপুটি সেক্রেটারির সঙ্গে গোয়ায় তিনটে দিন কাটিয়ে এসেছে। দেড়শো কোটি টাকার একটা প্রোজেক্ট স্যাংশন হওয়ার মুখে। আর তা ছাড়া ও যখন যা চেয়েছে, প্রোজ্জ্বল দিয়েছেন। সেই মেয়ে হঠাৎ চাকরি ছাড়ল কেন, সেটাই আশ্চর্যের।

'হ্যালো স্যার, আপনি কি লাইনে আছেন?'

কারমারকরের প্রশ্নটা শুনে প্রোজ্জ্বল বললেন, 'ইয়েস, ইয়েস। টেক ইট ইজি কারমারকর। ইট'স আ প্রফেশনাল ওয়ার্ল্ড। একটা সুমতি গেলে, আরেকটা আসবে। তুমি অন্য কাউকে দেখ। পরে কথা হবে।' বলেই ফোনটা ছেড়ে দিলেন প্রোজ্জ্বল।

মনটা খচখচ করতে লাগল। না, না, সুমতিকে ছেড়ে দিলে চলবে না। ওর সঙ্গে নিজে কথা বলতে হবে। দরকার হলে, বড় টোপ দিয়েও ওকে রাখতে হবে। চাকরি ছাড়ার কারণটা সুমতির মুখ থেকে শোনার জন্য মুম্বইয়ে ফোন করলেন তিনি, অনেকক্ষণ রিং হওয়ার পর ফোনটা এসে ধরল সুমতি, 'বল!'

'হঠাৎ কী হল, রেজিগনেসন দিলে?'

'প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে, তাই চলে এলাম।'

'তার মানে? তোমার কথা আমি কিছুই বুঝতে পারছি না ডার্লিং।'

pathagar.net

' ডোন্ট কল মি ডার্লিং, ইউ বাস্টার্ড। একটা ইনফর্মেশন তোমায় দিচ্ছি প্রোজ্জ্বল। তোমার সঙ্গে প্রেমের অভিনয় করার জন্য, তোমার বউ দীপা আমাকে হায়ার করেছিল। এ বার কি বুঝতে পেরেছ, কোন প্রয়োজনে তোমার অফিসে আমি চাকরি নিয়েছিলাম? ইন ফ্যাক্ট দীপাই বলেছিল। তোমার ক্যারেক্টার অ্যাসাসিনেট করতে।'

মাই গড, কী বলছ সুমতি! মুম্বই অফিসে ওকে প্ল্যান্ট করেছিল দীপা? তার মানে সুমতির সঙ্গে ফিজিক্যাল রিলেশনের কথাও নিশ্চয় জেনে গেছে? বিচ্, এ ছাড়া আর কোনও বিশেষণ মনে এল না প্রোজ্জ্বলের। চলে যাওয়ার দিন দীপা বলে গেছিল, 'তোমার মান ইজ্জত আমি ধুলোয় লুটিয়ে দেব।' কথাটা তখন তিনি সিরিয়াসলি নেননি। কিন্তু এখন বুঝতে পারছেন, বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়ে দীপা হাত গুটিয়ে বসে থাকেনি। মাথায় দপ করে আগুন জ্বলে উঠল। তবুও প্রোজ্জ্বল বললেন, 'দীপার মতো একটা ভালো মেয়ের নামে মিথ্যে বলছ? ইউ ব্লাডি হোর।' 'কী বললে? আমি হোর... বেশ্যা। আমি যদি বেশ্যা হই, তা হলে তোমার বউও তো বেশ্যা। আমি তোমাদের মতো কর্পোরেটদের সঙ্গে শুই। আর তোমার বউ শোয় এন্টারটেনমেন্ট জগতের লোকেদের সঙ্গে। তফাতটা-শুধু এই।'

কথগুলো শুনে মাথা ঠিক রাখতে পারলেন না প্রোজ্জ্বল। গর্জে উঠলেন, 'স্টপ টকিং ননসেন্স।'

ও প্রান্ত থেকে পাল্টা চিৎকার করল সুমতি, 'থাম তো। দীপা হঠাৎ ভালো মেয়ে হয়ে গেল? আর এতদিনে সেটা তুমি বুঝলে? তা হলে ওর ওপর অত্যাচার করতে কেন? শোন, তোমার মতো অমানুষের সঙ্গে কথা বলার প্রবৃত্তি নেই। এই কয়দিনে তোমাকে আমি বুঝে গেছি, তুমি একজন পার্ভার্টেড উন্মাদ ছাড়া আর কিছু নও। সব প্রমাণ আমি

রেখে দিয়েছি। এখন ছাড়ছি।'বলেই ও লাইন কেটে দিল।

ফোনটা টেবলে রেখে প্রোজ্জ্বল গুম হয়ে বসে রইলেন। একটা মানুষ এমনভাবে বদলে যেতে পারে, তিনি ভাবতেও পারেননি। গত একমাসে সুমতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা এমন পর্যায়ে গেছিল, প্রোজ্জ্বল নিজেই ভাবছিলেন, দীপাকে ডিভোর্স দেবেন। তার পর সুমতিকে কলকাতায় নিয়ে এসে লিভ টুগেদার করবেন এবং তাতে সুমতি যে আপত্তি করবে না, সে সম্পর্কে তিনি নিশ্চিত ছিলেন। সুমতি প্রায়ই দীপা সম্পর্কে জানতে চাইত। শুনে দীপা সম্পর্কে নিন্দা করত। প্রোজ্জ্বল তখন ঘুণাক্ষরেও টের পাননি, দীপার সঙ্গে ওর যোগাযোগ রয়েছে। সুমতিকে নিয়ে চিন্তা করার সময় একটা সম্ভাবনা বিদ্যুতের মতো ঝিলিক মেরে গেল মাথায়। প্রমাণ রেখেছে মানেটা কী? যৌন মিলনের ছবি টবি তুলে রাখেনি তো সুমতি?

মুম্বইয়ে আকছার এ রকম ব্ল্যাকমেলিং হয়। ঠাণ্ডা মাথায় ভাবতে লাগলেন প্রোজ্জ্বল। পরিচয় হওয়ার দিনই, সুমতি টোপ দিয়ে ওর বান্দ্রার ফ্ল্যাটে নিয়ে গেছিল। কে জানে, ওর ফ্ল্যাটে কোথাও ক্যামেরা ফিট করা ছিল কী না? হয়তো দীপাই শিখিয়ে দিয়েছিল ওকে এ সব, প্রোজ্জ্বলের মান ইজ্জত ধুলোয় লুটিয়ে দেওয়ার জন্য। হতে পারে। জগতে কোনও কিছুই অসম্ভব নয়। আফশোস করতে লাগলেন প্রোজ্জ্বল। কেন ফাঁদে পা দিলেন? সিনেমার লাইনের একটা ভ্রষ্টা মেয়েকে কেন বিশ্বাস করতে গেলেন?

সুমতিকে মাঝে কলকাতাও নিয়ে এসেছিলেন তিনি। দিন তিনেক রেখে দিয়েছিলেন হোটেল হিন্দুস্তানে। মুর্খের মতো চিড়িয়াখানার জু সিটি প্রোজেক্টের কথাও তখন ওকে খুলে বলেন। সুমতি আবদার করেছিল, ' তোমার প্রোজেক্টটা যদি হয়, আমাকে কিন্তু একটা অ্যাপার্টমেন্ট গিফট কোর। তোমার কাছে মাঝে মাঝে এসে থাকা যাবে তা হলে।'

প্রোজ্জ্বল বলেছিলেন, 'অফকোর্স ডার্লিং। ভগবানের কাছে প্রে কর, যাতে এই প্রোজেক্টটা হাতে পাই।'

ওই প্রোজেক্টের কথা সুমতি যে এখন সরপুরিয়াদের ওখানে পুরোটা ঢেলে দেবে না, তার কী গ্যারান্টি আছে? ইস, কী মারাত্মক ভুলই না করেছেন তিনি। রজত গোস্বামী বলেছিল বটে, 'আগামী সাড়ে সাত মাস সময়টা তোর ভালো যাবে না। তুই রাজরোষে পড়বি। মানে... পুলিশের ঝামেলায়। এই সময়টায় তুই অনেক ভুল ডিসিশন নিবি। ফলে তোর আর্থিক ক্ষতিও হয়ে যাবে।' এই সাড়ে সাত মাস সময়টা, কবে শুরু হচ্ছে বা কবে শেষ—তা অবশ্য মনে নেই প্রোজ্জ্বলের। বোধহয় শুরু হয়ে গেছে। রজত ওঁর স্কুলের বন্ধু, জ্যোতিষচর্চা করে। ওটাই এখন ওর পেশা। মাঝে মাঝে এই অফিসে আড্ডা মারতে আসে।

একবার জন্ম সময় আর তারিখটা চেয়ে নিয়েছিল। তার পর থেকে প্রায়ই নিজে থেকে ভবিষ্যদ্বাণী করে যায়। এখন মনে হচ্ছে, রজত তা হলে ঠিকই বলেছিল।

ইন্টারকমে রিমিতার গলা শুনতে পেলেন প্রোজ্জ্বল, 'স্যার, নিরঞ্জন রাফতান বলে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আপনার অ্যাপয়েনমেন্ট আছে ন'টা পঁয়তাল্লিশে। উনি এসে গেছেন। পাঠিয়ে দেব?'

সুমতির সমস্যাটাকে তৎক্ষণাৎ মাথা থেকে সরিয়ে দিলেন প্রোজ্জ্বল। এখন তিনি মাথা ঘামাবেন ভগবানপুর নিয়ে। ব্যস্ত মানুষেরা দ্রুত বদলাতে পারেন। সেই গুণটা তিনি আয়ত্ত্ব করে ফেলেছেন। রাফতান লোকটাকে অনেক কষ্টে রাজি করিয়েছেন অফিসে আসার জন্য। ভগবানপুরে সংঘর্ষ কমার কোনও লক্ষণ নেই। চোরাগোপ্তা খুন খারাপি চলছেই। মন্দের ভালো, খবরের কাগজগুলো ইদানীং আর তেমন লেখালেখি করছে না। রথীন সরের ওপর আর আস্থা রাখতে পারছেন না প্রোজ্জ্বল।

লোকটা ঘরে ঢুকতেই প্রোজ্জ্বল ধরে নিলেন, মাথা মোটা টাইপের। চামসে হয়ে যাওয়া একটা শুয়োর। ঝাঁ চকচকে এই রকম একটা অফিসে বোধহয় আগে কখনও ঢোকার সুযোগ পায়নি। তাই একটু থম মেরে গেছে। পরনে ধুতি, ফুল হাতা শার্ট। রথীন সরের মতো দুঁদে লোকের সঙ্গে এ কী করে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে, সেটা ভেবে প্রোজ্জ্বল একটু অবাকই হলেন। সবাইকে যা বলেন, সেই কথাটাই তিনি বললেন, 'কী খাবেন? ঠাণ্ডা না গরম? যা গরম পড়েছে, তাতে ঠাণ্ডাই বলি? কী বলেন?'

'না, না। আমার সময় খুব কম। বলেন, কী বলতে ডেকেছেন?'

শুরুতেই একটু ধাক্কা খেলেন প্রোজ্জ্বল। বলে কী, সময় কম। কী এমন রাজকার্যে ব্যস্ত লোকটা যে, সময় নেই। তবুও মুখে হাসি এনে তিনি বললেন, 'নিরঞ্জনবাবু, আপনার সঙ্গে সোজাসুজি একটা ডিল করতে চাই। কী রকম টাকা পেলে আপনারা ভগবানপুর ছেড়ে চলে যাবেন?'

'তার আগে আমাকে বলতে হবে, আপনার ইন্টারেস্টটা কী? আমরা তো শুনেছি, আপনি রথীন সরের লোক। আমাদের টাকাই বা দিতে চাইছেন কেন?

মাই গড, এই লোকটা তো আশিস ভটচাযের বাপ। শুয়োর নয়, শেয়াল। খোঁজ খবর নিয়েই এসেছে তা হলে। খুব সাবধানে কথা বলতে হবে। প্রোজ্জ্বল বললেন, 'আমার তো একটা ইন্টারেস্ট আছেই। সেটা আপনাকে বলেই দিচ্ছি। ধরুন, যদি ভগবানপুরে ইকো বায়োলজিক্যাল পার্ক হয়, তা হলে সেটা তৈরি করার দায়িত্ব পাব আমি। প্রচুর লোকের কর্মসংস্থান হবে। আপনাদের অনেকেই চাকরি পাবে। ফ্যামিলি পিছু একজন করে কথা দিচ্ছি।'

রাফতান পাত্তাই দিল না। বলল, 'দায়িত্বটা যে আপনিই পাবেন, তার কী গ্যারান্টি আছে?'

প্রশ্ন করার ধরনটা দেখে প্রোজ্জ্বলের মাথা ফের গরম হয়ে গেল। তবুও বললেন, ' এ প্রসঙ্গে

আপনার সঙ্গে আলোচনায় যাব না। তবে আমি ড্যাম সিওর। যাক গে, আপনাকে যে প্রোপোজালটা দিলাম, সে ব্যাপারে কী ভাবছেন?'

'ভাবাভাবির তো কিছু নেই। আন্দোলন শুরু হওয়ার আগে যদি প্রোপোজালটা দিতেন, তা হলে হয়তো ভাবতাম। আমাদের ছত্রিশটা লোক খুন হয়ে গেছে। একশোর বেশি বাড়ি ঘর তছনছ হয়ে গেছে। এখন আপনি চাকরি দেওয়ার কথা বলছেন? এখন কি আর সেই পরিস্থিতি আছে? যাক সে কথা। একটা প্রশ্ন করি। আপনি যে ডেকেছেন, সেটা রথীন সর জানতেন?'

'এখনও পর্যন্ত না। ইন ফ্যাক্ট, আমার সঙ্গে ওঁর গত এক সপ্তাহ কথাও হয়নি।'

'উনিই কি আমার সঙ্গে কথা বলতে বলেছিলেন?'

'আপনি বিশ্বাস করুন বা না করুন, নো। সত্যি কথা বলতে কী, আমি ব্যবসা করে খাই। নিজের ফায়দার কথা আগে ভাবি। বুঝতে পারছি, আপনার সঙ্গে লড়াইয়ে রথীন সররা ভালো জায়গায় নেই। ওরা আরও খুন খারাপির রাস্তায় যাচ্ছেন। তাতে ফল ভালো হবে বলে আমার অন্তত মনে হয় না। তাই আপনার সঙ্গে কথা বলার প্রয়োজন মনে করছি। আপনি কিন্তু সাবধানে থাকবেন। ওরা খুব শিগগির আপনাকে টার্গেট করবে।'

রাফতান একটুও ভয় পেল বলে মনে হয় না। তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বলল, 'কে কখন টার্গেট

য়, কেউ বলতে পারে? যাক গে, তাড়াতাড়ি বলুন, আপনার আর কী বলার আছে। আমাকে এখুনি গবানপুর ফিরতে হবে।'

'ওই যে বললাম, কত টাকা পেলে ভগবানপুর ছেড়ে আপনারা চলে যাবেন?'

'লড়াইটা থেমে গেছে প্রোজ্জ্বলবাবু। আমাদের আর কেউ উচ্ছেদ

করতে পারবে না। আচ্ছা, উঠি তাহলে? কখনও যদি টাকার দরকার হয়, আপনার কাছে আসব।'

বলেই রাফতান উঠে পড়ল। নিজের গালেই যেন একটা থাপ্পড় খেলেন প্রোজ্জ্বল। লোকটাকে যত নির্বোধ বলে মনে হয়েছিল, আদপে ততটা নয়। ওর কথাগুলোও কেমন যেন একটু অদ্ভুত লাগল। 'রথীন সর জানে', না বলে লোকটা বলল, 'রথীন সর জানতেন?' এর মানেটা কি? আরেকবার লোকটা বলল, 'রথীন সরই কি আমার সঙ্গে কথা বলতে বলেছিলেন?' রাফতান অল অ্যালং পাস্ট

টেন্স-এ কথা বলে গেল। কেন? 'বলেছিলেন' না বলে, ওর তো বলা উচিত ছিল, 'বলেছেন'। তা হলে?

লোকটা ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর চেয়ার ছেড়ে উঠে প্রোজ্জ্বল অ্যাটাচড বাথরুমে গেলেন। চোখ মুখে জ্বালা করছে। জ্বালাটা কমানোর জন্য তিনি জলের ছিটে দিতে লাগলেন। চেম্বারে ফোন বাজছে। তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছে ঘরে ঢুকে ফোনটা ধরতেই রাজার উত্তেজিত গলা শুনতে পেলেন প্রোজ্জ্বল, 'স্যার খবরটা কি শুনেছেন?'

বুকটা কেঁপে উঠল প্রোজ্জ্বলের, 'কী খবর?'

'রথীন সর সকাল ন'টার সময় মার্ডারড হয়েছেন। চিংড়িহাটায় ওর গোপন পার্টি অফিসে। টিভি- তে খবরটা দেখাচ্ছে।'

দম বন্ধ করে প্রোজ্জ্বল বললেন, 'মার্ডারড হয়েছে। কী করে হল?'

'টিভি-তে তো বলল। গোলাগুলিতে। স্পট ডেড। পার্টির লোকেরা বলছে, মাওবাদীদের কাজ। ওদের কিছু ছেলে নাকি রাফতানের সঙ্গে ভিড়ে ছিল। এখন বাইপাস অবরোধ করেছে পার্টির ছেলেরা। এ দিকে ট্রিমেন্ডাস জ্যাম। অফিসে যেতে পারছি না।'

খবরটা শুনে চেয়ারে ধপ করে বসে পড়লেন প্রোজ্জ্বল।

গায়ত্রীর বাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে ডিরেক্টর সাহেবের ঘরে ঢুকল

শিউচরণ। বেস্পতিবার, ছুটির দিন। দুপুরে জগা মারফত খবর পাঠিয়েছিলেন স্যার, সেই কারণেই বাঘের বাচ্চাটাকে ও নিয়ে এসেছে। আরও একটা কারণ আছে। অর্কবাবুর সঙ্গে ও মেদিনীপুর যাবে। দু'দিনের ছুটি দরকার। ছুটির কথাটা প্রশান্তবাবুকে বললেই পারত। কিন্তু এই সেদিন নয়াগ্রাম থেকে ফিরেছে। ফের ছুটি চাইলে উনি বিরক্ত হতে পারেন। তার চেয়ে স্যারের কাছ থেকে ছুটি চেয়ে নেওয়া সহজ। ঘরের ভেতর ঢুকে ও দেখল,
স্যার গুম হয়ে বসে আছেন। কোলে বাঘের বাচ্চাটাকে দেখা সত্ত্বেও কোনও উচ্চবাচ্য করলেন না। মেজাজ খারাপ? হতে পারে। কত দিক সামলাতে হয় স্যারকে। মেজাজের আর দোষ কী? চোখাচোখি হতেই স্যারকে ও জিজ্ঞেস করল, 'কিছু হয়েছে স্যার? আপনাকে এত গম্ভীর লাগছে?'

স্যার বললেন, 'বোস শিউচরণ। একটা খুব খারাপ খবর আছে। রথীন সর মার্ডারড হয়েছেন।'

'কী বলছেন আপনি?' শুনে শিউচরণ চমকে উঠল। তারপর বলল, 'কারা মারল ওঁকে?'

'জানি না। আমার বাম্বু হয়ে গেল শিউচরণ। উনি ম্যানেজমেন্ট কমিটিতে ছিলেন বলে, অ্যাদ্দিন আমায় কোনও প্রবলেমে পড়তে হয়নি। গভর্নমেন্টর কাছে যখন যা চেয়েছি, চিফ মিনিস্টারকে বলে উনি তা করে দিয়েছেন। আর বোধহয় আমি আটকাতে পারব না।'

'কী আটকাতে পারবেন না স্যার?'

'তুমি আমার ট্রাস্টেড লোক, তাই বলছি। কিন্তু ঘুণাক্ষরেও কোনওদিন ইউনিয়নের কারও সঙ্গে আলোচনা কোর না। চিড়িয়াখানাটা বোধহয় এ বার শিফট করে অন্য কোথাও নিয়ে যেতেই হবে।'

জু অথরিটি অব ইন্ডিয়ার কর্তারা ফের কলকাতায় এসেছেন। বার বার আমাকে ওঁরা চাপ দিচ্ছেন, আলিপুর থেকে যেন আরও অনেক বড় জায়গায় চিড়িয়াখানাটা আমরা নিয়ে যাই। নিয়ে না গেলে আগামী বছর থেকে পুরো গ্র্যান্ট ওরা বন্ধ করে দেবেন। কী ফ্যাসাদে

pathagar.net

পড়েছি বল। ওরা টাকা না দিলে এত বড় একটা এসটাব্লিশমেন্ট আমি চালাব কী করে?'

'শিফটিংয়ের কথাটা তো অনেকদিন ধরে শুনছি স্যার।'

'অ্যাদ্দিন ঠেকিয়ে রেখেছিলাম। মণিপুরী হরিণ মার্ডারের খবরটা কাগজে বেরোনোর পর থেকে সরকারি লেভেলে বিশ্রি একটা রিঅ্যাকশন হয়েছে। জু অথরিটি-র মিঃ বালু আমার কোনও কথাই শুনতে চাইছেন না। কাল তো একেবারে আলটিমেটাম দিলেন।'

'আপনি টেনশন করছেন কেন?'

'করব না? কী বলছ তুমি? রথীনবাবু বেঁচে থাকলে চিন্তাই করতাম না। ওঁর সঙ্গে আমার একটা অন্য ইকোয়েশন ছিল। বেসিক্যালি উনি ছিলেন অ্যানিম্যাল লাভার। প্রাণীজগৎ নিয়ে ওঁর কত পড়াশুনো ছিল, সে একমাত্র আমিই জানি। এক এক সময় এমন এমন সব কথা বলতেন, আমি অবাক হয়ে যেতাম। একমাত্র মিটিংয়ের পর উনি আমায় কী বলেছিলেন, জান? আমার হাতে যদি ক্ষমতা থাকত, তা হলে চিড়িয়াখানার কনসেপ্টটাই তুলে দিতাম। পৃথিবীর সব চিড়িয়াখানার সব পশুপাখিকে জঙ্গলে ছেড়ে দিয়ে ওদের বন্দি করে রাখার কোনও অধিকার আমাদের নেই।'

কথাটা শুনে শিউচরণ চমকে উঠল। ওর ইচ্ছে হল বলে, 'আমারও তাই মনে হয় স্যার।' কিন্তু ছোট মুখে বড় কথা বলা হয়ে যাবে। তাই জিজ্ঞেস করল, 'কথাটা উনি কেন বলেছিলেন স্যার?'

'আরে, এই পৃথিবীতে পশুপাখিরা আমাদের থেকে অনেক সিনিয়র। মানুষ আসার অনেক আগে ওরা এই পৃথিবীতে এসেছে। এই পৃথিবীর ওপর ওদের অধিকার তো মানুষের থেকে অনেক বেশি। বলপ্রয়োগ করে মানুষ ওদের ওপর প্রভুত্ব করছে। রথীনবাবু মনে করতেন, এটা অন্যায়।'

'আপনারও কি তাই মনে হয় স্যার?'

'আমার মনে হওয়াতে কী আসে যায় শিউচরণ। আমি হলাম পেটি সরকারি চাকুরে। ওপরওয়ালারা আমাকে যা বলবেন, তা করতে আমি বাধ্য। আমার কোনও নিজস্ব মত থাকতে নেই। মাঝে মাঝে কী মনে হয় জান, এত পড়াশুনো করে, কী হল? প্রাণীজগতের কোন কল্যাণে আমি লাগলাম? যাক গে, তোমায় এ সব কথা বলে কী লাভ? নিশ্চয়ই খুব বিরক্ত হচ্ছ?'

স্যারকে এত সেন্টিমেন্টাল হতে আগে কখনও শিউচরণ দেখেনি। সঙ্গে সঙ্গে ও বলে উঠল, 'বিরক্ত হব কেন স্যার। লেখাপড়া করার সুযোগ আমি পাইনি। আপনাদের মতো গুণী মানুষদের কাছে ভালো ভালো কথা শুনতে পাচ্ছি। এতেই আমার অনেক কিছু শেখা হয়ে যাচ্ছে। একটা কথা জিজ্ঞেস করব স্যার? যদি কিছু মনে না করেন?'

চোখ থেকে চশমাটা খুলে টেবলের ওপর রেখে রুমাল দিয়ে ঘর্মাক্ত মুখটা মুছে নিলেন ডিরেক্টর সাহেব। তার পর বললেন, 'বল শিউচরণ, এত হেজিটেট করছ কেন?'

'অনেকদিন আগে এই ঘরে বসেই আপনি একদিন প্রশান্ত স্যারকে একটা কথা বলেছিলেন। কী একটা কাজে আমি তখন এই ঘরে ছিলাম। আপনি হয়তো ভুলে গেছেন। কিন্তু সেই কথাটা নিয়ে পরে আমি অনেক ভেবেছি। উত্তর পাইনি।'

'তাই নাকি, কী কথা বল?'

'স্যার, আপনি তখন দু'একটা ইংরাজি শব্দ বলেছিলেন, অতটা আমি বুঝতে পারিনি। কিন্তু এটুকু

pathagar.net

ঝেছিলাম, মানুষ যে আজ এত সভ্য হয়েছে, তার পিছনে প্রতি পদে পদে পশুদের একটা ভূমিকা আছে। তার পর স্যার, আপনার সঙ্গে দেখা করার জন্য কে একজন ঘরে এলেন। আলোচনাটা ওখানেই শেষ হয়ে গেল। আমার খুব জানার ইচ্ছে, পশুদের ঠিক কী ভূমিকা ছিল।'

কথাগুলো শুনে স্যারের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বললেন, 'বাঃ শিউচরণ, এ সব কথা জানতে তোমার খুব ইচ্ছে হয় বুঝি? শুনে বেশ ভালো লাগল, অ্যাদ্দিন এখানে চাকরি করছি, এ সব কথা কেউ কোনওদিন জানতে চায়নি। তুমি বললে বলে সেদিনকার কথা এখন মনে পড়ছে। প্রশান্ত আমার কাছে এসেছিল সুভ্যেনিরের জন্য একটা লেখা চাইতে। কথাগুলো তখনই হচ্ছিল।'

'আমাকে একটু বুঝিয়ে দেবেন স্যার। কাউকে জিজ্ঞেস করার সাহস পাইনি। পাছে, শুনে হাসাহাসি করে। ঠিক করেই রেখেছিলাম, জিজ্ঞেস করলে, একদিন আপনাকেই করব।'

ভালো করেছ শিউচরণ। মানব সভ্যতার ইতিহাসে পশুদের অবদান অস্বীকার করার কোনও উপায় নেই। ডারউইন বলে একজন প্রাণীবিজ্ঞানী ছিলেন, জান?'

'জানি স্যার। লাইব্রেরির ঘরে ওঁর একটা ছবি টাঙানো আছে। পৃথিবীতে মানুষ কীভাবে এল, সেটা উনি লিখে গেছেন।'

' ভেরি গুড, শিউ। এ বার শোন, খুব সহজ করে তোমায় বলছি। হাজার হাজার বছর আগে একটা সময় আদিম মানুষ গুহায় বসবাস করত। ফলমূল খেয়ে তারা বেঁচে থাকত। তার পর মানুষ একদিন জানতে পারল, কোনও কোনও পশুর মাংস খাওয়া যায়। তাই পশুশিকার করতে শিখল। সেই সময় পশুরাও অবশ্য মানুষ শিকার করত। তার পর একদিন পাথর ঠোকাঠুকি করে আগুন আবিষ্কার করল মানুষ। সেই আগুনে পশুর মাংস ঝালিয়ে খাওয়ার স্বাদও টের পেল তারা। খাদ্যতালিকায় এসে যাওয়ায়, পশুদের প্রিজার্ভ করার... মানে সংরক্ষণ করার দিকে একটা সময় নজর দিল মানুষ। তাতে রোজ রোজ শিকারে যাওয়ার কোনও প্রয়োজন নেই। পশুপালন করতে গিয়ে মানুষ বুঝল, ওদের প্রজনন হার অনেক বেশি। সংখ্যায় দ্রুত

বাড়ে। খাইয়ে দাইয়ে পশুদের বাঁচিয়ে রাখার ব্যবস্থা তাদেরই করতে হবে। কিন্তু একটা জায়গায় বেশিদিন থাকলে পশুদের খাবার জোগানো মুশকিল। এই পশুগুলো মূলত উদ্ভিদভোজী। মানে ঘাস, গাছ পাতা খায়। পশুচারণ করতে গিয়ে সেই প্রথম মানুষ গুহা ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল। বলা যায়, সভ্যতার পথে সেই প্রথম পা বাড়াল। কী, বুঝতে পারছ?'

শিউচরণ বলল, 'হ্যাঁ স্যার, আপনি বলুন। বুঝতে পারছি।'

'মানুষের প্রয়োজন অন্ন, বস্ত্র আর বাসস্থানের। পশুরা প্রথমে মানুষের অন্ন সমস্যার সমাধান করেছিল। তার পর বস্ত্রের। গাছের পাতা, ছাল বস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করার পর, মানুষ পশুর চামড়াও পরিধান হিসাবে কাজে লাগাল। বিশেষ করে ঠাণ্ডার সময়। ইতিমধ্যে গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে মানে একসঙ্গে থাকার কনসেপ্ট এসেছে। মানুষ বাসস্থানের ব্যবস্থাও করেছে। বাসস্থান ও খাদ্যসম্পদ পাহারা দেওয়ার জন্য পশুদের কাজে লাগিয়েছে। কখনও এক গোষ্ঠীর সঙ্গে অন্য গোষ্ঠীর লড়াই হয়েছে। তাতে সামিল হয়েছে পশুরা। তা হলে দেখ শিউচরণ, সেই আদিম কাল থেকে মানুষ কতভাবে পশুদের ওপর নির্ভর করেছে। তার অনেক পর চাষবাসের ভাবনা যখন মানুষের মনে এল, তখনও সেই কাজে সাহায্য করেছে পশুরা। যন্ত্র আবিষ্কার হওয়ার আগে পর্যন্ত, পশুরাই মানুষকে সচল রেখেছে। একদিকে মানুষের মস্তিষ্ক, অন্যদিকে পশুদের শ্রম। এভাবেই সভ্যতার অগ্রগতি হয়েছে। বলা উচিত, ওদের প্রতিকৃতজ্ঞতার শেষ নেই মানুষের।'

'ঠিক বলেছেন স্যার।'

'অথচ তার বদলে মানুষ কী করেছে দেখ। প্রতিদান তো দেয়ইনি, উল্টে পশুদের প্রতি নিম্ন আচরণ করেছে। দিন পাল্টাবেই দেখ শিউচরণ। সেই কারণেই তো এখন, সারা পৃথিবী জুড়ে আন্দোলন গড়ে উঠেছে।

পশুদের বাঁচিয়ে রাখার জন্য এত চেষ্টা করা হচ্ছে। হয়তো একদিন দেখা যাবে, রথীনবা[illegible] ঠিক। পশুরা পশুদের মতো করে আলাদা থাকবে, মানুষ মানুষের মতো। এই পৃথিবীটা ভাগাভাগি হয়ে যাবে।'

'স্যার, সেদিন সাঁঝেলি ম্যাডামের কাছে শুনলাম, অন্য দেশের কোনও অ্যানিম্যাল নাকি চিড়িয়াখানায় আর রাখা যাবে না?'

' সেই নিয়মটা আসছে। সারা পৃথিবী জুড়েই দাবি উঠেছে, যে দেশের অ্যানিম্যাল, তাকে সে দেশে বাঁচতে দাও। অন্য দেশে নিয়ে গিয়ে তাকে কষ্ট দিও না। এই যে শিম্পাঞ্জিগুলোকে আ[illegible] আফ্রিকা থেকে নিয়ে এসেছি, ওরা কি খুব সুখে আছে বলে তোমার মনে হয়? পরিচিত পরি[illegible] থেকে, বিদেশ বিভুঁয়ে গিয়ে মানুষই কি কমফর্টেবল থাকে? ধর, একটা পোলার বিয়ার আমরা [illegible] [illegible]লাম। কলকাতার গরমে তো তার প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে উঠবে। অথবা ধর, কয়েকটা ময়ূর নিয়ে গিয়ে [illegible]দি নরওয়ের কোনও চিড়িয়াখানায় রাখি, তা হলে ঠাণ্ডায় তো ওরা মরেই যাবে। তাই এ সব ব্যানড করে দেওয়া হচ্ছে।'

'স্যার, আপনার কাছে বসলে কত কী জানা যায়।'

' তোমার আগ্রহ আছে শিউচরণ, তাই জানতে চাইছ। অন্যদের মধ্যে তো কোনও উৎসাহ দেখি না। আমার কাছে সব আসে দাবি আদায়ের জন্য। যাক গে, অনেক কথা বলে ফেললাম। গায়ত্রীর বাচ্চাটা দিব্যি বড় হয়ে গেছে দেখছি।'

ঘরের মেঝেতে খেলা করছিল বাচ্চাটা। তাকে ফের কোলে তুলে নিয়ে শিউচরণ বলল, 'স্যার, এটার একটা নাম দিন।'

' মেল, না ফিমেল?'

' মেল স্যার। তিন-চার মাসের মধ্যেই তাগড়া হয়ে যাবে।'

'তা হলে তো একটাই নাম দিতে হয়। সৌরভ। এমন বাঘের বাচ্চা কলকাতায় আর ক'টা আছে?'

'খুব ভালো নাম দিয়েছেন স্যার। আমি কিন্তু যদ্দিন পারি, বাচ্চাটাকে কাছে রেখে দেব।'

'তা রাখ। তবে এই বাচ্চাগুলোর জন্য আমার খুব কষ্ট হয়। বন্দি অবস্থায় জন্মেছে, জঙ্গল কী, এরা তা জানতেও পারবে না। এই যে বাড়ি নিয়ে গিয়ে, তুমি একে মানুষ করছ... দেখ সত্যি কথাটা মুখ ফসকে কীভাবে বেরিয়ে এল... মানে একে বড় করে তুলছ, আসলে কিন্তু তুমি একে বাঘ করে তুলছ না। ধর, এমন দিন যদি কোনওসময় আসে, অন্য সব পশুদের সঙ্গে একেও আমরা জঙ্গলে ছেড়ে এলাম, তখন তো এ বেঁচে থাকতেই পারবে না। বন্যপশুদের মধ্যে এ ব্রাত্য হয়েই থেকে যাবে। এর মুখে আমরা রোজ খাবার তুলে দিয়েছি। জঙ্গলে গেলে এ নিজে শিকার করতে পারবে না। প্রাণী জগতে নতুন একটা প্রজাতি তৈরি হয়ে গেল, মানুষের মূর্খামিতে। বিশ্বাস কর, এই কারণেই চিড়িয়াখানায় কোনও পশুর জন্ম হোক আমি চাই না। তুমি নিশ্চয়ই লক্ষ করেছ, ডিরেক্টর হওয়ার পর আমি ক্যাপটিভ ব্রিডিংয়ে কোনও উৎসাহ দিইনি। একমাত্র কুমির আর বাঘদের ক্ষেত্রে ছাড়া।'

কথাগুলো বলে ডিরেক্টর সাহেব চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন। বেলা প্রায় পাঁচটা। মনে একরাশ আনন্দ নিয়ে স্যারের সঙ্গেই ঘর থেকে বেরিয়ে এল শিউচরণ। স্যারের কাছ থেকে অনেক কিছু ও আজ জানতে পেরেছে। সারা জীবন মনে রাখবে। কোল থেকে সৌরভকে কাঁধে তুলে নিল শিউচরণ। নয়াগ্রামে যেমন ভাবে একটা সময় ছাগলছানা কাঁধে নিত। রাস্তা পেরিয়ে কোয়ার্টাসের দিকেএগোনোর সময় নয়াগ্রামের কথা মনে হতেই, ও আফশোস করতে লাগল, এই যাঃ, স্যারকে ছুটির কথাটাই বলা হল না। এদিকেঅর্কবাবুর সঙ্গে কথা হয়ে আছে, কাল সকালেই মেদিনীপুরের ট্রেন ধরবে।

বেস্পতিবার ওর ছুটি বলে, মুন্নিও এই দিনটায় ছুটি নেয় নার্সিংহোম থেকে। বাড়ি ফিরে বাইরে থেকেই শিউচরণ টের পেল, মুন্নি টিভি দেখছে। বোধহয় মারপিটের সিন চলছে। তার মানে সিনেমা প্রায় শেষের দিকে। দরজাটা খুলে দিয়েই মুন্নি দ্রুত কম্বল টেনে শুয়ে পড়ল। দু'দিন আগে একটা [illegible] টিভি কিনে এনেছে। সেই টিভির পর্দার দিকে ওর চোখ। চৌকিতে আধশোয়া হয়ে গভীর [illegible]যোগ দিয়ে মুন্নি মারপিট দেখছে। পাতলা চাদরের ওপর দিয়ে ওর শরীরের চড়াই-উৎরাই স্পষ্ট [illegible] যাচ্ছে। আদিবাসী মেয়ে, ভরাট যৌবন। বিবাহিত জীবনের দশটা বছর কাটিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও [illegible]ীবন এতটুকু টসকায়নি। ওকে প্রথম দেখার পরই শিউচরণ ঠিক করেছিল, জীবনসঙ্গিনী করবে।

[illegible] ওর জেদটা আরও বেড়ে যায়। সুখের কথা, ওদের দাম্পত্যে এখনও চিড়

দরজা খুলে দেওয়া আর চাদরের ভেতর ওর সেঁধিয়ে যাওয়ার মাঝে শিউচরণ দেখে ফেলেছে, মুন্নির পরনে সায়া ছাড়া আর কিছুই নেই। ওর শোয়ার ভঙ্গিটা এতটাই যৌন আবেদনময়, শিউচরণ সেদিকে তাকিয়েই রইল। টিভি-র পিচবোর্ড বাক্সের ভেতর সৌরভকে শুইয়ে দিয়ে দ্রুত পোশাক বদলে নিল শিউচরণ। তার পর চৌকির ওপর উঠে টানটান হয়ে শুয়ে পড়ল মুন্নির পাশে। পিছন থেকে আলতো করে ওকে জড়িয়ে ধরে, পিঠে মুখ ঘষতে লাগল।

নয়াগ্রাম যাওয়ার কথা মুন্নিকে ও বলেনি। হুট করে বললে, মুন্নি বেঁকে বসতে পারে। হনুমানের পেট কাটা নিয়ে নানা কথা ওর কানে গেছে। মায়ের কাজকম্ম সেরে ফেরার পথে মুন্নি একবার সাবধানও করে দিয়েছিল, নুরুলভাইদের ও সব পলিটিকসের মধ্যে তোমার থাকার কোনও দরকার নেই। ফের নয়াগ্রামে যাওয়ার কথা তুললে ও হয়তো কান্নাকাটি শুরু করে দেবে। শিউচরণ ঠিকই করে রেখেছে, কথাটা মুন্নির কাছে এমন সময় তুলবে, যখন ও না করতে পারবে না।

টিভি-তে মারপিটের পর শাহরুখ খান যখন কাজলকে জড়িয়ে ধরেছে, ঠিক সেই সময় মুন্নিকে কাছে টানল শিউচরণ। বোধহয় এই মুহূর্তটার জন্য অপেক্ষা করছিল মুন্নিও। সাগ্রহে বুকের ওপর উঠে এল। কানের কাছে মুখ নিয়ে ও বলল, ' কোথায় ছিলে এতক্ষণ? তখন থেকে একা শুয়ে আছি।'

সামান্য এই ক'টা কথাই শিউচরণের ইচ্ছেটা একশো গুণ বাড়িয়ে দিল। গত দশ বছর ধরে ওরা নিয়মিত সঙ্গম করেছে। কিন্তু সেই মিলন ফল দেয়নি। মুন্নি মা হতে পারেনি। প্রতিবারই সঙ্গমের পর ওরা আশায় আশায় প্রহর গুণেছে। আর প্রতিবারই হতাশায় ভেঙে পড়েছে মুন্নি। ইদানীং সঙ্গমে আর তেমন আগ্রহ দেখাচ্ছিল না। কাছে টানলেই বলত, করে কী হবে? আজ শিউচরণের বুকের ওপর মাথা রেখে বলল, 'একটু আগে টিভি দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, কী স্বপ্ন দেখলাম জান?'

দু'হাতে ওকে শরীরের সঙ্গে মিশিয়ে নিয়ে শিউচরণ বলল, 'কী গো?'

' নয়াগ্রামে আমরা হাতিমারির মন্দিরে গেছি। প্রণাম করার সময়, জান... স্পষ্ট শুনলাম, হনুমানজি বললেন, তোর ঘরে এ বার আমি

আসছি।'

'সত্যি ?' আনন্দে মুন্নিকে চুমু খেতে শুরু করল শিউচরণ। পাজামার দড়িটা খুলতে খুলতে ও নিশ্চিত হয়ে গেল, কাল সকালে ও নয়াগ্রাম যাচ্ছেই। হাতিমারি মন্দিরে পুজো দেওয়ার কথা তুললে মুন্নি আর না করতে পারবে না।

২৭

ঘুম ভেঙে চোখ খোলার সময় গালে ভিজে কিছু স্পর্শ পেল সাঁঝেলি। তার পর কানে, চোখে। ও বুঝতে পারল, ঘুম থেকে ওকে তোলার জন্য টুকি আর টাকি দুষ্টুমি করছে। জিভ দিয়ে গাল চেটে দিচ্ছে। তার মানে এখন ঠিক আটটা বাজে। এখন আর ঘড়িতে এলার্ম দেওয়ার দরকার হয় না সাঁঝেলির। রোজ ঠিক টাইমে ওর বিছানায় উঠে আসে টুকি-টাকি। ঘুম ভাঙানোর জন্য নানা রকম চেষ্টা করে। কখনও পায়ের তলায় সুড়সুড়ি দেয়। ইচ্ছে করেই সাঁঝেলি তখন ঘুমের ভান করে শুয়ে থাকে।

আজ ঘুম ভাঙার পরই ওর অর্কর কথা মনে হল। ওর সঙ্গে শেষ কথা হয়েছে কাল বিকেলে। অর্ক নয়াগ্রামে গিয়েছে কী না, সাঁঝেলি জানে না। এখনও ফোন করেনি। কাল রাতে ওর সঙ্গে কথা বলতে খুব ইচ্ছে করছিল। কিন্তু যতবারই মোবাইলে ধরতে চেয়েছে, ততবারই শুনতে পেয়েছে, আউট অব রিচ। রাতের দিকে ভয়ানক রাগ হচ্ছিল ওর। ইরেসপন্সিবল, ইডিয়েট নানা রকমের গাল দিয়েছে মনে মনে। অনেক রাতে নন্দিনীকে ও ফোন করেছিল। অর্ক অফিসে গিয়েছিল কী না সেই খবরটা জানার জন্য। কোথায় একটু সহানুভূতি জানাবে, তা নয়। উল্টে বলল, 'আমি এখন হরর মুভি দেখছি। গা ছমছম করছে। প্লিজ, অর্কর মতো একটা প্লে বয়ের কথা জিজ্ঞেস করে ছমছমানিটা নষ্ট করে দিস না।'

বলেই ফোনটা কেটে দিল।

ব্লাঙ্কেটটা ফের গায়ে মুড়ি দিয়ে সাঁঝেলি উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল। সারা দিনে কী কী কাজ আছে, তা মনে করার জন্য। আজ লাইব্রেরির কাজ করা যাবে না। লাইব্রেরির হলঘরে ম্যানেজিং কমিটির মিটিং আছে। তার পর অন্য কমিটির মিটিং। চিড়িয়াখানায় খুব বেশিক্ষণ থাকতে হবে না। ওখান থেকে বেরিয়ে একবার গোবিন্দপুর যেতে হবে। মাঝে কয়েকটা দিন এত ব্যস্ত ছিল, ওখানে যাওয়াই হয়নি। আশিসদাটাও কেমন যেন হয়ে গেছে। আগে রোজ দু'তিনবার করে ফোন করত। নানা ব্যাপারে আলোচনা করত। বিশেষ করে, দাদাকে যে সব প্রোপোজাল দেওয়া হয়েছিল, তা নিয়ে। কিন্তু ইদানীং সাঁঝেলি লক্ষ করছে, আশিসদার ফোন কমে গেছে। ও ফোন করলেও সব সময় ধরছেন না।

উনি অ্যাভয়েড করতে চাইছেন কী না সাঁঝেলি বুঝতে পারছে না। তবে একটা জিনিস ওর মনে হচ্ছে, অর্কর সঙ্গে ওর মেলামেশাটা আশিসদা ঠিক পছন্দ করছেন না। একদিন তো কী একটা কথাপ্রসঙ্গে উনি বলেই ফেললেন, 'খবরের কাগজের রিপোর্টারদের সঙ্গে গা ঘেঁষাঘেঁষি করাটা আমার ভালো লাগে না। আমাকে কোনওদিন দেখেছ পাবলিসিটি নিতে? আমি ভাই একটা জিনিস বুঝি, যদি কাজ করি, তা হলে রিপোর্টারকে আমার কাছে আসতে হবে। আমাকে ওদের কাছে যেতে হবে না।'

আরেকদিন সাঁঝেলি সরাসরিই জিজ্ঞেস করেছিল, ' আপনি কি কোনও কারণে আমার ওপর [illegible] হয়েছেন আশিসদা?'

উনি চমকে উঠে বললেন, ' আরে না না। আমার শরীরটা বিগড়ে গেছে জান। প্যানক্রিয়াসে একটা প্রবলেম হয়েছে! বহু বছর কোনও ওষুধ-টষুধ খেতে হয়নি, বুঝলে। এ বার মনে হচ্ছে, আমাকে একেবারে বিছানায় শুইয়ে দেবে।'

' ভালো কোনও ডাক্তারকে দেখাচ্ছেন না কেন আশিসদা?

বাবাকে বলব?'

'আরে না । আমার জন্য এত চিন্তা করতে হবে না । দরকার হলে আমিই তোমার বাবার কাছে চলে যাব। আমার একটাই রিকোয়েস্ট, তোমরা শুধু আমার অর্গানাইজেশনটা বাঁচিয়ে রেখো।'

একদিকে অর্ক, অন্যদিকে আশিসদা । কাকে ছেড়ে কাকে রাখবে, শুয়ে শুয়ে সাঁঝেলি ভাবতে লাগল। কে জানে, কী কারণে অর্কও একেবারেই পছন্দ করে না আশিসদাকে । বোধহয় কোথাও কিছু শুনে থাকবে ও আশিসদা সম্পর্কে। ওর ভুলটা ভাঙিয়ে দিতে হবে। অর্ককে ভুলে যাওয়া সাঁঝেলির পক্ষে এখন আর সম্ভবই না। বিশেষ করে, দীপিকাদির বাড়ি থেকে নেমন্তন্ন খেয়ে ফেরার দিন যা ঘটেছিল, তার পর থেকে। অর্ক যে কাণ্ডটা করে বসবে, কে জানত? সেদিন সোফায় বসে ওরা গল্প করছিল। অর্ক হঠাৎ ওর কোলে শুয়ে পড়ে। তার পর হঠাৎ প্রথম চুমুটা যখন খায়, তখন সাঁঝেলি আঁতকে উঠে 'এই না, না' বলে নিজেকে সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছিল। পরে আর নিজেকে আটকাতে পারেনি।

ওর সারা শরীরে একটা শিহরণ খেলে গিয়েছিল। সেই অনুভূতিটা আগে কখনও ওর হয়নি। দু'হাতে ওর মুখটা ধরে অর্ক চুমু খেয়েই যাচ্ছিল ঠোঁটে, গালে, গলায়। দাঁত দিয়ে কামড়েও দিয়েছিল ওর ঠোঁট একটা সময়। সাঁঝেলির চোখ বুজে এসেছিল। পা দুটো থরথর করে কাঁপছিল। একটা সময়

অর্কর ঠোঁটে নিজেও ঠোঁট ডুবিয়ে দিয়েছিল। ঘরে তখন আলোর বন্যা। চুমুর ঝড় থেমে যাওয়ার পর আয়নার দিকে চোখ পড়তেই সাঁঝেলি লক্ষ করেছিল, ওর ঠোঁটটা ফুলে উঠেছে। ঠোঁটের দোষ কী, অর্ক যেভাবে পাগলামি করছিল। ও শুধু বলেছিল, 'এটা কী করলে বল তো। বাড়িতে ঢুকব কী করে? কেউ যদি এ অবস্থায় আমাকে দেখে ফেলে, কী হবে?'

অর্ক তখন আঙুল দিয়ে ওর ঠোঁট স্পর্শ করে বলেছিল, 'তা হলে একটা কাজ করি। কাছে এস,

ফের রিভার্স চুমু খেয়ে তোমার ঠোঁট অরিজিনাল অবস্থায় ফিরিয়ে দিচ্ছি।'

সেদিনই সাঁঝেলি প্রমাণ পেয়েছিল, অর্কটা যাচ্ছেতাই রকমের অসভ্য। আসল নরনারীর এই সম্পর্কটা নিয়ে কলেজ লাইফেও ওর কোনও ধারণা ছিল না। কোনও পুরুষের সঙ্গে কোনওদিন ওর ঘনিষ্ঠতা হয়নি। স্কুলে পড়ার সময় গাড়ি করে যাতায়াত করত। আর বাড়িতে পড়াশোনার বাইরে ও ব্যস্ত থাকত পেট অ্যানিম্যালদের নিয়ে। সেই সময় টাইগার আর টাইগ্রেস নামে দুটো অ্যালশেসিয়ান ছিল ওদের বাড়িতে। কলেজে ওঠার পর বাড়ির বাঁধন অবশ্য খানিকটা আলগা হয়েছিল। কিন্তু সাঁঝেলির ইচ্ছেই করেনি বন্ধুদের সঙ্গে মেলামেশা করার। নন্দিনী, শুভ্রা, জয়ন্তীরা যখন ক্লাস ফাঁকি দিয়ে বয়ফ্রেন্ডের সঙ্গে শপিং মল বা মাল্টিপ্লেক্সে যেত, সেই সময় সাঁঝেলি ব্যস্ত থাকত লাইব্রেরিতে। পড়াশোনা করত জীবজগৎ নিয়ে। ওর পশুপ্রেম নিয়ে তখন মস্করা করত নন্দিনীরা।

কলেজ থেকে দল বেঁধে ওরা একবার পিকনিকে গেছিল। মধ্যমগ্রামের দিকে কোনও এক-বাগান বাড়িতে। সেখানে একটা অদ্ভুত দৃশ্য চোখে পড়েছিল সাঁঝেলির। পুকুরে একটা হাঁস, আরেকটা হাঁসের পিঠে চড়ার চেষ্টা করেছে। দৃশ্যটা দেখে অনেকে হাসাহাসি করছিল। হাসির কী আছে, জানতে চাওয়ায় নন্দিনী তখন বলেছিল, 'তুই সত্যিই জানিস না? তোর জানা উচিত।' ওই দিনই হাঁসের প্রসঙ্গ টেনে নরনারীর যৌন সম্পর্ক নিয়ে অনেক কথা বলেছিল নন্দিনী। পরদিন একটা বই এনে পড়তে দিয়েছিল। বাৎসায়নের কামসূত্র।

... বালিশের কাছে মোবাইল সেটটা পড়ে আছে। কী মনে হওয়ায়, সেটটা হাতে তুলে নিল সাঁঝেলি। শুয়ে শুয়েই

অর্ককেএকবার ফোনে ধরার চেষ্টা করল। রিং হয়েই যাচ্ছে, কেউ ভুলছে না। সেট-এর ভেতর অর্কর একটা ছবি সেভ করে রেখেছে সাঁঝেলি। সেই ছবিটা বের করে ও অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। নন্দিনী কাল ঠিকই বলেছিল, প্লে বয়। তা নয় তো কী? প্রথম দিন অর্ক চুমুগুলো যেভাবে খেয়েছিল, তাতে মনে হয়, আগে ওর অভিজ্ঞতা আছে। তার মানে... অনেক মেয়েকেই চুমু খেয়েছে। অর্ক যা হ্যান্ডসাম, তাতে ইচ্ছে করলে যে কোনও মেয়েকেই পটিয়ে ফেলতে পারে। পরে হয়তো তাদের বিট্রেও করেছে। ইস, কী হবে... অর্ক যদি ওর সঙ্গেও একই ব্যবহার করে। বিছানায় শুয়ে থাকতে থাকতে সাঁঝেলি সেই সম্ভাবনা নিয়ে ভাবতে লাগল। কিছুক্ষণ পর ওর মনে হল, যাঃ তাই হয় নাকি। ওরা তো আর টিনএজার নয়। দু'জনেই যথেষ্ট ম্যাচিওরড। ওরা এমন কিছু করবে না, যা টিনএজাররা করে। কথাটা মনে হতেই, অর্কর ছবিটা ও নিজের ঠোঁটের সঙ্গে চেপে ধরল। তারপর ফিসফিস করে বলল,' লাউফ উইদাউট ইউ, ইজ ইমপসিবল।'

একটা মেসেজ পাঠালে কী রকম হয়? অর্ককে কোনও মেসেজ পাঠালে খুব তাড়াতাড়ি উত্তর পাঠায়। দিনে পাঁচ-সাত বার এরকম মেসেজ দেওয়া নেওয়া ওদের হতেই থাকে। ইদানীং অর্কর কোনও কোনও

মেসেজ পড়ে সাঁঝেলির গাল লাল হয়ে যায়। তবে ভালোও লাগে। মেসেজ পাঠানোর কথাটা মনে হওয়ার পরই ও উপুড় হয়ে অর্কর জন্য মেসেজ লিখতে শুরু করল। 'লাইফ উইদাউট ইউ ইজ ইমপসিবল। ইউ আর ইন মাই ব্লাড। আই কান্ট লিভ ফর আ সেকেন্ড। উইদাউট ইউ, আই অ্যাম

ডেড। প্লিজ, রিপ্লাই। ইয়োর উষালি। মেসেজটা পাঠিয়ে সাঁঝেলি উপুড় হয়েই শুয়ে রইল, আর মনে মনে প্রার্থনা করতে লাগল, উত্তরটা যেন খুব তাড়াতাড়ি আসে।

টুকি আর টাকি অনেকক্ষণ ধরে জ্বালাতন করছে। মুখ দিয়ে ব্লাঙ্কেট টানছে। বিরক্ত হয়ে সাঁঝেলি উঠে বসল। শোনপুরিটা রোজ এ সময় এসে যায়। টুকি আর টাকিকে নিয়ে পার্কে বেড়িয়ে আসে। কী হল ওর, এখনও আসেনি? বিছানা থেকে নেমে সাঁঝেলি নিজে ব্রাশ করে নিল। তার পর অ্যাটাচড বাথরুমে নিয়ে গিয়ে টুকি আর টাকির দাঁতও ব্রাশ করে দিল। অন্যদিন এই কাজটা করে শোনপুরি। এর পর চা এনে দেয়। টুকি আর টাকির ব্রেকফাস্টের ব্যবস্থা করে। সাঁঝেলি নিজেই কিচেনে গিয়ে মনার মাকে বলে এল, শোনপুরির কাজগুলো করে দিতে।

বারান্দা থেকে ঘরে ঢোকার মুখে সাঁঝেলি দেখল, ডাইনিং রুমে বাবা বসে খবরের কাগজে চোখ বোলাচ্ছে। অনেক দিন বাবার সঙ্গে কথা হয়নি। রোজ দেখাই হয় না। হঠাৎই ওর মনে হল, বাবা খুব রোগা হয়ে গেছে। ছোটবেলায় মায়ের সঙ্গে বনিবনা হত না সাঁঝেলির। কিন্তু ও ছিল বাবা অন্ত প্রাণ। কলেজে ওঠার পর থেকে, নিজের জগতে ঢুকে ও-ই বাবার কাছ থেকে অনেক দূরে সরে গেছে। বাবার জন্য ওর মনটা কেমন যেন করে উঠল। নিজের ঘরে না গিয়ে সাঁঝেলি ডাইনিং রুমে এসে বসল। বাবার ব্রেকফাস্ট রেডি করছে মা। বরাবর দেখছে, এই কাজটা মা আর কাউকেই করতে দেয় না। বাবার দিকে তাকিয়ে সাঁঝেলি বলল, 'তোমার কী হয়েছে বাবা? রোগা রোগা লাগছে?'

বাবা কিছু বলার আগে মা বলল, 'বাবার কোনও খোঁজ তুই রাখিস?'

শুনে বাবা কিন্তু হাসল। খবরের কাগজটা ভাঁজ করে টেবলের

ওপর রেখে বলল, 'তুই কেমন আছিস লিলি ? পুলু বলছিল, তুই নাকি জু-তে চাকরি নিয়েছিস।'

পুলু মানে দাদা। একমাত্র বাবা আর মা-ই ওই নামে ডাকে দাদাকে। চিড়িয়াখানায় নামেই চাকরি, [illegible] কিছু [illegible] সাঁঝেলি। শুনে একটু লজ্জা পেল, বলল, ' তেমন কিছু নয়। ওদের লাইব্রেরিটাকে আমি গুছিয়ে দিচ্ছি।'

টেবলে ডিশ সাজিয়ে দিচ্ছে মা। টোস্ট, ডিমের পোচ আর শশার টুকরো। ওর জন্যও একটা ডিশ সাজিয়েছে। হঠাৎই মা বলল। ' সেদিন তুই কাকে নিয়ে কান্ট্রি ক্লাবে গেছিলি রে লিলি? তোর বাবার সঙ্গে কাল রাতে ওখানে ডিনার করতে গেছিলাম। ওখানেই শুনলাম। ছেলেটা কে?'

কান্ট্রি ক্লাবের ওঁরা সবাই বাবা আর মাকে চেনে। বাবা পার্লামেন্ট মেম্বার। ভ্যালেনটাইন্স ডে-তে হয়তো অর্কর সঙ্গে কেউ ওকে দেখে ফেলেছে। কথায় কথায় বাবাকে হয়তো বলে দিয়েছে। বাবার কাছে গোপন করার কোনও মানে হয় না। তাই সাঁঝেলি বলল, 'ওর নাম অর্ক স্যান্যাল। রিপোর্টার।'

বাবা বলল, 'নামটা শোনা শোনা মনে হচ্ছে। ও তো সেই ছেলেটা, তুই আমার কাছে যাকে পাঠিয়েছিলি। ছেলেটা বলল, ওর দাদুর নাম আর এন মুখার্জি। ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার খুব পরিচয় ছিল। এই কাছাকাছি কোথাও থাকতেন। কিডনি প্রবলেমে ভুগছিলেন। তখন প্রায়ই আমার কাছে আসতেন। কথাপ্রসঙ্গে একবার আমায় উনি বলেছিলেন, ওর এক মাত্র নাতি কাগজের

রিপোর্টার।'

মা বলল, 'রিপোর্টার তো শুনলাম, রোজগার কী রকম করে?'

এই কারণেই মাকে পছন্দ করে না সাঁঝেলি। তবুও ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন মনে করিনি মা।'

' কোনও ডিসিশন কি তুমি নিয়ে ফেলেছ?'

মা যখন রেগে যায়, তখন তুমি করে কথা বলে। সাঁঝেলি পাল্টা বলল, 'এখনও নিইনি। তবে ঠিক করেছি, খুব তাড়াতাড়ি নেব।'

'তার মানে? আমাদের সঙ্গে পরামর্শ করার কথাও ভাববে না? আমাদের পছন্দ অপছন্দ বলে কিছু নেই?'

বাবা বলল, 'আঃ, তুমি কেন এ সব কথা তুলছ প্রণতি? ওর যদি ছেলেটাকে পছন্দ হয়, তা হলে আমাদের আপত্তি করার কী থাকতে পারে? প্রোজ্জ্বলের বেলায় তুমি তো আপত্তি করনি। যে ছেলেটির কথা লিলি বলছে, সে খুব বড় বংশের ছেলে। রায় বাহদুর রামব্রহ্ম সান্যালের বংশধর। জান, উনি কে ছিলেন? কলকাতা চিড়িয়াখানার ফার্স্ট ইন্ডিয়ান সুপারিনটেনডেন্ট। ওর দাদুর মুখে শুনেছি।'

বাবার কথাগুলো শুনে সাঁঝেলি চমকে উঠল। লাইব্রেরির ছবি আর প্রবন্ধগুলোর কথা ওর মনে পড়ে গেল। ওহ, এই কারণেই, রামব্রহ্ম সান্যালের চেহারার সঙ্গে অর্কর এত মিল। কিন্তু অর্ক কি জানে এ কথা? মনে হয় না। মুহূর্তের জন্য আনমনা হয়ে গেছিল, সাঁঝেলি শুনল, মা বলছে, 'আমি পুলুকে বলছি, ছেলেটার সম্পর্কে খোঁজ খবর নিতে।'

সাঁঝেলি বলল, 'তার দরকার নেই মা। দাদা নিজেই অর্কর সঙ্গে আলাপ করতে চেয়েছে। ইন ফ্যাক্ট, অর্ক একটা অ্যাসাইনমেন্টের জন্য কাল কলকাতার বাইরে গেছে। ও ফিরে এলে আমিই ওকে দাদার অফিসে নিয়ে যাব।'

কথাটা শুনে মা একটু দমে গেল বলে মনে হল সাঁঝেলির। বাবার দিকে একবার তাকিয়ে তার পর মা বলল, ' ব্যস, তা হলে তো তোমার

pathagar.net

সমস্যা মিটেই গেল লিলি। বাবা আর ছেলে যখন ব্রিফটা হাতে নিয়েছে, তখন আমার নাক গলানোর দরকার কী?'

কথাটা শুনে বাবা চশমা খুলে টেবলের ওপর রাখল। তার পর বলল, 'লিলি, শোন মা, তোর ওপর আমার পুরো কনফিডেন্স আছে। ছেলেটাকে নিশ্চয়ই তুই বাজিয়ে নিয়েছিস। আজকাল এত ব্রেক আপের খবর শুনি, খুব খারাপ লাগে রে। এত এনলাইটেনড ছেলে মেয়ে, তবুও তাদের এত ধৈর্যের অভাব... বিয়ে টেকাতে পারছে না। এই যে একটু আগে তুই জিজ্ঞেস করছিলি না, বাবা তোমাকে রোগা রোগা লাগছে কেন? সত্যি কথা বলব, তোর আর পুলুর চিন্তায় রে। পুলুকেই দ্যাখ, কনজুগাল লাইফটা কী ভাবে ওর নষ্ট হয়ে গেল। অথচ, ভালোবেসে ও যখন দীপা মাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল, তখন কিন্তু আমি আপত্তি করিনি। সেদিন ক্যালকাটা ক্লাবে গেছিলাম। শুনলাম, দীপা ডিভোর্সের মামলা করছে পুলুর এগেনস্টে। কী চার্জ আনছে জানিস মা, এক্সট্রা ম্যারিট্যাল অ্যাফেয়ার্স... ব্যভিচারের। কী সব ডকুমেন্টও জোগাড় করেছে। এ সব খবর খুব রটে যায়। কী লজ্জার কথা বল তো?'

শুনে মুখ নিচু হয়ে গেল সাঁঝেলির। বলল, 'দাদা জানে এসব?'

' জানি না, আমার সঙ্গে তো কোনও আলোচনা করে না। তবে খুব শিগগির ডিভোর্সের কাগজ পত্তর পেয়ে যাবে। তখন হয়তো ছুটবে কোনও ব্যারিস্টারের কাছে। যাক গে, ও যা ইচ্ছে করে করুক। তুই অর্ককে আমার কাছে একবার নিয়ে আসিস তো মা। ওর সঙ্গে কথা বলি।'

বাবার শেষের দিকে কথাগুলো ভারী শোনাল, কেন জানে না, সাঁঝেলির চোখের কোণ হঠাৎই ভিজে উঠল। চুপচাপ খাওয়া শেষ করে ও উঠে এল।

বেল প্রায় সাড়ে ন'টা। অ্যানিমাল প্ল্যানেট চ্যানেলে একটা ভালো প্রোগ্রাম হয় এই সময়। টিভি অন করে সাঁঝেলি সোফার ওপর গিয়ে বসল। বারোটার আগে বাড়ি থেকে বেরনোর দরকার নেই। ওর কোলে বসার জন্য লাফিয়ে উঠেছে টুকি আর টাকি। ওদের সামলে টিভির দিকে চোখ দিতেই

সাঁঝেলির বুকটা ধক করে উঠল। কোন এক বাংলা চ্যানেলে খবর দেখাচ্ছে, সাংবাদিক অপহৃত। 'কলকাতার এক দৈনিক পত্রিকার সাংবাদিক অর্ক স্যান্যালকে অপহরণ করল একদল উগ্রপন্থী। মঙ্গলবার সকালে অর্ক মারুতি গাড়িতে করে মেদিনীপুরের নয়াগ্রামের দিকে যাচ্ছিলেন। সেই সময় গাড়ি থামিয়ে একদল সশস্ত্র উগ্রপন্থী তাঁকে তুলে নিয়ে যায়। গাড়িতে ছিলেন স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য নুরুল ইসলাম। বাধা দিতে গিয়ে তিনি সামান্য আহত হন। জানা গেছে, উগ্রপন্থীরা অর্ককে জাতীয় সড়ক দিয়ে আড়াবাড়ির জঙ্গলের দিকে নিয়ে যায়। পুলিশ এখনও অর্কর কোনও হদিশ পায়নি। জানা গেল, ইদানীং আড়াবাড়ি ও গুড়গুড়ি পালের জঙ্গল থেকে কয়েকটি হনুমানকে পেট কাটা অবস্থায় পাওয়া যায়। সেই খবরটি করার জন্যই অর্ক নয়াগ্রামে যাচ্ছিলেন।'

খবরটা শুনতে শুনতে সাঁঝেলি শূন্য দৃষ্টিতে পর্দার দিকে তাকিয়ে রইল।

২৮

'অর্কবাবু চলুন, লিডার ডাকছেন।'

লণ্ঠনের আলোয় মন দিয়ে কয়েকটা লিফলেট পড়ছিল অর্ক। কথাটা শুনে মুখ তুলল। ওর সামনে কুড়ি-একুশ বছর বয়সী একটা মেয়ে। অযত্নে মুখের রঙ জ্বলে গেছে। তবুও চোখটা খুব সুন্দর। রুক্ষ চুল পিছন দিক দিয়ে টান টান করে বাঁধা। পরনে জিন্সের প্যান্ট আর ছোপছাপ মার্কা জ্যাকেট। কোমরে বেল্টের সঙ্গে ঝুলছে পিস্তল। মেয়েটার দিকে তাকিয়ে অর্কর একটু সহানুভূতিই হল। স্থানীয় মেয়ে

নয়, নিশ্চয় শহর থেকে এসেছে। কলেজ বা ইউনিভার্সিটির ছাত্রী ছিল হয়তো। উচ্চ বা মধ্যবিত্ত পরিবারের। কী কারণে এই কষ্টের জীবন বেছে নিয়েছে, ঈশ্বরই জানেন। লিফলেটগুলো গুছিয়ে রেখে অর্ক বলল, ' কোথায় যেতে হবে?'

'কাছেই। উনি আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন। আজই দুপুরে পৌঁছেছেন। উনি আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান।'

প্রায় বারো ঘণ্টা হয়ে গেল, অর্ক এদের হাতে বন্দি। জঙ্গলটার নাম কী, ও তা জানে না। আজ সকালবেলায় ও আর শিউচরণ ট্রেনে করে যখন মেদিনীপুর স্টেশনে নেমেছিল, তখন ঘুণাক্ষরেও আন্দাজ করতে পারেনি, ওদের জন্য কী দুর্ভোগ অপেক্ষা করছে। নয়াগ্রাম আসার সময় স্টেশন থেকে মাইল কয়েক এগোতেই ফাঁকা রাস্তায়, হঠাৎ একটা ট্রেকার নুরুলের মারুতি গাড়ির সামনে এসে দাঁড়ায়। ট্রেকার থেকে সাত-আটজন ছেলে নেমে পড়ে। প্রত্যেকের মাথায় কালো ফেট্টি, মুখ লাল কাপড়ে আড়াল করা, হাতে অস্ত্র। মারুতির পিছন পিছন নুরুলের দু'টি ছেলে মোটরবাইকে করে আসছিল। প্রথমে তাদের ধরে ওরা প্রচণ্ড মারধর করে। গাড়ি থেকে নেমে প্রথমে শিউচরণ বাধা দিতে যায়। অর্ক ও নুরুল গাড়ি থেকে নেমে এলে, সশস্ত্র ছেলেগুলো ওদেরও ধাক্কা মেরে ফেলে দেয়।

বাধা দিতে যাওয়ার সময় অর্ক শুধু জিজ্ঞেস করেছিল, ' তোমরা কারা? কিডনি র‍্যাকেটের সঙ্গে যদি যুক্ত থাক, তা হলে বলে দিচ্ছি, তোমরা কিন্তু বাঁচবে না।'

শুনে একজন রাইফেল তাক করে ওকে মারতে যায়। কিন্তু অন্য একজন তাকে ধমক দিয়ে ওঠে। তারপর সেই ছেলেটি বলে, 'আপনাদের মধ্যে অর্ক স্যান্যাল কে? তাকে আমাদের সঙ্গে যেতে হবে।'

ছেলেটার মুখে ওর নাম শুনে অর্ক তখন অবাক হয়েছিল। ও কিছু বলার আগে শিউচরণ বলে উঠেছিল, 'আমিই অর্ক স্যান্যাল। কিন্তু তোমাদের সঙ্গে যেতে হবে কেন?'

'লিডারের নির্দেশ আছে।'

তখনই অর্ক সত্যি কথাটা বলে। ছেলেগুলো কোনও ঝুঁকি না নিয়ে দু'জনকেই ট্রেকারে তুলে নেয়। ঘটনাটা এত দ্রুত ঘটে যায় যে শেষ পর্যন্ত নুরুল কিছু করার সুযোগও পায়নি। তখনও পর্যন্ত অর্ক বুঝতে পারেনি কাদের পাল্লায় পড়েছে। জঙ্গলের সামনে ওদের নামিয়ে দিয়ে ট্রেকার ফিরে যায়। সেই সময়ে ছেলেগুলো মাওবাদী স্লোগান দিতে থাকে। অর্ক তখনই বুঝতে পারে, ওরা বিপদের মধ্যে পড়েছে।

মাওবাদীদের বিরুদ্ধে কখনও কোনও লেখা ও লেখেনি। ওই বিট করে কমলেন্দু। তা সত্ত্বেও, মাওবাদীরা কেন ওকেই টার্গেট করল, ও তখন বুঝতে পারেনি। জঙ্গলের ভেতর প্রায় ঘণ্টা খানেক হাঁটিয়েছিল ছেলেগুলো। সেই সময় শিউচরণ বলে, এটা আড়াআড়ির জঙ্গল। অর্কর চোখে পড়েছিল, গাছের আড়ালে বহু জায়গায় বালির বস্তা সাজানো রয়েছে। পুলিশের সঙ্গে এনকাউন্টার করার জন্যই বোধহয়। তার মানে প্রায়ই গুলিগোলা চলে। ছেলেগুলোকে তখন ও ভালোভাবে লক্ষ করতে থাকে। অনেকেই বাংলাভাষী নয়। হঠাৎই একটি ছেলে কালো কাপড় দিয়ে ওদের দু'জনের চোখ বেঁধে দেয়। হাত থেকে ঘড়ি, পকেট থেকে মোবাইল সেট আর টেপ রেকর্ডার কেড়ে নেয়। তার পর থেকে অর্ক আর শিউচরণের দেখা পায়নি।

সাংবাদিক জীবনে আর একবারই অর্ক এ রকম বিপদের মুখে পড়েছিল। নন্দীগ্রামে রিপোর্ট করতে গিয়ে। তেখালিতে একদল ছেলে গ্রামের মধ্যে ওকে একা পেয়ে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল একটা পুকুরের দিকে। ভাগ্যিস সেই সময় কাছাকাছি এসে পড়েছিল সি আর পি এফ-এর গাড়ি। ফলে ও বেঁচে যায়। ফিরে এসে অফিসে যখন গল্প করেছিল, তখন কেউ বিশ্বাসই করতে চায়নি। মনে করছিল, সাংবাদিক হিসাবে ভাও বাড়ানোর জন্য গল্পটা বানিয়েছে। তখনই অর্ক ঠিক করেছিল, খবর যা-ই পাক, প্রাণের ঝুঁকি কখনও আর নেবে না। কিন্তু ফের ও সেই বোকামিটাই করল।

জঙ্গলের ভেতর দিয়ে হাঁটার সময় অর্ক ধরেই নিয়েছিল, বেঁচে ফিরবে না। এই গভীর জঙ্গলে ওকে মেরে ফেললে কেউ ওর লাশও খুঁজে পাবে না। নুরুল নিশ্চয়ই খবরটা কলকাতায় দিয়েছে। অফিসেও খবরটা পৌঁছেছে। দিব্যদারা বিশ্বাস করেছে কী না, কে জানে? ওর কিডন্যাপড হওয়ার খবরটা কলকাতায় পৌঁছনোর পর কী হতে পারে, সেটা পর-পর ভেবেছিল তখন অর্ক। নিউজ চ্যানেলগুলো হয়তো খবরটা করবে। প্রেস ক্লাবেও ওকে নিয়ে আলোচনা হবে। হঠাৎই তখন ওর রমাপদদার কথা মনে পড়েছিল। ইস, বুক রিভিউটা লিখে দিয়ে আসা হল না। কী ভাবছেন উনি, কে জানে?

মাওবাদীরা অবশ্য ওর সঙ্গে কোনও খারাপ ব্যবহার করেনি। গভীর জঙ্গলে ছোট্ট একটা তাঁবুর ভেতর ওকে থাকার জায়গা দিয়েছে। দু'বেলা খাইয়েছে। দুটো জলের বোতল দিয়ে গেছে। সন্ধেবেলায় একটা লণ্ঠন রেখে গেছে। পড়ার জন্য দিয়েছে ওদের কয়েকটা বইও। ওকে মেরে ফেলার মতো কোনও লক্ষণ দেখায়নি। অর্ক একটা জিনিস লক্ষ করেছে, মাওবাদী ছেলেমেয়েগুলো মুখ ঢেকে, একেক জন একেকটা কাজে ওর সামনে এসেছে বটে, কিন্তু কেউ দ্বিতীয় বার ওর সামনে আসেনি। ওরা তাঁবু থেকে বেরোতে মানা

করেছিল বলে অর্ক বাইরে পা দেয়নি। ফলে জানতেও পারেনি, অন্যরা কে কোথায় আছে। বিকালে তাঁবুর পর্দা সরিয়ে একবার অবশ্য অর্ক বাইরে উঁকি মেরেছিল। তখন ওর চোখে পড়ে, দূরে ফাঁকা একটা জায়গায় জনা পঁচিশ ছেলেমেয়ে শারীরিক কসরত করছে অস্ত্র কাঁধে নিয়ে। আর্মির জওয়ানদের মতো টগবগ করে ফুটছে।

রাত্তির ক'টা বাজে, অর্ক আন্দাজ করতে পারছে না। জঙ্গলের ভেতর ঘন অন্ধকার। লম্বা লম্বা শাল, সিয়াশাল, সেগুন গাছের নীচ দিয়ে সুড়ি পথ। মেয়েটার হাতে ধরা টর্চের আলো দেখে ও হেঁটে যাচ্ছে। পায়ের তলায় ঝরা পাতায় খসখস শব্দ হচ্ছে। আকাশের দিকে তাকিয়ে অর্ক দেখল, তারা- গুলো ঝকমক করছে। নয়াগ্রামে যেদিন ও প্রথম এসেছিল, সেদিন শিউচরণ বলেছিল, দলমা পাহাড় থেকে যে সব হাতি নামে, তারা এই জঙ্গলের মধ্যে দিয়েই নাকি গ্রামের দিকে যায়। বছরের কোন

সময়টায় ওরা উৎপাত করে, তাও সেদিন বলেছিল। কিন্তু সেটা শীতকাল কী না, অর্কর তা মনে নেই। তবে ধান ওঠার সময়। কোনও হাতি অবশ্য ওর চোখে পড়েনি। তবে জঙ্গলে যে প্রচুর হনুমান আছে, কাল ট্রেকার থেকে নেমেই ও টের পেয়েছিল। সশস্ত্র ছেলেগুলোকে দেখেই হনুমানের দল লাফালাফি করে গাছের ডালে, পাতার আড়ালে লুকিয়ে পড়েছিল। হয়তো অনেক নিষ্ঠুর ঘটনার সাক্ষী।

জঙ্গলের এই জায়গাটা এত শব্দহীন, যে অর্কের কানে তালা লেগে গেল। প্রায় সারাটা দিন ও কারও সঙ্গে কথা বলেনি। স্রেফ কথা বলার তাগিদেই ও মেয়েটাকে জিজ্ঞেস করল, 'জানতে পারি, আপনাদের এই লিডারটি কে?'

'কমরেড সানি।'

বলেই মেয়েটা চুপ করে গেল। কমরেড সানির নাম আগে কখন শুনেছে কী না, অর্ক মনে করতে পারল না। আসলে মাওবাদীদের সম্পর্কে ও কিছুই জানে না। সপ্তাহখানেক আগে কমরেড সোমেন নামে ওদের একজন লিডার ধরা পড়েছিল সাঁতরাগাছি রেল স্টেশন থেকে। তখন কয়েকটা খবর বেরোয় ওদের কাগজে। অর্কর ধারণা ছিল, মাওবাদীদের ঘাঁটি এ রাজ্যে মূলত পুরুলিয়া, বাঁকুড়া আর বীরভূমে। এ ছাড়া ওরা খুব সক্রিয় ঝাড়খণ্ড, বিহার, অন্ধ্রপ্রদেশে। ওরা যে কলকাতার আশপাশে, মেদিনীপুরেও প্রভাব বাড়িয়ে ফেলেছে, এখানে লিফলেটগুলো না পড়লে অর্ক জানতেও পারত না।

হাঁটতে হাঁটতেই মেয়েটা হঠাৎ শিস দিল। ঘুরে গাছের ফাঁক থেকে টর্চের আলো একবার জ্বলে উঠেই নিভে গেল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকার ফুঁড়ে দু'টি ছেলে সামনে এসে দাঁড়াল। মেয়েটা অর্কর দিকে ঘুরে তাকিয়ে বলল, 'আপনি এদের সঙ্গে যান। এরা আপনাকে নিয়ে যাবেন লিডারের কাছে।'

আরও মিনিট দুয়েক হাঁটার পর ঝোপঝাড়ে ঘেরা দুর্গের মতো একটা জায়গায় নিয়ে গিয়ে ছেলেটা বলল, 'আপ ইহা বৈঠিয়ে মিঃ সান্যাল। লিডার আপ হি কা লিয়ে ইন্তেজার কর রঁহা হ্যায়।' একটা বড় তাঁবুর সামনে ফাঁকা জায়গায় বাঁশের কয়েকটা বেঞ্চ। মাঝে একটা টেবলের ওপর লণ্ঠন বসানো। তাঁবুর ডানদিকে এক কোণে রান্নার আয়োজন চলছে। খিচুড়ির গন্ধে জায়গাটা ভরপুর। অনেকটা হেঁটে আসার দরুন অর্কর প্রচণ্ড জল তেষ্টা পেয়েছিল। টেবলের ওপর রাখা একটা বোতল তুলে নিয়ে ও ঢকঢক করে জল খেতে লাগল। জল খাওয়ার সময়ই ও শুনতে পেল, 'অর্কদা, আপনাকে কষ্ট দেওয়ার জন্য আমি এক্সট্রিমলি সরি। এ ছাড়া আমার আর অন্য কোনও উপায় ছিল না।'

তাঁবুর পর্দা সরিয়ে যে ছেলেটা সামনে এসে দাঁড়িয়ে কথাগুলো বলছে, তাকে দেখে অর্ক অবাক হয়ে গেল।

আরে, সুনীল না? হাউসিং কমপ্লেক্সে ওদেরই চারতলার মাসিমা-মেসোমশাইয়ের ছেলে। এখানে কী করছে? অর্ক একদিন শুনে এসেছে, সুনীল হায়দরাবাদে একটা নামকরা সফটওয়ার কোম্পানিতে চাকরি করে। এই ক'দিন আগেও, পুজোর ছুটিতে বাড়িতে এসে সুনীল নিজে অনেকক্ষণ প্যান্ডেলে বসে ওর সঙ্গে গল্প করেছিল। সে কী করে মাওবাদী সংগঠনে যুক্ত হল এই ক'দিনের মধ্যে ? অবাক হয়ে ও বলল, 'সুনীল, তুমি? তুমি এদের সঙ্গে?'

সুনীল বলল, 'খুব অবাক হচ্ছেন, তাই না ? আরে, আগে জম্পেস করে বসুন। টেনশন ফ্রি হয়ে নিন। তার পর আপনার কৌতূহল মেটানো যাবে।'

সুনীলকে দেখে অর্কর টেনশন উবে গেল। সত্যিই সারপ্রাইজিং। গত বারো ঘণ্টার মধ্যে এই প্রথম ওর মনে হল, শেষ পর্যন্ত কলকাতায় ফিরতে পারবে। বাঁশের বেঞ্চে বসে ও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। টেবলের ওপর খাবার সাজানো হচ্ছে। গরম খিচুড়ি আর একটা লাবরা জাতীয় তরকারি। দেখেই মারাত্মক খিদে পেয়ে গেল অর্কর। একটু দূরে ওয়ারলেসে কথা বলছে সুনীল। কী ভাষায় বলছে, অর্ক বুঝতে পারল না। মনে হয় তেলেগু। হতেও পারে, প্রায় সাত-আট বছর অন্ধ্রপ্রদেশে কাটিয়েছে। হয়তো তেলেগু শিখে নিয়েছে। অথবা, ওদের নিজস্ব কোনও সাংকেতিক ভাষা আছে। যাতে পুলিশ আড়ি পাততে না পারে। বেশ কিছুক্ষণ কথা বলার পর এ দিকে এসে একটা প্লেট তুলে নিয়ে সুনীল বলল, 'নিন অর্কদা, খাওয়া শুরু করা যাক।'

অর্ক বলল, ' আমার সঙ্গে যে লোকটিকে তোমরা তুলে এনেছ, সে কোথায়?'

' তাকে আনতে লোক পাঠিয়েছি। সে আসার আগে আপনার কৌতূহল মিটিয়ে দিই। আমি কিন্তু পাঁচ বছর ধরে এদের সঙ্গে আছি।

বলতে পারেন, স্বেচ্ছায় মাওবাদী মতাদর্শে বিশ্বাস করেই এসেছি। অন্ধ্রপ্রদেশ আর ওড়িশার নানা অঞ্চলে কাজ করার পর, রিসেন্টলি কাজ শুরু করেছি মেদিনীপুরে। পার্টিকে বোঝাতে পেরেছি, একটা সময় মেদিনীপুর ছিল বিপ্লবীদের খাস তালুক। প্রচুর বিপ্লবীর জন্ম দিয়েছে এই জেলা। মাত্র এক সপ্তাহ আগে হাইকমান্ড আমাকে এই ক্যাম্পের দায়িত্ব দিয়েছে।'

প্লেটে খিচুড়ি তুলে নিয়ে অর্ক বলল, 'তা হলে তোমার চাকরি?'

'কবে ছেড়ে দিয়েছি। হায়দরাবাদে কর্পোরেট চাকরি করার সময়ই আমার সঙ্গে আলাপ হয় কমরেড রেড্ডির। সত্যি বলতে কী, ওকে দেখে ইন্সপায়ার্ড হয়েই আমি বিপ্লবের রাস্তায় নেমেছি। কমরেড রেড্ডি তখন আমাকে বুঝিয়েছিলেন, তোমাদের মতো শিক্ষিত, ডাক্তারি-ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করা ছেলেই আমার দরকার। নেতৃত্ব তোমাদের মতো ছেলেদের নিতে হবে। চাকরিটা তুমি ছেড়ে দাও। আমার ফ্যামিলি সম্পর্কে উনি খোঁজখবর নিয়েছিলেন। তাই প্রতি মাসে কিছু টাকা উনি পাঠিয়ে দেন। পার্টি ফান্ড থেকেই সেটা যায়।'

'মাসিমা-মেসোমশাই এ সব জানেন?'

'এখনও পর্যন্ত না। অবশ্য একদিন না একদিন জানতে তো পারবেনই। কী আর করা যাবে। কাগজে দেখলাম, কয়েকদিন আগে কমরেড সোমেন ধরা পড়েছেন। ওর স্ত্রীও কিন্তু কিছুই জানতেন না। এইভাবেই আমাদের আন্ডারগ্রাউন্ডে থাকতে হবে।'

'কেন তুমি এ পথে এলে সুনীল?'

pathagar.net

'জ্বালায়। জানেন অর্কদা, আমার এক কাকা নকশাল আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র। সাঁতারে স্টেট চ্যাম্পিয়ন। আমাদের কাছে কাকা আদর্শ বলতে পারেন। তখন আমরা থাকতাম বাগবাজার অঞ্চলে। এক রাত্তিরে পুলিশ বাড়িতে এসে গুলি করে মেরেছিল আমার ওই কাকাকে। তখন আমার বয়স মাত্তর ছয়। যৌথ পরিবারে থাকতাম। চোখের সামনে সেই নিষ্ঠুরতা দেখে ছিলাম। সেই তখন থেকেই রাষ্ট্রযন্ত্রের ওপর আমার রাগ। আমার কাকা তো অপরাধী ছিলেন না। উনি ভিন্ন একরাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাস করতেন। তা হলে কেন পুলিশ তাকে মারবে?'

'ডোন্ট মাইন্ড সুনীল, বিপ্লবের নামে এই যে তোমরা ল্যান্ডমাইন পুঁতে রেখে মানুষ মারছ, রেল লাইন উড়িয়ে দিচ্ছ, সে সব অরাজকতা নয়?'

'কমরেড মাও কী বলে গেছেন জানেন? প্রোগ্রেস ইজ বর্ন ইন ক্যায়োস, অ্যান্ড অরিজিনালিটি কামস ফ্রম ডেস্ট্রাক্শন। আমরাও তাই মনে করছি, ধ্বংস ছাড়া বিপ্লব আসতে পারে না।'

'কিন্তু সুনীল, চিন-ই তো মাও দে জংকে আলমারিতে তুলে রেখে দিয়েছে।'

'ভুল কথা অর্কদা। কমরেড মাও কিন্তু মনে করতেন, মার্কসিজম কনসিস্টস অব থাউজেন্ডস অব ট্রুথ, বাট দে অল বয়েল ডাউন টু ওয়ান। যে যেমন ভাবে এগোতে চায় আর কী। তবে ইট'স রাইট টু রেবেল এগেনস্ট রিঅ্যাকশনারিস। আরে, এত কথা বলছি কেন? আপনি লিখবেন নাকি?'

নন্দিনী বলল, 'পিপি এত ভেঙে পড়ছে কেন আমি বুঝতে পারছি না মাসিমা। অর্ককে আপনারা চেনেন না। এখানে পুঁতে দিলে মাটি ফুঁড়ে উঠবে। মাওবাদী কেন, আল কায়দা, লস্কর-ই- তৈবাও ওর কিস্যু করতে পারবে না।'

ঘরে তখন মায়ের কোলে মাথা দিয়ে শুয়ে আছে সাঁঝেলি। সারা দিন কান্নাকাটি করে ওর চোখ মুখ শুকিয়ে গেছে। সারাটা দিনই টিভি খুলে বসেছিল। এই আশায় যে, অর্ক সম্পর্কে নতুন খবর শুনতে পাবে। কিন্তু কোনও চ্যানেলেই খুব বেশি খবর দিতে পারেনি। বিকেলের দিকে একবারই মাত্র মেদিনীপুরের পুলিশ সুপার একটা বাইট শোনাল, অর্ক সান্যালের খোঁজ চলছে। বাকি সময়টায় নুরুলের বক্তব্যই রিপিট করছে। কী করে ঘটনাটা ঘটল, তার বিবরণ শোনাচ্ছে।

নন্দিনী একটা সময় বিরক্ত হয়েই টিভি-র সুইচ অফ করে দিয়েছিল। তারপর বলেছিল, 'জানিস পিপি, কাল রাতে যখন অফিস থেকে বেরোচ্ছি, তখন রিসেপশনে অর্কর সঙ্গে দেখা। আমাকে বলল, দিন দুয়েকের জন্য বাইরে যাচ্ছে। দিব্যদাকে কিছু না জানিয়ে। বলল, তুই ম্যানেজ করিস। তখনই আমার সন্দেহ হয়েছিল, আবার কোনও রিস্ক নিতে যাচ্ছে। এত বারণ করতাম, কাগজের জন্য রিস্ক নিস না। শুনতই না আমার কথা।'

সাঁঝেলি বলেছিল, ' তোর বাপি তো মিনিস্টার। ওঁকে বল না, অন্য কোনও চ্যানেল দিয়ে যদি অর্কর কোনও খবর এনে দিতে পারেন। ওঁর তো অনেক সোর্স।'

'বাপিকে দুপুরে বলেছি। বাপি তখনই কথা বলেছে, সিপিআই এম এল মাওয়িস্ট পার্টির কোনও এক স্টেট কমিটির মেম্বারের সঙ্গে। বিশ্বাস কর, অর্ক ওদের হিট লিস্টে নেই। ওকে ওরা নিয়ে গেছে অন্য কোনও কারণে। মার্ডার-টার্ডার করার জন্য নয়।'

নন্দিনী আশ্বাস দেওয়া সত্ত্বেও সাঁঝেলির মন শান্ত হচ্ছে না।

বেলা দশটার সময় খবরটা প্রথম শোনার পর ও হাউমাউ করে কেঁদে উঠেছিল। মনার মা তখন কী একটা কাজে ওর ঘরে। ও-ই ছুটে গিয়ে বাবা আর মাকে ডেকে আনে। সাঁঝেলি কোনও কথা বলতে পারেনি। শুধু আঙুল দিয়ে টিভি-টা দেখিয়ে দিয়েছিল। সারাদিন ও একটা প্রশ্নই করেছে, 'মা, যদি ওকে মেরে ফেলে, তা হলে কী হবে?' একটা সময় ওর চোখ মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছিল। ভয় পেয়ে ওর মা শেষ পর্যন্ত ফ্যামিলি ফিজিশিয়ানকে ডেকে আনেন। সব শুনে, আর পরীক্ষা করে ডাক্তারবাবু বলে গেলেন, মেন্টাল ট্রমার জন্য বি পি ফল করে গেছে। প্রার্থনা করুন, যেন ফারদার খারাপ কিছু না শোনে।

সাঁঝেলি সবার সব কথা শুনছে, কিন্তু ওর মন পড়ে রয়েছে মেদিনীপুরে। [illegible] একটা সময় ও প্রায় ঠিক করেই ফেলেছিল, দীপিকাদিকে নিয়ে নয়াগ্রামে যাবে। কিন্তু ফোন [illegible] বলেন, ওঁর হ্যাজব্যান্ড সকালের ফ্লাইটে চেন্নাই গেছেন একটা অপারেশন করার জন্য। বাড়ি ফাঁকা রেখে তাই দীপিকাদি কোথাও বেরোতে পারবেন না। আসলে অর্কর খবরটা শুনে উনি হয়তো ভয় পেয়ে গেছেন। কেননা, অর্কর মতো থ্রেট কল গত কয়েক দিন ধরে উনিও পাচ্ছিলেন।

এর পর সাঁঝেলি ফোন করেছিল শিউচরণকে। কিন্তু ওকে ধরতে পারেনি। শিউচরণ বলেছিল, অর্কর সঙ্গে নয়াগ্রাম যেতে পারে। ও গেছে কী না তা জানতে পারেনি। এখন পর্যন্ত শিউচরণ যোগাযোগ করেনি। তার মানে নিশ্চয়ই খারাপ কিছু ঘটেছে। খারাপ খবরটা নিজে আর দিতে চাইছে না। কেন জানে না, সাঁঝেলির বার বার মনে হচ্ছে অর্কর যদি খারাপ কিছু হয়, তা হলে তার জন্য দায়ী হয়ে থাকবে ও আর শিউচরণ।

কেননা, ওদের কথাতেই হনুমানের কিডনি সম্পর্কিত খবরটা করতে অর্ক মেদিনীপুর গিয়েছিল। মানুষের জীবন কী বিচিত্র। পরশু বিকালে যে মানুষটা ফোনে এত কথা বলল, আজ হয়তো সে নেই। ' নেই' কথাটা মনে হওয়ার পরই ওর চোখের দুকূল ভাসিয়ে জল নেমে এল।

মা বলল, 'লিলি, আবার তুই শুরু করলি? অর্কর কিছু হয়নি। আমি মা তো, আমি বলছি। দেখবি, কাল সকালের মধ্যেই ও তোকে ফোন করবে।'

সাঁঝেলি বলল, 'না, মা । ওর নিশ্চয়ই কিছু হয়েছে। এতবার ফোন করলাম, তবুও ধরল না। এতবার মেসেজ পাঠালাম। রিপ্লাই দিল না কেন? ও বেঁচে নেই মা। আমাকে ও খুব ভালোবাসত। বাবাকে তুমি ফোন করতে বল। ডি জি-র কাছে জানতে চাক, অর্কর কোনও খবর পেলেন কী না।'

' তোর বাবা তো দুপুরে একবার ফোন করল মা। খবর পেলে ডি জি নিশ্চয়ই জানাতেন। তুই এত অস্থির হচ্ছিস কেন?'

'তা হলে ফোন করে আশিসদাকে একবার আসতে বল।'

' আচ্ছা বলছি। বাবা রে বাবা, আমাকে তুই পাগল করে দিবি দেখছি। সর, বোধহয় কেউ এসেছে। ডোর বেল বাজছে। মনার মা যে কোথায় থাকে?' বলেই মা উঠে গেল। একটু পরেই ফিরে এসে বলল, 'অর্কর কে এক বন্ধু এসেছে লিলি, তোর সঙ্গে কথা বলতে চায়। ভেতরে আনব?'

সাঁঝেলি বলল, ' কে বন্ধু মা, আমি তো অর্কর কোনও বন্ধুকে চিনি না।'

pathagar.net

নন্দিনী বলল, 'আমি ওর সব বন্ধুকে জানি। ভেতরে আসতে বলুন মাসিমা।'

একটু পরেই পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর বয়সের একটা ছেলে এসে ঘরে ঢুকল। পরনে পাজামা-পাঞ্জাবি। হাতে টিভি-র বুম। ছেলেটার পিছনে ক্যামেরা হাতে আরেকটি ছেলে। ওদের দেখে সাঁঝেলি উঠে বসল। নিশ্চয়ই কোনও টিভি চ্যানেলের রিপোর্টার। ছেলেটাকে দেখেই ও বিরক্ত হল। মায়ের বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পেয়েছে।

এই সময় টিভি-র কোনও রিপোর্টারকে ঢুকতে দেওয়া উচিত? এই ছেলেটা খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে অবাস্তব কিছু প্রশ্ন করবে। মিডিয়ার লোকজনকে ভালো করে চেনে সাঁঝেলি।

নন্দিনী আর ওকে বসে থাকতে দেখে পাঞ্জাবি পরা ছেলেটা বোধহয় বুঝতে পারেনি, কে সাঁঝেলি। বলল, 'নমস্কার, আমি সায়ন্তন দত্তরায়। আমি সাঁঝেলি মিত্রর সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

সাঁঝেলি কিছু বলার আগেই নন্দিনী বলল, 'কী ব্যাপার বলুন।'

'অর্কদার কিডন্যাপ হওয়ার ব্যাপারে জানতে এসেছি।'

'এখানে আপনাকে কে পাঠাল।'

'আসলে ম্যাডাম, আমি অর্কদার বাড়িতে গেছিলাম। শুনলাম, ওর ফ্ল্যাটে আর কেউ থাকেন না। খোঁজ করতে, বুবাই বলে একটা ছেলে আপনার কথা বললেন।'

তার মানে ছেলেটা ধরেই নিয়েছে, নন্দিনীই সাঁঝেলি। এই সব ছেলে রিপোর্টার হবে? চোখ মুখের অবস্থা দেখেই তো বোঝা উচিত ছিল, কে সাঁঝেলি। অর্ক ঠিকই বলে, রিপোর্টার জন্মায়, তৈরি করা যায় না। পিছনে দাঁড়ানো ছেলেটা ক্যামেরা চালু করে দিয়েছে। সেটা

দেখে নন্দিনী তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল। আরে, ছবি তোলার আগে এরা পারমিশন নেওয়ারও কোনও প্রয়োজন মনে করে না? ও রেগে বলল, 'আগে ক্যামেরাটা বন্ধ করতে বলুন, তার পর আপনার সঙ্গে কথা বলব।'

'প্লিজ ম্যডাম, আপনি এক্সাইটেড হবেন না। আমাদের কাছে ঘণ্টাখানেক আগে একটা খবর এসেছে। চন্দ্রকোণা রোডের ওপর বিকেলের দিকে একটা ডেড বডি পাওয়া গেছে। ওই জায়গাটা মেদিনীপুর স্টেশন থেকে পাঁচ কিলোমিটার দূরে। মানে... যেখান থেকে অর্কদাকে কিডন্যাপ করা হয়েছে। মাথাটা একেবারে থ্যাঁতলানো। বয়স আটাশ-উনত্রিশ বছর। ওই ডেড বডিটা অর্ক স্যান্যালের কী না, সেটা পুলিশ বুঝতে পারছে না। আমাদের চ্যানেলেই খবরটা প্রথম আমরা দেখাই। আপনারা শোনেননি?'

খবরটা শুনে সাঁঝেলি দু'হাত দিয়ে মুখটা ঢেকে ফেলল। ওর মুখ দিয়ে শুধু 'মাগো' শব্দটা বেরোল। অর্কর থ্যাঁতলানো দেহটার কথা চিন্তা করতেই, ওর বুকের ভেতরটা কেমন যেন করে উঠল। তবে কেন মা বলল, অর্কর কিছু হয়নি? কাল সকালেই ঠিক ফোন করবে। সাঁঝেলির চোখের সামনে হঠাৎই অন্ধকার নেমে এল। সাদা-লাল-নীল তারার ফুটকি। তারই মাঝে বিরাট একটা গহ্বর। ওর মনে হল,

টুকি আর টাকি ওর বিছানায় কখনও সখনও যেভাবে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে থাকে, সেই ভাবে শুয়ে ওই গহ্বরের ভেতর ও তলিয়ে যাচ্ছে। তলিয়ে যেতে যেতেই ঠাণ্ডায় হি হি করে কাঁপতে লাগল সাঁঝেলি। তখনই শুনতে পেল, মা বলছে, 'এই লিলি, ঠিক করে শো। এমন বিচ্ছিরিভাবে শুয়ে আছিস কেন?' ঠিক যেমন ছোটবেলায় বলত। ঘুমে চোখ দু'টো বুজে আসছে এখন সাঁঝেলির। গায়ে চাদর না দিয়ে কিছুতেই ও ঘুমোতে পারে না। মাকে ও বলতেই পারল না, আমাকে একটা ব্লাঙ্কেট এনে দাও।

ঘুমের ঘোরে তলিয়ে যাওয়ার আগে ও শুনতে পেল নন্দিনী খুব বকাবকি করছে টিভি চ্যানেলের ছেলেটাকে। 'আপনি মানুষ, না জানোয়ার? সিওর না হয়ে,

আন্দাজে একটা খবর দিতে এসেছেন? দেখলেন তো, রেজাল্টটা কী হল? প্লিজ, আপনি এখন আসুন। আপনার সঙ্গে কোনও কথা আমরা বলব না। যান বলছি।'

শেষ দু'টো কথা নন্দিনী চেঁচিয়ে বলল। অন্য কোনও সময় হলে 'মানুষ না জানোয়ার' কথাটা নিয়ে সাঁঝেলি প্রতিবাদ করত। আজ আর ওর মধ্যে রাগ করারও শক্তি নেই।

ওর চোখের সামনে এখন শুধু অন্ধকার। কিছু দেখতে পাচ্ছে না বটে, কিন্তু ওর কান দুটো আগের মতোই সজাগ। সাঁঝেলি হঠাৎ শুনল, টুকি ডাকছে, 'এই পিপি, ওঠো। শিগগির চল।' অন্য দিন ঘুম থেকে তোলার জন্য জিভ দিয়ে ওর কান চেটে দেয় টুকি। আজ পরিষ্কার মানুষের গলায় কথা বলছে। ওর কুচকুচে কালো শরীরটা উত্তেজনায় কাঁপছে। লেজ নাড়াতে নাড়াতে টুকি ফের বলল, 'তুমি যার জন্যএত কষ্ট পাচ্ছ পিপি, আমি জানি, সে কোথায় আছে। আমার সঙ্গে চলো।'

সঙ্গে সঙ্গে ঘুম চটকে গেল সাঁঝেলির। ও উঠে বসে বলল, 'তুই ঠিক জানিস, অর্ক কোথায় আছে? আমাকে নিয়ে যেতে পারবি সেখানে?' অন্য পাশ থেকে টাকি বলল, 'ওই তো ওই দিকের জঙ্গলে। একদম ভেতরে। আমরা নিয়ে যেতে পারি। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, তোমাকে নিয়ে গেলে ওই জঙ্গল থেকে আমরা কিন্তু আর ফিরে আসতে পারব না। আমরা ঢোকার রাস্তাটা জানি, বেরনোর রাস্তা চিনি না।'

টুকি বলল, 'এখন তুমি বলো, তুমি কোনটা চাও তুমি যে মানুষটাকে ভালোবেসে ফেলেছ, তাকে? না এতদিন যাদের ভালোবাসতে, সেই আমাদের দু'জনকে?'

'প্লিজ, তোরা আমার কথাটাও ভাব সোনা। অর্ককে ছাড়া আমি যে বাঁচব না রে।'

টুকি বলল, 'ঠিক আছে, উত্তরটা আমরা পেয়ে গেছি। তার মানে তুমি আর এখন আমাদের ভালোবাসো না। কী করা যাবে। তোমরা মানুষরা অকৃতজ্ঞ হতে পার। ভালোবাসার লোক দু'দিন অন্তর বদলাতে পার। আমরা তো তা পারি না। এতদিন খাইয়েছ, যত্ন নিয়েছ আমাদের। তার একটা প্রতিদান আমাদের দেওয়া উচিত। চল।'

টাকি বলল, 'হেঁটে যেতে পারবে কি? তোমার শরীরের যা অবস্থা। জঙ্গলের ভেতরটা কিন্তু তোমার বিছানার মতো নয়। মনে থাকে যেন।'

ঘুম ঝেড়ে ফেলে সাঁঝেলি লাফিয়ে উঠল। টুকি আর টাকিকে দু'হাত জড়িয়ে ধরে চুমু খেয়ে বলল, 'আমার সোনা সোনা। প্লিজ রাগ করিস না। দেখিস। আমার মতো অর্কও তোদের খুব ভালোবাসবে। আমরা দু'জনে মিলে তোদের খুব ভালোবাসব। লক্ষ্মীটি, ওর কাছে আমাকে নিয়ে চল।'

টুকি অভিমানী গলায় বলল, 'থাক, আমাদের আর খুশি করতে হবে না।'

ওদের সঙ্গে বাড়ি থেকে বেরতেই সাঁঝেলি দেখল, বাইরে গাঢ় অন্ধকার। আশপাশের বাড়ি ঘরদোর, পরিচিত দোকানপাট, রাস্তাঘাট কোনও কিছুই ওর চোখে পড়ল না। টুকি আর টাকির পিছনে ও হাঁটতে লাগল। টানা অনেকক্ষণ ধরে হাঁটার অভ্যেস ওর নেই। মা গাড়ি ছাড়া কোথাও বেরতে দেয় না। হাঁটতে হাঁটতে সাঁঝেলি ক্লান্ত হয়ে পড়ল। এই কিছুদিন আগে পর্যন্ত রোজ সকাল বেলায় টুকি আর টাকিকে ও পার্কে ঘুরিয়ে আনতে যেত। ওর হাতে থাকত চেন। দুষ্টু দু'টো মাঝে মধ্যে দৌড়ে ওকে নাকাল করে দিত। একদিন ওদের সামলাতে না পেরে সাঁঝেলি হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেছিল। তারপর থেকে দায়িত্বটা ও তুলে দেয় শোনপুরির হাতে। আজ সেই চেন টুকি আর টাকির হাতে।

এখন বোধহয় শোধ নিচ্ছে ওরা। প্রায় দৌড়তে শুরু করেছে। সাঁঝেলি বড় বড় নিঃশ্বাস নিতে শুরু

করল। টলতে টলতেই ওদের পিছনে দৌড়চ্ছে। যেন এই শেষ সুযোগ, অর্ককে খুঁজে পাওয়ার। টুকি আর টাকি যদি নাগালের বাইরে চলে যায় তা হলে আর অর্ককে কোনও দিনই পাবে না। সহ্যশক্তির চরম পরীক্ষা দিতে লাগল সাঁঝেলি। একটা জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে ও এখন দৌড়চ্ছে। যতবারই ও জানতে চাইছে, 'আর কতদূর,' ততবারই টুকি আর টাকি পূবদিকের আকাশটা দেখিয়ে বলতে লাগল, 'ওই দিকটা যখন ফরসা হয়ে আসবে, ঠিক তখন।' সারা শরীর ঘামে ভিজে জবজব করছে সাঁঝেলির। পা আর চলছে না। হঠাৎই ও হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল। দু'পাশে দু'হাত ছড়িয়ে ঘাসের ওপর ও শুয়ে রইল। আস্তে আস্তে চোখ খুলে সাঁঝেলি দেখল, মাথার ওপর অনন্ত আকাশ। একটা দু'টো করে তারা ওই আকাশ থেকে হারিয়ে যাচ্ছে। রাত শেষ আর ভোর শুরুর এই মুহূর্তটা সাঁঝেলি বহু বছর দেখেনি। এই মুহূর্তটাকেই কি উষাকাল বলে? সেদিন অর্ক ওকে বলেছিল, সকালবেলায় ও উষালি বলে ডাকবে। কেন এখন ডাকছে না? অর্কর কথা মনে হতেই ওর চোখের কোণ ভিজে উঠল। জীবনে আর কখনও অর্কর সঙ্গে কি ওর দেখা হবে? মনে হয়, না। টুকি আর টাকি ওকে অর্কর কাছে নিয়ে যাবে বলল। কিন্তু গেল কোথায় ওরা? অনেক কষ্টে ঘাড় ঘুরিয়ে ও টুকি আর টাকিকে দেখার চেষ্টা করল। দেখল, অনেকটা দূরে দাঁড়িয়ে ওর প্রিয় দুই ল্যাব্রাডার কুকুর করুণ দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছে। নিশ্চয়ই [illegible] পেয়েছে। আরও প্রিয় একজন সাঁঝেলির জীবনে এসে গেছে। ওদের আর প্রয়োজন নেই।

আকাশ ধীরে ধীরে ফরসা হচ্ছে। মৃদু বাতাস বইতে শুরু করল। জঙ্গলের দিক থেকে মিষ্টি একটা শব্দ ভেসে আসছে। টুং টাং, টুং টাং। শব্দটা সঙ্গে নিয়ে কেউ হেঁটে আসছে। কেউ বোধহয় কারও সঙ্গে কথা বলছে। হঠাৎ তীব্র আলোয় ওর চোখ ধাঁধিয়ে গেল। কাঁধ ধরে কেউ একজন ঝাঁকুনি দিচ্ছে। সাঁঝেলি এ বার উঠে বসল, 'লিলি, এই লিলি, তোর ফোন। অর্ক তোর সঙ্গে কথা বলতে চাইছে।'

মায়ের গলা না? এই জঙ্গলের ভেতর মা এল কী করে, ও বুঝতে পারছে না। ওর মোবাইল

ফোনটা মা এগিয়ে দিয়েছে। সাঁঝেলি দেখল, মা বিছানার ওপর বসে। নন্দিনী সোফার কাছে দাঁড়িয়ে। এ কী রাতে ও বাড়ি যায়নি? মনার মা দু'হাত জোড় করে কার উদ্দেশ্যে যেন প্রণাম করছে। বাবার চোখের কোণে কালি। বোধহয় এখনও ঘুমোতে যায়নি। সারাটা রাত ও যখন অর্কর খোঁজে দৌড়ে বেড়াচ্ছিল, তখন হয়তো বাড়ির লোকজন সব জেগেই কাটিয়ে দিয়েছে? মা ফের বলল, 'কথা বল মা, কথা বল। অর্ক তোকে ফোন করেছে।'

অর্ক? ও কোত্থেকে আসবে? তবে যে টিভির ছেলেটা বলল, ওর লাশ পাওয়া গেছে চন্দ্রকোণা রোডে? ছেলেটা কি তা হলে মিথ্যে কথা বলল? টিভি-র লোকেরা কেন মিথ্যে কথা বলে মা? বিশ্বাস আর অবিশ্বাসের দোলাচলেই সাঁঝেলি মোবাইল সেটটা কানে দিয়ে শুনতে পেল 'হ্যালো উষালি। আমি অর্ক বলছি, তোমার অর্ক। শুনতে পাচ্ছ?' উত্তর দেবে কী, ফোনে অর্কর গলা শুনে সাঁঝেলি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

৩০

রাত দেড়টা নাগাদ আড়াবাড়ির জঙ্গল থেকে চন্দ্রকোণা রোডে ওদের নামিয়ে দিয়ে গেছিল সুনীলের ঘনিষ্ঠ একটা ছেলে। মোটরবাইকে করে সেই রাস্তা পেরোনোর কথা জীবনেও ভুলবে না অর্ক। বাইকে দু'জনের সিটে তিনজন। একদিকে পুলিশের গুলিগোলার ভয়, অন্যদিকে

চড়াই উৎরাই। জঙ্গলের ভেতর একটা সময় বাইক থেকে ছিটকে পড়ে গেছিল অর্ক। শরীরটা ফিট বলে চোট পায়নি। বাইক চালাচ্ছিল যে ছেলেটা, শিউচরণ তখন তাকে মারতে উঠেছিল। তেলেগু ভাষায় ছেলেটা কী বলেছিল, অর্ক বুঝতে পারছিল না। কিন্তু ও যে দারুণ বাইক চালাতে পারে, সেটা পরে টের পেয়েছিল। জঙ্গলের ভেতর দিয়ে আসার সময়ই ওরা শুনতে পায়, দূরে কোথাও গুলিগোলা চলছে। সুনীল তা হলে ঠিক খবরই পেয়েছিল, পুলিশ কোম্বিং অপারেশন করবে। শিউচরণ তখন ফিসফিস করে বলে, 'আর একটু দেরি হলে আমরা বেরিয়ে আসতে পারতাম না স্যার। আপনার বন্ধু বাঁচিয়ে দিল।' তেলেগু ছেলেটা বড় রাস্তায় নামিয়ে পশ্চিম দিকে ইঙ্গিত করে বোঝাতে চেয়েছিল, ওই দিকে পুলিশ স্টেশন। তারপর

আর কোনও কথা না বলে দ্রুত জঙ্গলের মধ্যে হারিয়ে যায়। সেই দিকে তাকিয়ে অর্ক ভগবানের কাছে একবার প্রার্থনা করেছিল, সুনীল যেন ধরা না পড়ে। অন্ধকার রাস্তা দিয়ে ও আর শিউচরণ হাঁটতে শুরু করে। সত্যি বলতে কী, শিউচরণ সঙ্গে না থাকলে অর্ক এক পাও নড়ত না। দু'পাশে জঙ্গল, তারার আলোয় পথ চলতে হচ্ছে। হাঁটতে হাঁটতে শিউচরণ একবার বলেও ফেলে, 'স্যার, আপনার খারাপ কিছু হলে আমি ম্যাডামের কাছে মুখ দেখাতে পারতাম না। আর কোনও ভয় নেই। এই রাস্তাটা আমি চিনি। কপাল ভালো থাকলে, বাসও পেয়ে যেতে পারি।'

সারাদিনের উৎকণ্ঠা হঠাৎ উধাও। তখনই সাঁঝেলির কথা মনে পড়ে অর্কর। প্রায় একটা দিন ওর সঙ্গে কোনও যোগাযোগ নেই। কিডন্যাপ হওয়ার খবরটা সাঁঝেলি নিশ্চয়ই নন্দিনীর কাছে শুনেছে। অবশ্যই ছটফট করছে। ওর সঙ্গে একবার কথা বলতে পারলে ভালো হত। অর্ক আফশোস করতে লাগল কেন মেদিনীপুরে নেমেই ও সাঁঝেলির সঙ্গে যোগাযোগ করেনি? মাওবাদীরা ওর ঘড়ি, মোবাইল সেট, টেপ রেকর্ডার সব ফেরত দিয়েছে। পকেট থেকে মোবাইল সেট বের করে ও দেখল সাঁঝেলির প্রচুর মিসডকল আর

মেসেজ। তখনই হাতঘড়ির দিকে তাকাল অর্ক। রাত প্রায় সাড়ে চারটে। এত রাত্তিরে সাঁঝেলিকে ফোন করা উচিত হবে না। ফোনটা বরং ভোর ছ'টা সাড়ে ছ'টা নাগাদ করবে। হাতে এখন অনেক কাজ। প্রথম কাজটা হল শালবনি থানায় গিয়ে পুলিশকে সব জানানো।

মিনিট চল্লিশ হাঁটার পর রাস্তার ধারে একটা দোকান দেখতে পেল অর্ক। উনুন ধরানোয় ব্যস্ত একটা লোক। ওদের দিকে লোকটা ত্রস্ত চোখে তাকাল। মাওবাদী ভাবল নাকি? অথবা পুলিশের লোক? দোকানের একটা পাল্লা বন্ধ, তার ফাঁকেই বিরাট একটা কড়াই চোখে পড়ে গেল অর্কর। দুধ জ্বাল দেওয়ার প্রস্তুতি চলছে। তার মানে মিষ্টির দোকান। চাইলে চা পাওয়া যেতে পারে। বেঞ্চের ওপর বসে অর্ক খুব সহজভাবে বলল, 'চা হবে?'

লোকটা বলল, 'দুধ নাই, লিকার হতি পারে।'

তাই সই, ঘাড় নাড়ল অর্ক। খানিকটা সময় তো কাটানো যাবে। ও জিজ্ঞেস করল, 'ভাই, এখান থেকে বাজার কদ্দুর?'

'পিচের রাস্তাধরি হাঁটি গেলে পঁচিশ মিনিট লাগবে। কিন্তুক বাবু আজ তো হাট নাই। যাবেন কুথাকে?' 'শালবনি থানায়।' লোকটাকে ইমপ্রেস করার জন্য অর্ক বলল, 'ও সি আমার বন্ধু। ওর বাড়িতে বেড়াতে এসেছি। মাঝরাস্তায় বাস খারাপ হয়ে গেছিল। তাই এত রাত্তির হল এখানে আসতে।'

' তাই বলেন। আমি ভাবি, এত রাত্তিরে, কোথা থিকে। থানায় যান, দারোগাবাবু এখুনি ফিরা- আইলেন জঙ্গল থিকে। গেলে পাবেন বটে।'

শিউচরণ জমিয়ে বসল লোকটার সঙ্গে। মাওবাদীদের সম্পর্কে নানা কথা জিজ্ঞেস করতে লাগল, ও স্থানীয় ভাষায় কথা বলছে দেখে লোকটা যেন নিশ্চিন্ত। চা তৈরি করতে করতে নানা প্রশ্নের উত্তর

দিচ্ছে। একটা সময় শিউচরণ বলল, 'এখানে কাছাকাছি কোথাও নার্সিংহোম আছে।?'

'চন্দ্রকোনা রোডের থিনে একটা আছে। ছোটখাটো, চলে নাই। সবাই ব্লক হাসপাতালে যায়। নার্সিং- হোমে খরচ বটে অনেক। লোকে পাবেক কোথায় টাকা?'

লিকার চা খেয়ে, অর্করা যখন থানায় পৌঁছল, তখন ভোর হয়ে গেছে। ওরা দেখল, বাজারের

পাশেই থানা চত্বরে পাঁচ ছ'টা জিপ আর চারটে বড় ভ্যান দাঁড়িয়ে রয়েছে। জনা কুড়ি পঁচিশ পুলিশ এদিক ওদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে। ওদের চোখমুখে চাপা উত্তেজনা। যেন কোথাও যুদ্ধ করে ফিরেছে। মাঝ রাত্তিরে জঙ্গলে গুলির শব্দ ওরা শুনেছে। তার মানে, রাতে এই পুলিশরাই মাওবাদীদের ডেরায় হানা দিয়েছিল। রাতে ঘুম হয়নি। চোখ জ্বালা জ্বালা করছে। থানা চত্বরেই একটা টিউবওয়েল দেখতে পেল অর্ক। টিউবওয়েলের জলে চোখ মুখ ও ভালো করে ধুয়ে নিল।

শিউচরণ ওসি-র খোঁজে থানার ভেতরে গেছে। গাছতলায় দাঁড়িয়ে পুলিশদের কথাবার্তা মন দিয়ে শুনছে অর্ক। একজন সহকর্মীর পেটে গুলি লেগেছে। শালবনিতে নিয়ে না এসে, তাকে গড়বেতা হাসপাতালে কেন নিয়ে যাওয়া হল, তা নিয়ে ক্ষোভ জানাচ্ছে দু'একজন। আড়াবাড়ি জঙ্গল থেকে গড়বেতা না, শালবনি-কোনটা কাছাকাছি অর্ক জানে না। জানার দরকারও নেই। কাল একটা ভয়ঙ্কর দিন কাটিয়েছে। এখানে কাজগুলো সেরে কত দ্রুত কলকাতায় ফিরবে, সে কথাই ও ভাবতে লাগল। হঠাৎই ওর নুরুলের কথা মনে পড়ল। ওসি-র সঙ্গে দেখা হওয়ার আগেই নুরুলকে ফোন করলে, গাড়ি নিয়ে মেদিনীপুর থেকেও চলে আসতে পারে।

তারপর ঠিক করা যাবে, কীভাবে ও কলকাতায় ফিরবে।

পকেট থেকে ফের মোবাইল ফোনটা বের করে অর্ক দেখল সাঁঝেলি মেসেজ পাঠিয়েছে। 'লাইফ উইদাউট ইউ ইজ ইমপসিবল...'। পুরো মেসেজটা ও দু'তিনবার পড়ল। ভালোলাগার একটা অদ্ভুত অনুভূতি ওকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। ফোন করে সাঁঝেলির সঙ্গে কথা বলার ইচ্ছেটাকে ও জোর করে দমাল। আগে নুরুলের সঙ্গে কথা বলার দরকার। গাঁ গঞ্জের মানুষ অনেক সকালে ঘুম থেকে ওঠে। এই সময় ফোন করলে হয়তো নুরুল বিরক্ত হবে না। কয়েকবার রিং হওয়ার পর ফোনটা ধরল নুরুল। ওর গলা পেয়েই উত্তেজিত হয়ে বলল, 'আপনি কোথায় অর্কদা? এ দিকে আপনাকে নিয়ে তো কলকাতায় হইচই হয়ে গেছে। সুস্থ আছেন তো?'

অর্ক বলল, 'ঠিক আছি। আমি এখন শালবনি থানায়। আসতে পারবে?'

'পুলিশই কি আপনাকে উদ্ধার করে নিয়ে এসেছে।?'

'না, তার দরকার হয়নি। ফোনে সব কথা বলা যাবে না। তুমি এস, তখন বলব।'

'আরে ছাড়বেন না, আমার একটা কথা আগে শুনুন অর্কদা। শালবনি থানায় এখন যিনি ওসি, সেই শৈলেন বিশ্বাস আপনাকে খুব ভালো করে চেনেন। কাল আপনার ব্যাপারেই আমি শালবনি থানা গেছিলাম। কথায় কথায় উনি বললেন, আপনারা নাকি একই কলেজে পড়তেন। ভদ্রলোককে কি আপনি চিনতে পারছেন?'

অর্ক বলল, 'এ বার চিনেছি। কলেজের ফুটবল টিমের ক্যাপ্টেন ছিল। খবরটা দিয়ে ভালো করেছ তুমি। এখুনি গিয়ে ওর সঙ্গে আমি দেখা করছি। তুমি কতক্ষণের মধ্যে আসছ বল। কিডনি র‍্যাকেটের

পাণ্ডা একটু পরেই ধরা পড়বে ।'

'তাই নাকি। আরে বাহ। আপনি থাকুন, আধঘণ্টার মধ্যে আমি আসছি।'

মিনিট দুয়েক পর শিউচরণকে সঙ্গে নিয়ে, অর্ক শৈলেনের সঙ্গে দেখা করতেই ও বলল, 'তুই এখানে? তোর খোঁজেই তো কাল সারারাত জঙ্গল তোলপাড় করেছি। হোয়াট আ সারপ্রাইজ। চল, চল আমার কোয়ার্টারে। ওখানে বসে কথা বলি। মাই গড, অর্ক তোর সঙ্গে যে এভাবে দেখা হবে, স্বপ্নেও কোনওদিন ভাবিনি।'

গলগল করে কথা বলে যাচ্ছে শৈলেন। ওকে একটু বেশিই খুশি খুশি বলে মনে হচ্ছে! প্রায় দশ

বছর পরে দেখা। উচ্ছ্বাস চেপে রাখতে পারছে না। কলেজের বন্ধুরা অবশ্য কোনওদিন পুরনো হয় না। যখন ফুটবল খেলত, তখন কী ছিপছিপে শরীর ছিল শৈলেনের। পুলিশের চাকরি করে এখন থলথলে হয়ে গেছে। অর্ক ভাবতে পারেনি, চায়ের দোকানের লোকটাকে যে কথাটা ও বলেছিল সেটা সত্যি হয়ে যাবে। উৎসাহে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে শৈলেন। ওকে দমিয়ে দিয়ে অর্ক বলল, 'এই দাঁড়া। তোর সঙ্গে গোপন কাজটা আগে সেরে নিই। এখন যেন তোর ঘরে কেউ না ঢোকে।'

কাজের কথা শুনে শৈলেন সিরিয়াস। মিনিট দশেক ধরে ওকে অর্ক পুরো ঘটনা গুছিয়ে বলল।

হনুমানের পেট কাটা অবস্থায় পাওয়া নিয়ে... ডাঃ সত্যব্রত সেন পর্যন্ত। সব কথা শুনে শৈলেন বলল, 'আমার কাছেও এই কমপ্লেনটা এসেছে। দাঁড়া, শুয়ারের বাচ্চাকে ধরে এমন ক্যালান ক্যালাব, বাপের নাম ভুলে যাবে। তুই দেখিস, শালা নার্সিংহোমটাকেও তুলে দেব। আমি এখনই ওয়াচারদের পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

অর্ক বলল, ' আমি কিন্তু ডাঃ সেনের সামনে যাব না। বুঝতেই পারছিস, কেন?'

' ঠিক আছে, ঠিক আছে। তুই এখন আমার কোয়ার্টারে চল। তোর চোখমুখ দেখে মনে হচ্ছে, কতকাল ঘুমোসনি।'

ওসি-র ঘর থেকে ওরা বেরোতেই একজন অফিসার এসে শৈলেনকে বলল, 'স্যার, একটা সুখবর আছে।'

'কী খবর মাইতি?'

'লাশগুলো আইডেন্টিফাই করা গেছে। ওদের একজন বড় লিডার, যাকে আপনি এত দিন খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন। কমরেড সানি ওরফে সুনীল চ্যাটার্জি।'

নামটা শুনে অর্ক চমকে উঠল। পরক্ষণেই পেটের ভিতরটা ফাঁকা হয়ে গেল। সুনীল। এটা সুখবর? এই তো কয়েকঘণ্টা আগে জঙ্গলের ভেতর ওর সঙ্গে বসে খিচুড়ি খেতে খেতে সুনীল গল্প করছিল। ছেলেটা এরই মধ্যে মরে গেল? কী হবে, চারতলার মাসিমা-মেসোমশাই যখন এই খবরটা পাবেন? ওঁরা তো জানেনই না, ওঁদের ছেলে মাওবাদী লিডার। সুনীলের চেহারাটা মনে পড়তেই অর্কর মাথাটা কেমন যেন ঘুরে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে দেওয়াল ধরে ও দাঁড়িয়ে পড়ল। কাল সকাল থেকে ওর মনের ওপর দিয়ে যা ঝড় বইছে, শরীরের আর দোষ কী? সুনীলকে কীভাবে ঝাঁঝরা করে দেওয়া হয়েছে, তার বিস্তৃত বিবরণ দিচ্ছিল মাইতি। শুনে অর্কর গা পাক দিয়ে উঠছে। মানুষ এমন নিষ্ঠুর হতে পারে?

ছেলেটা ভিন্ন এক রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাস করত। করতেই পারে। দেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বদলালে, এই সুনীলই হয়তো ভবিষ্যতে নায়কের সম্মান পেত। একটা সময় যাঁরা সরকার বিরোধী আন্দোলন করেছে, ট্রাম বাস পুড়িয়েছে, তাঁরাই তো ভোটে জিতলে পরে হিরো

হয়ে যায়। শৈলেনের ওপর রাগ করতে গিয়েও অর্ক নিজেকে সামলে নিল। বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশন কলেজের ছাত্র। এখন নির্বিচারে মানুষের ওপর গুলি চালাচ্ছে। ওরই বা কী করার আছে? ও যদি গুলি না চালাত, তা হলে হয়তো উল্টো দিক থেকে গুলি এসে ওর বুক ফুটো করে দিত।

থানা চত্বরে শৈলেনের পিছনে হাঁটতে হাঁটতে অর্ক এসে দাঁড়াল কালো ভ্যানের সামনে। লাশগুলো নাকি ভ্যানের ভিতরে রাখা আছে। সুনীলের মৃতদেহ নিজের চোখে দেখবে না বলে অর্ক বাজারের দিকে তাকিয়ে রইল। মাইতির সঙ্গে কথা বলছে শৈলেন। ও একটু দোমনায়, কমরেড সানিকে মেরে ফেলার খবরটা ফ্ল্যাশ করবে কী না তা নিয়ে। মাইতি বলল, 'স্যার, আপনি বলেন তো, ওর লাশটা জঙ্গলের ভেতর পুঁতে দিই। খবরটা ওদের অন্য ক্যাম্পে গেলে কিন্তু মারাত্মক রিটালিয়েশন হবে।'

শৈলেন কী বলে তা শোনার জন্য উদগ্রীব অর্ক। ও বলল, 'একটু ভাবতে দাও মাইতি। বেলা ন'টা থেকেই রিপোর্টাররা আসতে শুরু করবে। কেউ যেন ওদের কিছু না বলে। যা বলার, আমি বলব।'

ওসি-র কোয়ার্টারে নিয়ে গিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল শৈলেন, 'স্বপ্না, দেখ কাকে ধরে এনেছি। অর্ক স্যান্যাল, বিরাট রিপোর্টার, বুঝলে। কলেজে আমরা একসঙ্গে পড়তাম। কাল যার কথা তোমাকে বলাছলাম।'

স্বপ্না হাতজোড় করে নমস্কার করল, 'আসুন, আসুন। কাল সারাদিন তো টিভি-তে আপনাকে নিয়েই খবর শুনেছি। কোন একটা চ্যানেল তো বলেই দিল, একটা ডেড বডি পাওয়া গেছে। সন্দেহ করা হচ্ছে সেটা অর্ক স্যানালের।'

শুনে অর্ক চমকে উঠে বলল, 'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ, টিভিতে আপনার বান্ধবীর ছবিও তো দেখাল। খবরটা

শোনার পরই উনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন।'

তারপরই স্বপ্না মুখ ঘুরিয়ে শৈলেনকে জিজ্ঞেস করল, ' হ্যাঁ গো, জঙ্গলে তোমাদের অপারেশন কী রকম হল? ওদের কোনও ট্রেস পেলে?'

শৈলেন বলল, 'আড়াবাড়িতে ক্যাম্পটা জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছি। সাত আট জন স্পট ডেড। ওদের আইডেন্টিফাই করতে হবে। বাকিরা আরও ডিপ ফরেস্টে পালিয়ে গেছে। যাক গে, তুমি অর্কর জন্য ভালো খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা কর। আমরা দুই বন্ধু ততক্ষণ না হয় আড্ডা মারি।'

সুনীলের জন্য মনটা ভার হয়ে ছিল এতক্ষণ অর্কর। স্বপ্নার কথা শুনে খুব চঞ্চল হয়ে উঠল। শৈলেনকে ও বলল, 'এই টিভি চ্যানেলগুলো কী ইরেসপন্সেবল বল তো। ছি ছি। আমাকে এখুনি একবার কলকাতায় ফোন করতে হবে।'

নিজের মোবাইলটা বের করে অর্ক দেখল, বন্ধ হয়ে গেছে। পরশু বিকেলবেলায় একবার চার্জ দিয়েছিল। সকালে নুরুলের সঙ্গে অতক্ষণ কথা না বললেই ভালো হত। শৈলেনের সেট চেয়ে নিয়ে সাঁঝেলিকে ফোন করল অর্ক। ও প্রান্তে অপরিচিত গলা, ' কে বলছেন?'

'আমি অর্ক। সাঁঝেলির সঙ্গে কথা বলা যাবে।'

গলার স্বর পাল্টে গেল খুশিতে, 'অর্ক! আমি লিলির মা বলছি। তুমি এখন কোথায় বাবা অর্ক?'

'আমি মেদিনীপুরে। শুনলাম, সাঁঝেলি অসুস্থ। কী হয়েছে মাসিমা?'

'নার্ভাস ব্রেকডাউন। দাঁড়াও বাবা, ফোনটা ওকে দিচ্ছি।'

ও প্রান্তে সেট হাতবদল হল। মজা করার জন্যই অর্ক বলল, 'হ্যালো উষালি আমি অর্ক । শুনতে পাচ্ছ?'

কোনও কথা না বলে সাঁঝেলি ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করল

। শুনে অর্কর বুকটা মুচড়ে উঠল। ভালো না বাসলে মানুষ এ রকম কাঁদতে পারে? অফিসের পরিমলদা একদিন বলেছিল, নরম অনুভূতিগুলো

বিসর্জন না দিলে নাকি ভালো রিপোর্টার হওয়া যায় না। কান্না হল মানুষের দুর্বলতা। অর্ক জীবনে কোনও দিন তাই কারও জন্য কাঁদেনি। কিন্তু সাঁঝেলির সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে ওর চোখের কোণও ভিজে উঠল। নিজেকে দ্রুত সামলে নিয়ে ও বলল, 'কাঁদছ কেন সোনা? আমার কিছু হয়নি। শুধু শুধু চিন্তা করছিলে। এই তো, আজ বিকেলের মধ্যেই আমরা কলকাতায় পৌঁছে যাব।'

কান্না থামিয়ে সাঁঝেলি বলল, 'আগে বল, তুমি সোজা আমার কাছে আসবে?'

'আই প্রমিস। উফ, চব্বিশটা ঘণ্টা যা গেল... ভেবেছিলাম, বোধহয় বেঁচে ফিরতে পারব না।'

' মা কিন্তু বলেছিল, তুমি ঠিক... আজ সকালে ফোন করবে।'

'না

' কী করে উনি জানলেন? তোমার বাড়িতে কি সব জানাজানি হয়ে গেছে?'

'বাড়ির সবাই তোমাকে দেখতে চাইছে।'

'ভগবান যা করেন, মঙ্গলের জন্য। কী বল, তাই না?'

'অতশত জানি না। তাড়াতাড়ি ফিরে এস। তোমাকে না-দেখা পর্যন্ত আমি শান্তি পাব না।'

'চুমু নিও সোনা।'

... মোবাইল সেটটা বন্ধ করে , শৈলেনের হাতে ফিরিয়ে দিয়ে অর্ক বলল, 'ফিয়াসের জন্য কয়েকটা বদ্রিকা পাখি আমি নিয়ে যেতে চাই। তুই জোগাড় করে রাখ।'

কাল রাতে মায়ের যখন ফোন পান, তখন প্রোজ্জ্বল লেক গার্ডেন্সে যাওয়ার মতো অবস্থায় নেই। মা বলেছিল, লিলির বয়ফ্রেন্ডকে নাকি মাওবাদীরা ধরে নিয়ে গেছে। খবরটা শুনে লিলি নাকি খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছে। কথাটা শোনার পরই প্রোজ্জ্বল মনে মনে চটে যান । বয়ফ্রেন্ড কিডন্যাপড হয়েছে, তো কী হয়েছে? তার জন্য কেঁদে ভাসাতে হবে? আরে, একটা বয়ফ্রেন্ড গেলে আরেকটা আসবে। তুই কি ফ্যালনা নাকি? তুই প্রোজ্জ্বল মিত্রের বোন। এই কথাটা খেয়াল থাকে না কেন ? তা ছাড়া তুই সুন্দরী, শিক্ষিতা, ভালো গান গাইতে পারিস। তোর কি বয়ফ্রেন্ডের অভাব হতে পারে? বোন, তুই চিরটাকাল ক্যাবলা টাইপের রয়ে গেলি রে।

মায়ের কাছে পরিষ্কার মিথ্যে কথা বলছিলেন প্রোজ্জ্বল, ' মা, আমি এখন মুম্বইয়ে। কাল সকালে ফার্স্ট ফ্লাইটেই ফিরে যাচ্ছি। সোজা বাড়ি চলে যাব।'

সকালে অবশ্য লেক গার্ডেন্সে যেতে হয়নি। মা-ই ফোন করে সকাল সাতটা নাগাদ জানিয়ে দেয়,

মুম্বই থেকে তাড়াহুড়ো করে আসার কোনও দরকার নেই। লিলি ভালো আছে। এক রাত্তিরের মধ্যে বোন কী করে ভালো হয়ে গেল, সেই গল্প মা মোবাইলে বিস্তারে শুনিয়েছে। প্রোজ্জ্বলের তখন মনে হয়েছে, বোনটা আর এ যুগের মানানসই হতে পারল না। অর্ক স্যান্যালের নামটা অবশ্য খুব শোনা শোনা লাগছিল। হ্যাঁ, নামটা প্রথম তিনি শুনেন রথীন সরের কাছে। পরে লিলিও একবার বলেছিল, ওর সঙ্গে অর্ক স্যান্যালের বন্ধুত্ব আছে। কিন্তু সেই বন্ধুত্ব প্রেম পর্যন্ত গড়িয়েছে? সামান্য এক রিপোর্টারের সঙ্গে বোনের প্রেম হয় কী করে, প্রোজ্জ্বল ভেবে পাচ্ছিলেন না। অর্কর হেল্প নিতে বলেছিলেন রথীন সর। এখন অবশ্য তার দরকার নেই। নিজে খুন হয়ে রথীন সর প্রোজ্জ্বলকেও ডুবিয়ে দিয়ে গেছেন।

ধ্বংসের ছাই থেকে প্রোজ্জ্বল এখন উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছেন

pathagar.net

। উদ্যোগপতিদের জীবনে এমন দুর্ঘটনা ঘটেই। এটা মেরামত করে নেওয়া যাবে। কিন্তু একটা হার মন থেকে কিছুতেই মেনে নিতে পারছেন না তিনি। দীপার কাছে হার। এত অল্প সময়ের মধ্যে দীপা যে এত নাম করে ফেলেছে, প্রোজ্জ্বল ভাবতেও পারেননি। কাল রিমিতার পার্টিতে এক ভদ্রলোক হঠাৎ এসে বললেন, ' আমি জাস্টিস বি সি পাল। আপনিই কি অ্যাকট্রেস দীপা মিত্রের হাজব্যান্ড?'

প্রশ্নটা শুনে মাথা গরম হয়ে গেছিল প্রোজ্জ্বলের। হাতে মদের গ্লাস। তিন পেগ হয়ে গেছে। মুখ থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল,' আপনি জাস্টিস বি সি নন, একটা আস্ত বি সি।' অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে প্রোজ্জ্বল বলেছিলেন 'গ্ল্যাড টু মিট ইউ ।'

' আরে মশাই, আপনার স্ত্রীর সিরিয়ালটা রোজ দেখছি। দারুণ অ্যাক্টিং করছেন। ওকে নিয়ে এলেন না কেন পার্টিতে?'

প্রশ্নটা মাথায় ঢুকতে সময় লেগেছিল। বোকার মতো প্রোজ্জ্বল তখন বলে ফেলেন, 'উনি তো এখন মুম্বইয়ে। সিরিয়ালটা আপনার ভালো লাগছে?'

' এক্সিলেন্ট। ভদ্রমহিলার স্ক্রিন প্রেজেন্স এত ভালো, টিভির সামনে আমাদের বসিয়ে রাখেন। স্মৃতি ইরানির পর, এত ভালো আমার কাউকে লাগেনি। আপনি মশাই লাকি, এমন গুণসম্পন্না এক মহিলাকে স্ত্রী হিসাবে পেয়েছেন।'

বুকের ভেতর চিনচিন করছিল কথাগুলো শুনে। জাস্টিস পাল রিমিতার কে হন, প্রোজ্জ্বল জানেন না। তাই ভদ্রতা করে বলেছিলেন, 'থ্যাঙ্ক ইউ। কথাগুলো ওকে জানিয়ে দেব।'

'অফকোর্স বলবেন। আমি তো মশাই ওর ফ্যান হয়ে গেছি। আসুন না, সস্ত্রীক একদিন আমার বাড়িতে। আপনারা এলে খুশি হব।'

প্রোজ্জ্বল বলেছিলেন, ' আসলে দীপা তো কলকাতায় খুব বেশি দিন থাকে না। বুঝতেই পারছেন, কী রকম ব্যস্ত। নিশ্চয়ই আপনার কথা মনে রাখব।' কথাগুলো বলেই তিনি সরে গেছিলেন। জাস্টিস পাল তো আর জানেন না, দীপা উকিলের চিঠি পাঠাচ্ছে। ব্যভিচারের চার্জ আনতে যাচ্ছে ওঁর বিরুদ্ধে। ডিভোর্স চাইছে। প্রোজ্জ্বল মনে মনে প্রার্থনা করলেন, ডিভোর্সের মামলাটা কেস জাস্টিস পালের ঘরে না পড়ে। তা হলে জেতার কোনও সম্ভাবনাই থাকবে না।

বেলা সাড়ে ন'টায় অফিসে ঢুকে প্রোজ্জ্বল ভুলে যেতে চাইলেন দীপার কথা। দশটার পর থেকে অনেকগুলো মিটিং। ব্যবসার কথা ছাড়া এখন অন্য কিছু ভাবা সম্ভব নয়। ঘরে ঢুকে বসতে না বসতেই রিমিতা উঠে এসে বলল, 'স্যার মুম্বাই থেকে আপনার নামে একটা সিলড এনভেলপ এসেছে। কনফিডেন্সিয়াল। এই নিন।'

' খুলে দেখেছ, কী আছে?'

' না খুলিনি। মনে হচ্ছে, সিডি। আপনি খুলুন স্যার। আমি আসি।'

রিমিতা ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর এনভেলপটা ছিঁড়ে প্রোজ্জ্বল দেখলেন, রিমিতার অনুমানই ঠিক। সিডির গায়ে লেখা আছে, 'ফ্রম সুমতি'। লেখাটা দেখেই প্রোজ্জ্বল লাল বাতি জ্বালিয়ে দিলেন। কেউ যেন এখন ডিস্টার্ব না করে। তা হলে তিনি যা আশঙ্কা করেছিলেন, সেটাই ঘটতে যাচ্ছে? সেই রাতে গোপন ক্যামেরায় সঙ্গমের ছবি তুলে রেখে সুমতি এখন ব্ল্যাকমেল করতে চাইছে? মাথায় আগুন জ্বলে উঠল প্রোজ্জ্বলের। সুমতির একটা ব্যবস্থা করতেই হবে। তার আগে অবশ্য দেখে নেওয়া দরকার সিডি-তে ঠিক কী আছে?

pathagar.net

টেবলে রাখ ল্যাপটপ টেনে নিয়ে সিডি চালিয়ে দিলেন প্রোজ্জ্বল। এ কী, ছবি দেখেই ভ্রূ কুঁচকে উঠল প্রোজ্জ্বলের।

বান্দ্রার সেই বাড়িতে নিজের শোয়ার ঘরে ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে ধীরে ধীরে নগ্ন হচ্ছে সুমতি। একটা একটা করে খুলে ফেলছে পোশাক। যৌন কাতরতার ভঙ্গি করছে। ওর শরীরের প্রতিটি খাঁজে লেন্স ঘুরে বেড়াচ্ছে। বিশেষ করে যৌনাঙ্গে। সেদিন রাত্তিরে তো ইন্টারকোর্স করার আগে, এভাবেই অনেকটা সময় ধরে ফোর প্লে করেছিল সুমতি। হ্যাঁ মনে পড়েছে। সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে বিছানা থেকে ও নেমে পড়েছিল। তার পর নাচের ভঙ্গিতে ওর যৌন আবেদন তুলে ধরছিল। কিন্তু এই ছবি কি কেউ আড়াল থেকে তুলছিল? না হলে শরীরের নানা অংশে লেন্স ঘুরে বেড়াবে কী করে? ঘরের সিলিং বা দেওয়ালের কোনও জায়গায় ক্যামেরা ফিট করা থাকলে তো এটা সম্ভব না। বিস্ফারিত চোখে প্রোজ্জ্বল দেখলেন, বিছানা ছেড়ে তিনি উঠে এসে সুমতিকে গভীর আশ্লেষে চুমু খাচ্ছেন।

বাকিটা আর দেখার ইচ্ছে হল না প্রোজ্জ্বলের। ল্যাপটপ বন্ধ করে গুম হয়ে বসে রইলেন। ভাবতে লাগলেন, কী ধরনের ষড়যন্ত্র থাকতে পারে এর পিছনে। চরিত্রহনন তো করেই দিয়েছে দীপা। যদি কখনও ডিভোর্সের মামলা করে, তা হলে সিডি-টা অবশ্যই কাজে লাগবে। এ ছাড়া? ব্যবসার কি কোনও ক্ষতি হতে পারে! কলকাতার অন্য কোনও ডেভেলপারের হাতে যদি এই সিডি যায়, তা হলে কাস্টমারদের তারা ভড়কি দিলেও দিতে পারে। সিডি-টা নষ্ট করে ফেলবেন, না কি গোপন কোনও জায়গায় রেখে দেবেন, তা ঠিক করতে পারলেন না প্রোজ্জ্বল। ল্যাপটপ থেকে বের করে শেষ পর্যন্ত ড্রয়ারের ভেতর ঢুকিয়ে রাখলেন।

ইন্টারকমে রিমিতা জানতে চাইছে, 'স্যার, আশিস ভট্টাচার্য বলে একজন আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল। পাঠিয়ে দেব?'

সঙ্গে সঙ্গে লাল বাতিটা নিভিয়ে দিলেন প্রোজ্জ্বল। তারপর বললেন, 'পাঠিয়ে দাও।' এই লোকটাকে আর কোনও প্রয়োজন নেই। চিড়িয়াখানার প্রোজেক্টটা যখন হচ্ছেই না, তখন ফালতু এই লোকটার পিছনে টাকা ঢেলে লাভটা কী? মনে মনে সিদ্ধান্তটা নিয়েই ফেললেন প্রোজ্জ্বল। লোকটাকে আজ বুঝিয়ে দেবেন, আর কখনও যোগাযোগ করার দরকার নেই। টাকা খোলামকুচি নয়।

হাসি মুখে লোকটা ঘরে ঢুকবে, প্রোজ্জ্বল আশা করেছিলেন। কিন্তু দেখলেন, আশিস ভটচাযের মুখটা ফ্যাকাশে। পরনে সেই সাদা ধুতি আর ফুলহাতা শার্ট। হাতা কনুই অবধি গোটানো। হাতে একটা ফাইল। লোকটাকে বসতে বলার প্রয়োজনও মনে করলেন না প্রোজ্জ্বল। না, কোনও রকম ভদ্রতা করবেন না তিনি। আশিস ভটচায নিজেই চেয়ার টেনে বসে বললেন, ' কেমন আছেন আপনি?'

জিজ্ঞেস করার ধরন দেখে মনে মনে চটলেন প্রোজ্জ্বল। কেমন আছেন মানে? আমার কী হয়েছে যে এই প্রশ্নটা করতে হবে? উত্তরটা না দিয়ে তিনি বললেন, 'তারপর, কী ঠিক করলেন মিঃ ভটচায?'

'ঠিক করবেন তো আপনি। সেদিন যে প্রোপোজালটা দিয়ে গেছিলাম, সেটা নিয়ে কিছু ভেবেছেন নাকি? আমি আর ফলো আপ করতে পারিনি। মাঝে একটু অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম।'

ভদ্রতা করে জানতে চাওয়া উচিত কী হয়েছিল প্রোজ্জ্বল তার ধারে কাছেই গেলেন না। বললেন,

'ওই প্রোপোজালটা নিয়ে ডিসকাস করার আগে, আপনাকে সরাসরি কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই। মানে, বুঝতেই পারছেন, আমার কোম্পানির একটা গুডউইল আছে। আপনাদের সঙ্গে কাজে নামার পর, সেই গুডউইল কোনও কারণে নষ্ট হোক, আমি তা চাই না।'

ভ্রূ কুঁচকেই সোজা হয়ে গেল, চশমার ফাঁক দিয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একবার মুখটা জরিপ করে নিলেন আশিস ভটচায। তারপর শান্ত গলায় বললেন, 'বলুন, কী জানতে চান।'

'কিছু মনে করবেন না। আপনার সম্পর্কে নানা অভিযোগ কানে আসছে, সেই কারণেই জিজ্ঞেস করছি। আপনি নাকি বিরাট একটা খামারবাড়ি করেছেন জনাইতে? আপনার এই অর্গানাইজেশন থেকে টাকা পয়সা সরিয়ে? এটা কি ঠিক?'

শুনে বিষণ্ণ হাসি হাসলেন আশিস ভট্টচার্য। তারপর বললেন, 'ঠিকই শুনেছেন মিঃ মিত্র। জনাইতে

আমি একটা খামারবাড়ি করেছি। আসলে ওটা নারী কল্যাণ সমিতি। প্রায় একশো মহিলা ওই সমিতিতে জড়িয়ে আছেন। স্বনির্ভর প্রকল্পে কিছু না কিছু রোজগার করছেন

। একশোটা পরিবারকে বাঁচিয়ে রেখেছে ওই খামারবাড়ি। উদ্যোগটা ছিল আমার। তবে খামারবাড়িটা আমার নয়। ওটা একটা সমবায় সমিতির। কাগজপত্তর সব দেখতে পারেন ওখানে গিয়ে।'

ধূর্ত মানুষেরা সাজিয়ে গুছিয়ে মিথ্যে কথা বলতে পারে আশিস ভট্টাচার্যের কথা বিশ্বাসই করলেন না প্রোজ্জ্বল। মনোভাবটা বুঝিয়ে দেওয়ার জন্যই বললেন, 'খামারবাড়িটা করলেন কী করে?'

'বলছি। আমার এই অর্গানাইজেশনে একজন ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন, শিবানী দত্ত। তিনিই পুরো সম্পত্তি বিক্রি করে সেই টাকা ঢেলেছিলেন খামারবাড়িতে। আমি টাকা দিতে পারিনি, কিন্তু প্রচুর শ্রম দিয়েছি। ভদ্রমহিলা এখন আর বেঁচে নেই। বেঁচে থাকলে খুশি হতেন। কেননা, খামারবাড়িটা তাঁর নামে। শিবানী দত্ত নারী কল্যাণ সমিতি। একটা পয়সাও আমি কোনওদিন ওই সমিতি থেকে নিইনি। ফর ইওর ইনফর্মেশন মিঃ মিত্র, গতকালই আমি সমস্ত সম্পর্ক চুকিয়ে এসেছি ওই সমিতি থেকে।'

'কেন? ওদের সঙ্গে আর পোষাল না?'

'ঠিক তা নয়। আপনারা কর্পোরেট জগতের মানুষরা এ সব বুঝবেন না। যাই হোক, খোলাখুলি যখন জানতে চাইছেন, তখন জিজ্ঞেস করি, আর কী অভিযোগ আছে আমার বিরুদ্ধে?'

'শিবানী দত্ত নাকি আপনার জন্য সুইসাইড করেছিলেন?' প্রেগনেন্ট হয়ে যাওয়ার কথাটা প্রোজ্জ্বল মুখ ফুটে বলতে পারলেন না।

'ভুল। উনি সুইসাইড করেননি মিঃ মিত্র। উনি খুন হয়েছিলেন। সম্পত্তির লোভে ওঁর এক ভাসুরপো ওঁর গায়ে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিলেন। পুলিশের চার্জশিটে সে কথা লেখা আছে। ওঁর সেই ভাসুরপো এখন লাইফার। আলিপুর জেলের ঘানি টানছে কয়েক বছর ধরে। ভদ্রমহিলার পাশে আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম বলে, ওঁরা আমার সম্পর্কে তখন অনেক কুৎসা রটিয়েছিলেন। যেমন কুৎসা রটিয়েছিলেন দীপিকা সেন বলে এক মহিলা। এন জি ও চালাতেন। আপনাকে তাঁর সম্পর্কে কেউ কিছু বলেনি?'

'না, কিছু শুনিনি।'

'ভদ্রমহিলার স্বামী একজন নামকরা কিডনি স্পেশালিস্ট। কিডনি র‍্যাকেটের সঙ্গে যুক্ত। আমার কাছে ধরা পড়ে গেছিলেন বলে, ওঁরা অনেক কুৎসা রটিয়েছেন আমার নামে। তাতে আমার কিছু যায়-

আসেনি। আমি কিন্তু ন্যায়ের পথ থেকে সরে আসিনি। যাক সে কথা, যে কারণে আজ আপনার কাছে এসেছিলাম তা বলি। মিঃ মিত্র, অনেক লড়াই করে কেয়ার ফর অ্যালিম্যালস আমি দাঁড় করিয়েছি। রিসেন্টলি কেন জানি না, আমার মনে হচ্ছে, শরীরের যা অবস্থা, আমার পক্ষে আর লড়াই সম্ভব না। ভালো কারও হাতে এই অর্গানাইজেশনটা আমি তুলে দিয়ে যেতে চাই। আপনার বোন সাঁঝেলিকে কিছু দিন আগে, আমি ট্রাস্টি কমিটির মেম্বার করে নিয়েছি। ও লেখাপড়া জানা মেয়ে। রিয়েল অ্যানিম্যাল লাভার। আমি চাই, আমার জায়গাটা ও পুরোপুরি নিক।'

কী ধরনের ছল চাতুরি, প্রোজ্জ্বল ঠিক বুঝে উঠতে পারলেন না। বোনকে ফাঁসানোর মতলব, নাকি টাকাপয়সা নিয়ে কেটে পড়ার ইচ্ছে? এ তো ভূতের মুখে রামনাম! গুরুত্ব না দিয়ে, প্রোজ্জ্বল বললেন, 'এ কথাগুলো আমাকে বলছেন কেন আশিসবাবু? বোনকে বলুন। বোন কি রাজি?'

'আমার হাতে আর খুব বেশি সময় নেই প্রোজ্জ্বলবাবু। আজ বিকেলেই আমি মুম্বই চলে যাচ্ছি। কবে ফিরব, বা আদৌ ফিরতে পারব কী না জানি, না।'

তার মানে? আশিস ভটচাযের এই হেঁয়ালির অর্থ বুঝতে পারলেন না প্রোজ্জ্বল। প্রশ্নটা এ বার করেই ফেললেন, 'কেন, আপনার কী হয়েছে?'

'ক্যান্সার। প্যানক্রিয়াসে। বুঝতেই পারছেন কী কঠিন রোগ। মাস তিনেক আগে ধরা পড়েছিল। মনের জোরে কাজকর্ম চালিয়ে যাচ্ছিলাম। কিন্তু ডাক্তাররা বলছেন, টাটা ক্যান্সার হসপিটালে গিয়ে একবার শেষ চেষ্টা করতে। কিন্তু হাসপাতালের জন্তুগুলোর জন্য এত মায়া, সব গুটিয়ে নিয়ে চলে যেতে গিয়েও, পারছি না। আসলে কী জানেন, গোবিন্দপুরে আমার ওই হসপিটালের অনেক কাজ বাকি রয়ে গেছে। এই ফাইলে সে সব প্রোজেক্ট আমি রেডি করে

রেখেছি। আপনি আর সাঁঝেলি মিলে যদি অসমাপ্ত কাজগুলো করে দেন, তা হলে শান্তিতে মরতে পারব আমি।'

কথাগুলো ধীরে ধীরে এমনভাবে বললেন আশিস ভটচায যে, বুকে এসে ধাক্কা মারল প্রোজ্জ্বলের। ছি ছি, এতক্ষণ ধরে তিনি কী অপমানটাই না করলেন ভদ্রলোককে। ধাক্কাটা সামলে তিনি বললেন, 'আপনার এই অসুখের কথা বোন জানে?'

' না, ওকে জানাইনি। জানলে ওর মন ভেঙে যাবে। আমাকে এত শ্রদ্ধা করে। এই নিন, ফাইলটা আপনাকে দিয়ে গেলাম। আচ্ছা, উঠি তা হলে।'

ফাইলটা টেবলের ওপর রেখে আশিস ভটচায উঠে দাঁড়ালেন। তারপর হাতজোড় করে নমস্কার সেরে আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। সে দিকে তাকিয়ে প্রোজ্জ্বলের হঠাৎ মনে হল, রজত গোস্বামী তা হলে ঠিকই বলেছিল, 'তুই অনেক ভুল সিদ্ধান্ত নিবি। তোর অনেক ক্ষতি হয়ে যাবে।'

দরজায় টকটক শব্দ। আশিস ভট্টাচার্য ফিরে এলেন নাকি? প্রোজ্জ্বল 'কাম ইন' বলতেই দরজাটা খুলে ঢুকে পড়লেন, তাঁর কোম্পানির চার পাঁচজন এক্সিকিউটিভ। দু'জন একসঙ্গে বলে উঠলেন, 'স্যার মারাত্মক একটা কাণ্ড ঘটে গেছে।'

একের পর এক খারাপ খবর। দম বন্ধ করে প্রোজ্জ্বল বললেন, 'কী হয়েছে?'

অজয়নগরে আমাদের পূর্বরাগ হাউসিংয়ের একটা বিল্ডিং ভেঙে পড়ে গেছে। প্রচুর ক্যাজুয়ালটি। টিভিতে সব দেখাচ্ছে। ডেড বডি নিয়ে যাচ্ছে। কী হবে স্যার?'

শুনে হঠাৎই বুকের বাঁ দিকে চিনচিনে একটা ব্যথা অনুভব করলেন প্রোজ্জ্বল।

'হ্যারে লিলি, এত বড় একটা কাণ্ড তুই ঘটিয়ে ফেললি, অথচ আমাকে একবারও জানালি না ?' ঘরে ঢুকেই মেসোমণি অভিযোগ করল, 'না, তোর সঙ্গে আমি আর কথাই বলব না।'

মেসোমণিকে দেখে সোফা ছেড়ে উঠে সাঁঝেলি বলল, ' দেখি, আমার সঙ্গে কথা না বলে তুমি থাকতে পার কী না?'

' কী করে তুই প্রেমে পড়লি, গল্পটা এখুনি আমায় বলতে হবে। ছেলেটা কে, কী র'ম দেখতে, কবে দেখা হল, কীভাবে কাছে এল, কে প্রথম ভালোবাসল, ভালোবাসার পর কী হল— সব ডিটেলে শুনে তবে আমি বাড়ি যাব। আজ সকালে তোর মা ফোন করে যখন আমায় খবরটা দিল, তখন তো আমি অবাক। ইস, আর ক'দিন আগে খবরটা দিল না। ক'দিন আগে বিশ্বের সপ্তম আশ্চর্যের কম্পিটিশনটা হয়ে গেল রে। তখন জানলে তোর প্রেমে পড়ার খবরটা কম্পিটিশনে পাঠিয়ে দিতে পারতাম।'

মেসোমণি যখন এ বাড়িতে আসে, তখন এ রকম হইচই করে। সরকারি দফতরে অত বড় অফিসার, অথচ একেবারে ছেলেমানুষের মতো হয়ে যায়। তখন আর বয়সের বাঁধন মানে না। ডিভানের ওপর মেসোমণি জমিয়ে বসেছে। হাসিমুখে ঘরে এসে দাঁড়িয়েছে মাসিমণি। মায়ের তিন বন্ধু আভা মাসি, ইরা মাসি, জবা মাসিও একসঙ্গে হাজির। তিনজনেরই বাড়ি লেক গার্ডেন্সে। এ বাড়ির সুখ-দুঃখে সব সময় পাশে থাকে। তার মানে খুশিতে মা সবাইকে আজ ডেকে এনেছে। এতগুলো লোকের চোখ ওর দিকে।

'কী রে, হাঁ করে তাকিয়ে আছিস কেন?' মাসিমণি তাগাদা দিল, ' মেসোমণি যা জিজ্ঞেস করল, খুলে বল। আমার তো ছেলেটাকে দেখতে ইচ্ছে করছে,তোর মেসোমণিকে বললাম, এখুনি আমায় লেক গার্ডেন্সে নিয়ে চল। তোমায় অফিস যেতে হবে না। হ্যাঁ রে লিলি, কখন আসবে রে সে?'

ভাগ্যিস মায়ের কথামতো সাঁঝেলি স্নান সেরে ফ্রেশ হয়েছিল। সকালে চেহারার যা ছিরি হয়েছিল, তাতে আত্মীয়স্বজনের সামনে বেরোতে পারত না।

ভোরবেলায় অর্কর গলা শোনার পর থেকেও যেন প্রাণ ফিরে পেয়েছে। অর্কর সঙ্গে একান্তে বসার জন্য ও নিজেও এখন ছটফট করছে। কিন্তু বাড়িতে লোকের সংখ্যা ঘণ্টায় ঘণ্টায় বাড়ছে। অর্ক এলে ওকে আলাদা করে পাবে কী না সন্দেহ। বেলা প্রায় সাড়ে এগারোটা। মনে হয়, এখনও অর্করা কলকাতায় ঢোকেনি। মাঝরাস্তা থেকে একটা ফোনও তো করতে পারত? কোনও কাণ্ডজ্ঞান নেই। সাঁঝেলি একবার ভাবল, শিউচরণকে ফোনে ধরবে কী না।

'দিস ইজ আনফেয়ার লিলি, তুই কিন্তু কথা রাখছিস না।' মেসোমণি ছাড়বে বলে মনে হচ্ছে না, 'আমাকে তুই কথা দিয়েছিলি... নো নো, বি আ গুড গার্ল... প্রেমে পড়লে তুই আর কাউকে না জানাস, আমাকে অন্তত জানাবি। ইউ হ্যাভ নট কেপ্ট ইয়োর ওয়ার্ড।'

এতগুলো লোকের সামনে কিছু বলতে সাঁঝেলির অস্বস্তি করছে। কী বলবে ও অর্ক সম্পর্কে? পাশ কাটানোর ও বলল, 'এখুনি এসে পড়বে, তখন দেখ।'

'রিডিকুলাস। দেখব তো বটেই। কিন্তু ব্যাকগ্রাউন্ড স্টোরিটা কে বলবে মামণি। সেটা তো আর ওকে জিজ্ঞেস করতে পারব না। তুই যখন বলতে চাইছিস না, তখন আমাকেই গেস করতে হবে। কী... সেই খেলাটা অ্যাদ্দিন পর আবার তা'লে হয়ে যাক।'

মেসোমণির সঙ্গে সাঁঝেলি আগে একটা খেলা খেলত। গেস... মানে আন্দাজ করার খেলা। বাবা বা দাদার কাছে হয়তো কেউ এল। তার সম্পর্কে আগাম কিছু বলে দেওয়া। সেই খেলায় রোজই ও হেরে যেত মেসোমণির কাছে। খেলাটা মেসোমণি ফের খেলতে চাইছে শুনে সাঁঝেলি বলল, 'ঠিক আছে, আমার কোনও আপত্তি নেই। দেখি, তোমার গেসিং পাওয়ার এখনও ঠিক আছে কি না।'

কয়েক মুহূর্তের জন্য চোখ বুজল মেসোমণি। তারপর চোখ খুলে বলল, 'আমি কিন্তু রেডি। নিয়মটা তোর মনে আছে তো? আমি বলব, তুই হ্যাঁ বা না-তে উত্তর দিবি।'

শ্যামবাজার থেকে সাগ্নিক, পিসেমণি আর পিসিমণিও এসে হাজির। এখন ঘর ভর্তি লোক। শোনপুরি কখন বাড়তি দু'টো চেয়ার এনে দিয়েছে, সাঁঝেলি টেরও পায়নি। সবার চোখ মেসোমণির দিকে। আভা মাসি বলল, 'হ্যাঁ গো সোমনাথ, লিলি যে ঠিকঠাক ঘাড় নাড়বে, তার কী গ্যারান্টি আছে?'

মেসোমণি বলল, ' ছোঁড়া এলে , সেটা পরে মিলিয়ে দেখা হবে।'

ইরা মাসি বলল, 'হ্যাঁ রে লিলি, ভালো করে খোঁজখবর নিয়েছিস তো। রিপোর্টারগুলো কিন্তু নচ্ছার হয়। জান সোমনাথ, আমার এক পিসতুতো বোনের সঙ্গে এক রিপোর্টারের আলাপ হয়েছিল অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসে। দিন কয়েক ঘোরাঘুরি করার পর ওরা ঠিক করে, বিয়ে করবে। কিন্তু ছেলেটা পরে ধরা পড়ে যায়। খোঁজ করে আমরা জানতে পারি, সে বিবাহিত।'

সাঁঝেলি বলল, 'অর্ক সে রকম ছেলেই নয়। বউ তো দূরের কথা, ওর কোনও আপন জনও নেই। ও একাই থাকে গল্ফ গার্ডেন্সে। কতবার আমি ওর বাড়ি গেছি।'

'কী ভয়ানক। ছেলেটা একা থাকে জেনেও তুই অনেকবার ওর বাড়িতে গেছিস?' মেসোমণি বলল, 'ও অ্যালাউ করল কীভাবে? এখন তো ছেলেটার চরিত্র নিয়ে আমার সন্দেহ হচ্ছে। আরে, বিয়ে করার আগে আমিও কলকাতায় ফ্ল্যাটে একা থাকতাম। মাসিমণিকে

তুই জিজ্ঞেস কর, কতবার আমার ফ্ল্যাটে যেতে চেয়েছে, অথচ আমি অ্যালাউ করেছি কী না?'

সবাই হাসছে মেসোমণির কথা শুনে। আভা মাসি বলল, ' সোমনাথ, আমি কিন্তু হাটে হাঁড়ি ভেঙে দেব। তোমরা কী করেছ, আমরা জানি। লিলিকে তোমরা অহেতুক নার্ভাস করে দিচ্ছ।'

মেসোমণি বলল, 'আভাদি, এটা হল প্রেসার ট্যাকটিকস। দেখলে তো, লিলি গড়গড় করে কী রকম বলতে শুরু করেছিল। বিশ্বাস কর, অর্কর কোনও বউটউ নেই।' কথাগুলো বলতে বলতে দরজার দিকে তাকাল মেসোমণি। বাবা ঘরে এসে দাঁড়িয়েছে। ইরা মাসিকে উদ্দেশ্য করে চাপা গলায় মেসোমণি বলল, 'এই রে পেচ্ছাপের ডাক্তার এসে গেছে। এখন আর চ্যাংড়ামি মারা যাবে না।'

শুনে ইরা মাসি হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ল। সে দিকে তাকিয়ে বাবা বলল, 'ঠাকুমা হয়ে গেলে, অথচ ইরা... এখনও তোমার হি হি স্বভাবটা গেল না।'

ইরা মাসি হাসির দমকের মধ্যেই বলতে লাগল, ' তোমার নামে সোমনাথ যা বলল, শুনলে তুমি মারাত্মক রেগে যাবে।'

বাবা পাত্তাই দিল না কথাটা। বলল, 'কী ব্যাপার বল তো লিলি। ছেলেটা তো এখনও এসে পৌঁছল না। তুই একবার ফোন করে দ্যাখ তো মা। আবার কোনও ফ্যাসাদে জড়িয়ে পড়ল কী না?'

শুনে মেসোমণি বলল, 'এই... তোকে ফোন করতে হবে না। নাম্বারটা আমায় দে। টেস্ট করে দেখি, ছেলেটা কেমন স্মার্ট। আমি কথা বলি।'

ঘরোয়া পরিবেশে এই হালকা হাসি ঠাট্টা সাঁঝেলির খুব ভালো লাগছে। কত দিন ও এই পরিবেশ বাড়িতে দেখেনি। আজ যারা

এসেছে, মাঝেমধ্যেই তারা এ বাড়িতে আসে। সাঁঝেলিই এদের মাঝে সময়টা দেয়নি। দেবে কী করে? ও তো গোবিন্দপুর নিয়েই এতদিন ব্যস্ত ছিল। মজা করার জন্যই অর্কর মোবাইল নাম্বারটা ও মেসোমণিকে দিল। ও জানে, মেসোমণি যতই জব্দ করার চেষ্টা করুক না কেন, অর্ক কিন্তু হারবে না। সোফা ছেড়ে উঠে গিয়ে সাঁঝেলি মেসোমণির পাশে গিয়ে বসল।

অর্কর নাম্বারটা মেসোমণি পেয়ে গেছে! স্পিকার অন করে দিয়েছে। যাতে ঘরের সবাই অর্কর কথা শুনতে পায়। ও পাশ থেকে অর্ক বলল, 'হ্যালো, কে বলছেন?'

'এটা কি অর্ক স্যান্যালের নাম্বার?'

'নমস্কার। হ্যাঁ, অর্ক বলছি। আপনি?'

'সি পি আই এম এল মাওয়িস্ট পার্টির লেক গার্ডেন্স ব্র্যাঞ্চ থেকে বলছি। আমার নাম কমরেড সোমনাথ বাসু। শুরুতেই একটা কথা আপনাকে জানিয়ে রাখি, কাজটা কিন্তু আপনি ভালো করেননি!'

'কোত্থেকে বলছেন বললেন? মাওয়িস্ট পার্টির লেক গার্ডেন্স ব্রাঞ্চ? ইমপসিবল। আপনি বোধহয় আমার সঙ্গে মস্করা করছেন।'

জিভ কেটে মেসোমণি নিজেকে শুধরে নিয়ে তারপর বলল, 'আপনি ভুল শুনেছেন অর্কবাবু, আমি বলেছি, লেকগা ডেন্স। অন্ধ্রপ্রদেশে এই জায়গাটার নাম লেকগা। ডেন্স ফরেস্টের মধ্যে। তেলেঙ্গানা

ডিস্ট্রিক্টে। নামটা কখনও শুনেছেন?'

'সরি, শুনিনি। কিন্তু এই যে আপনি বললেন, কাজটা আমি ভালো করিনি। কোন কাজটা?'

'কোন কাজটা? কাল দুপুর থেকে টিভি চ্যানেলগুলো ক্রমাগত বলে যাচ্ছে, আমাদের পার্টির ছেলেরা আপনাকে কিডন্যাপ করেছে। খবরটা তো মিথ্যে। কেন এই খবরটা আপনি রটালেন?'

'প্রথম কথা হল, টিভি চ্যানেলগুলো আমাকে নিয়ে কী খবর টেলিকাস্ট করেছে, সে সম্পর্কে

আমার কোনও ধারণা নেই। দ্বিতীয়ত, নিজেকে বিখ্যাত করার জন্য অর্ক স্যান্যালের গুজব রটানোর প্রয়োজন নেই। অর্ক স্যান্যাল এমনিতেই ফেমাস। আমার তো এখন সন্দেহ হচ্ছে, আপনি লোকটা জেনুইন কী না। কী নাম বললেন যেন আপনার? কমরেড বাসু। বলুন তো, মেদিনীপুরে আপনাদের পার্টির এখন যে লিডার, তার নাম কী? নিশ্চয়ই জানবেন।'

প্রশ্নটা শুনে মেসোমণি বেশ ফাঁপরে পড়েছে। মুখ দেখেই তা বোঝা যাচ্ছে। সাঁঝেলি মুখ চেপে হাসতে শুরু করল। অর্ককে বোকা বানানো অত সোজা? মেসোমণি কী উত্তর দেয়, তা শোনার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠল ও। মেসোমণি কি পিছু হটার পাত্র? পাল্টা বলল, 'ফোনে এ সব নাম বলার নিয়ম নেই আমাদের পার্টিতে। আপনি খবরের কাগজের লোক। আপনাকে বলবই বা কেন?'

'কিন্তু খবরের কাগজের লোক জেনেও আপনাদের লিডার যে আমাকে দু'ঘণ্টা ইন্টারভিউ দিয়েছে। ফিরে গিয়ে নিশ্চয়ই খুলে লিখব। তখনই বুঝতে পারবেন, আমি কেন কিডন্যাপড হয়েছিলাম? আর আমি সত্যি বলছি, না মিথ্যে?'

'আপনাকে কিন্তু আমি ওয়ার্নিং দিচ্ছি অর্কবাবু ছেলেমানুষি করবেন না। আমাদের নিয়ে লেখালেখি করতে যাবেন না। তা হলে আমাদের হিট লিস্টে আপনার নামটা তুলতে আমরা বাধ্য হব।'

'পরোয়া করি না। অর্ক স্যান্যাল কাউকে ভয় করে না। ডু হোয়াটএভার ইউ লাইক।'

[illegible] ওয়ার্নিং দিচ্ছি।

আপনি যদি আমাদের পার্টি সম্পর্কে একটা বাজে কথাও লেখেন, তা হলে সাঁঝেলি মিত্রকে আমরা কিডন্যাপড করতে বাধ্য হব। আপনি কি তা চান?'

ও প্রান্তে অর্ক কয়েক সেকেন্ডের জন্য চুপ। তার পর বলল,

'সাঁঝেলি মিত্রকে আপনারা চেনেন?'

মেসোমণি যেন বাগে পেয়েছে অর্ককে। বলল, 'চিনব না কেন ? আপনাদের মতো প্রত্যেক রিপোর্টারের ঠিকুজি কুষ্ঠি আমাদের কাছে আছে। সাঁঝেলি মিত্রর সঙ্গে আপনি যে প্রেমের অভিনয় করে যাচ্ছেন, সব আমরা জানি। আপনি যে ম্যারেড, তাও আমাদের জানা।'

ও প্রান্তে হো হো করে হাসল অর্ক, 'ইন্টারেস্টিং। ভেরি ইন্টারেস্টিং। মিস্টার বাসু, আপনি যে-ই হোন, মাওবাদী নন। অন্ধ্রপ্রদেশে বসে কলকাতার মোবাইল নাম্বার মারফত আমি জেনে নিতে পারব, আপনি কে ? আর মিনিট পনেরোর মধ্যে কলকাতায় পৌঁছচ্ছি। আশা করি এর মধ্যে, সাঁঝেলি মিত্রকে নিশ্চয়ই কিডন্যাপ করবেন না। আচ্ছা, ছাড়ি তা হলে। আমার ফোনে দেড় দিন চার্জ দেওয়া হয়নি। ভবানীভবনে ফোন করার আগে যেন ব্যাটারি না ফুরিয়ে যায়?'

ফোনটা কেটে দিল অর্ক। পকেট থেকে রুমাল বের করল মুখ মুছল মেসোমণি। তারপর বলল, 'কী শার্প ছেলেরে বাবা। লিলি মামণি আমার, এই ছেলে তো তোকে আঙুলের ওপর নাচাবে রে। দেখিস, হ্যান্ডেল করতে পারবি তো? এ ছোঁড়া কিন্তু পেঙ্গুইন নয়। একেবারে ক্যাঙারু, লাফিয়ে লাফিয়ে এগোয়। বুদ্ধি অবশ্য শেয়ালের মতো।'

বাবা বলল, 'বুঝলে সোমনাথ, ছেলেটা যে কাগজে চাকরি করে, তার মালিক আমার পেশেন্ট। জয়দেব গঙ্গোপাধ্যায়। মাস ছয়েক আগে ভদ্রলোকের কিডনি ট্রান্সপ্ল্যান্ট করেছিলাম। একটু আগে

তাকে ফোন করলাম। কী বললেন জান? ব্রিলিয়ান্ট ছেলে। ওঁর কাছে খবর আছে, ছেলেটা নাকি খুব শিগগির চাকরি ছেড়ে দিচ্ছে। মাস ছয়েক আগে ইন্টারভিউ দিয়েছিল বিবিসি-তে। সেই চাকরিটা পেয়ে গেছে। বিবিসি-র ওরা নাকি অফিসে খোঁজ নিয়েছিল। তাই জয়দেববাবুরা জানতে পেরেছেন।'

শুনে সাঁঝেলির বুকটা ধক করে উঠল। কী বলছে বাবা? অর্ক বিবিসি-তে যাচ্ছে? এত দিন ওর সঙ্গে এত কথা হয়েছে, কই অর্ক তো কোনওদিন বলেনি, বিবিসি-তে ইন্টারভিউ দিয়েছে? ওর মনের খুশির বেলুনটা কে

যেন হঠাৎই ফুটো করে দিল। চমকে উঠে ও বাবার দিকে তাকাল।

মেসোমণি জিজ্ঞেস করল, 'চাকরিটা কোথায় করতে হবে দাদা? এখানে না, লন্ডনে?'

'লন্ডনে। ওদের বাংলা ডিভিশনে। চার বছরের কন্ট্রাক্ট। লিলি, তুই জানিস তো সব?'

মুখ না তুলেই ঘাড় নাড়ল সাঁঝেলি, জানে। এ ছাড়া ও কী -ই বা করতে পারে? অতগুলো লোকের সামনে ও যদি না বলত, তা হলে কি ওর মুখ থাকত? এই সময় মেসোমণি বলল, 'এত বড় খবরটা তুই চেপে রেখেছিলিস মামণি! উফ, তুই কী রে?'

আভা মাসি বলল, 'আমরা তাই বলাবলি করছিলাম, ছেলেটার মধ্যে কী এমন দেখল লিলি? এখন বুঝতে পারছি, মেয়ে অনেক হিসেব করেই এগিয়েছে।

ইরা মাসি বলল, ' তোরা লন্ডনে গেলে ফি বছর আমরা কিন্তু একবার যাব রে লিলি। তখন যেন চিনতে পারিস মা।'

বাবা বলল, ' তা হলে বিয়েটা এপ্রিলেই ফিক্স করে ফেলি, কী বল সোমনাথ?'

মা বলল, 'দাঁড়াও, তোমার উঠল বাই তো কটক যাই। এত তাড়াতাড়ির মধ্যে সব অ্যারেঞ্জ করতে পারবে? আগে তোমার ছেলের মতামতটা নাও

। আমার বাবা একটাই মেয়ে। বিয়েটা ঘটা করে দিতে

হবে।'

একেকজন একেক রকম বলে যাচ্ছে। মাথা নিচু করে সব শুনছে সাঁঝেলি। অর্কর ওপর এ বার ওর রাগই হচ্ছে। বিবিসি-তে ও চাকরির চেষ্টা করছে, ভালো কথা। কিন্তু সেই কথাটা বাবার মুখে শুনতে হবে কেন? নন্দিনী একদিন বলেছিল, 'অর্ককে এখনও তুই চিনিস না পিপি। ওর পেট থেকে একটাও কথাও তুই বের করতে পারবি না। ও যদি মনে করে, কোনও একটা কথা বলবে না, ওর পেটে বোমা মেরেও সেই কথা তুই বের করতে পারবি না।'

তা হলে তো নন্দিনীই ঠিক। যে ছেলে মন খুলে কথা বলে না, প্রেমিকার কাছে অর্ধেক কথা গোপন রাখে, বিয়ে হলে তার সঙ্গে সারাটা জীবন কাটাবে কী করে সাঁঝেলি? হঠাৎই ওর মনে হল, ও যে নেভাডা ইউনিভার্সিটিতে স্কলারশিপের জন্য অ্যাপ্লাই করেছে, সেটা কি অর্ককে কখনও বলেছে? বলেনি। কিন্তু এই কথাটা যদি অর্ক অন্য কারও কাছে শোনে, তা হলে কী মনে করবে? ভাবার সঙ্গে সঙ্গে সাঁঝেলির মনটা নরম হতে শুরু করল। ইস, মিছিমিছি বেচারির ওপর রাগ করছিল ও।

ডিভানের ওপর রাখা মোবাইলটা বাজছে। তা হলে কি অর্ক? সাঁঝেলি তাড়াতাড়ি সুইচ অন করতেই রিমিতার গলা শুনতে পেল, 'সাঁঝেলি ম্যাডাম বলছেন? আমি রিমিতা, মিত্র কনস্ট্রাকসন থেকে। আপনাদের লাইনটা অনেকক্ষণ চেষ্টা করছি। পাচ্ছিলাম না। ম্যাডাম, একটা বিপদ হয়ে গেছে।'

স্পিকার অন করাই আছে। সবাই রিমিতার গলা শুনতে পাচ্ছে। ঘরের সবাই উৎসুক হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে। সাঁঝেলি বলল, 'কী বিপদ হয়েছে রিমিতা?'

'ম্যাডাম, প্রোজ্জ্বল স্যারকে পুলিশ ইন্টারোগেশনের জন্য ভবানী ভবনে নিয়ে গেছে।'

লেক গার্ডেন্সে সাঁঝেলির বাড়িতে অর্ক যখন পৌঁছল তখন সন্ধে প্রায়

ছ'টা। সঙ্গে শিউচরণ না থাকলে বাড়িটাও চিনতেই পারত না। শিউচরণ আসতে চাইছিল না। কিন্তু শালবনি থেকে রওনা হওয়ার সময় শৈলেন একটা খাঁচায় গোটা পাঁচেক বদ্রিকা পাখি গাড়িতে তুলে দিয়েছিল। সেগুলো সাঁঝেলির জন্য। শিউচরণের হাতে সেই খাঁচা ঝুলছে। ডোর বেল বাজাতেই একজন কাজের মেয়ে এসে বলল, ' কেউ নেই। দুপুরবেলায় সবাই বেইরে গেছে। কেউ এখনও ফেরেনি।'

সারাটা দিন এমন ধকল গেছে অর্কর আর একদণ্ডও দাঁড়াতে ইচ্ছে করছিল না। কোথায় গেছে জিজ্ঞেস করায় মেয়েটা বলল, 'পুলু দাদাবাবুর কী যেন হয়েছে।'

এই পুলু দাদাবাবুটা কে, অর্ক বুঝতে পারল না। নামটা ও কোনওদিন সাঁঝেলির কাছে শোনেনি। শিউচরণকে ও বলল, ' তোমার সাঁঝেলি ম্যাডামকে আমি ফোন করে দিচ্ছি। খাঁচাটা রেখে তুমি বাড়ি চলে যাও। তোমার স্ত্রী কিন্তু চিন্তা করছেন।'

দু'দিন চান করা হয়নি। গা ঘামে চটচট করছে। শার্টটাও ময়লা হয়ে গেছে। ফোনে নেহাত সাঁঝেলিকে ও কথা দিয়েছিল, সোজা লেক গার্ডেন্সে আসবে। তাই আসতে হয়েছে। সাঁঝেলির বাড়ির লোকজন এই চেহারায় ওকে দেখে নিশ্চয়ই মুখ ভার করতেন। কাজের মেয়েটার হাতে খাঁচাটা দিয়ে অর্ক বলল, ' তোমার নাম তো শোনপুরি, তাই না? এই পাখিগুলো তোমার দিদিমণির জন্য। রেখে দাও। এর মধ্যে তোমার দিদিমণি ফিরে এলে বল অর্ক দাদাবাবু বাড়িতে আছে।'

শিউচরণের সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে অর্ক বড় রাস্তায় এল। গলফ্ গার্ডেন্স এমন কিছু দূর নয়। ও হেঁটেই চলে যেতে পারে। তবুও অর্ক একটা সাইকেল রিকশায় চেপে বসল। গোটা আনোয়ার শা রোড আলোয় ঝলমল করছে। আড়াবাড়ির সেই গভীর জঙ্গলের কথা মনে হতেই অর্কর শরীরটা শক্ত হয়ে গেল। আর একটু পরেই ও নিশ্চিন্ত মনে হাউসিং কমপ্লেক্সে

ওর একতলার ফ্ল্যাটে ঢুকে যাবে। কিন্তু সুনীল? ও তো আর কোনও দিনই ফিরবে না। ওর মৃত্যু সংবাদটা কি শৈলেন শেষ পর্যন্ত রিপোর্টারদের দিয়েছে? চারতলার মাসিমা মেসোমশাই কি জানতে পেরেছেন ভয়ানক খবরটা? সকাল থেকে টিভির পর্দায় চোখ রাখার সুযোগ অর্ক পায়নি। প্রায় সারাটা দিনই ওকে কাটাতে হয়েছে ভবানী ভবনে।

বেলা সাড়ে এগারোটার সময় কলকাতায় পৌঁছতেই, ভবানী ভবন থেকে ওকে ফোনে ডেকে পাঠান আই জি সুরেশ বাজপাই। ভবানী ভবনে অন্তত তিন দফায় ওকে খুঁটিনাটি বলতে হয়েছে, আড়াবাড়ি জঙ্গলে কী দেখেছে। পুলিশ একই কথা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করেছে। অর্ক সব কথাই বলেছে, সুনীলের ইন্টারভিউ নেওয়ার কথাটা ছাড়া। ওটা এক্সক্লুসিভ। কেন দেবে ও পুলিশকে?

রিকশাটা হাউসিং কমপ্লেক্সের ভেতর ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে অর্ক টের পেল, সুনীলের কথা কারও অজানা নেই। ওর বাড়ির নীচে ছোটখাটো ভিড়। ওপর থেকে কান্নার আওয়াজ ভেসে আসছে। মাসিমা-মেসোমশাইয়ের কথা ভেবে ওর বুকটা মুচড়ে উঠল। ও রিকশা থেকে নামতেই ছুটে এসে বুবাই বলল, 'অর্কদা, চ্যাটার্জি মেসো আপনাকে একবার ওপরে যেতে বলেছেন।'

অর্ক বলল, 'আমাকে মাফ কর বুবাই। যেতে পারব না। আমার দাঁড়ানোর শক্তি নেই।'

ফ্ল্যাটে ঢোকার সময় অর্ক দেখতে পেল, দরজার পাশে লেটার বক্সে কয়েকটা চিঠি এসেছে। প্রতিদিন চিঠিগুলো নিয়ে ও ঘরে ঢোকে। আজ লেটার বক্স খুলতেই ইচ্ছে করল না ওর। প্রায় টলতে

টলতেই ও ফ্ল্যাটের ভেতর ঢুকে এল। ঘরে লাইট জ্বালিয়ে, কোনও রকমে সোফায় এসে বসল। হঠাৎই গা ম্যাজ ম্যাজ করছে। এ সি চালালে ঠাণ্ডা লেগে যেতে পারে। সেই কারণে পাখাটা ফুল স্পিডে চালিয়ে দিল অর্ক। সাঁঝেলিকে একবার ফোন করা দরকার। কিন্তু ল্যান্ড লাইনটা বিছানার কাছে। উঠে গিয়ে ফোন করার ইচ্ছেটাও ওর হল না। ও টিভি চালিয়ে দিল।

চ্যানেল সার্ফ করতে করতে পর্দায় ও সত্যব্রত সেনের ছবি দেখতে পেল। সঙ্গে ভয়েস ওভার, 'হনুমানের কিডনি পাচারের অভিযোগে দক্ষিণ কলকাতার এক নামী নার্সিংহোমের চিকিৎসক গ্রেফতার।' সত্যব্রতবাবুকে পুলিশের ভ্যান থেকে নামানো হচ্ছে। উনি মুখে রুমাল চাপা দিয়ে রয়েছেন। কোন কোর্ট এটা? মনে হয়, মেদিনীপুর কোর্ট। শৈলেন কিন্তু বলেছিল, সত্যব্রত সেনকে আজই ভবানী ভবনে পাঠিয়ে দেবে। পর্দায় শৈলেনের ছবি। চন্দ্রকোণা রোডের এক নার্সিংহোম থেকে কীভাবে ওরা সত্যব্রত সেনকে হাতে নাতে ধরেছে, তার রোমহর্ষক বিবরণ শৈলেন দিচ্ছে।

'সকাল সাতটার সময় আমরা নার্সিংহোমে রেড করি। তখন অপারেশনের তোড়জোড় চলছিল। টেবলের ওপর শোয়ানো ছিল একটা হনুমান। পুলিশ দেখে সত্যব্রত সেন পিছনের গেট দিয়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। সেখানে একটা জিপসি গাড়ি রাখা ছিল। তখনই ওকে আমরা অ্যারেস্ট করি। কলকাতার এক ভেট সার্জেনকেও আমরা অ্যারেস্ট করেছি।' অর্ক দেখল, নার্সিংহোমের বাইরে প্রচুর লোক বিক্ষোভ জানাচ্ছে। এরা নিশ্চয়ই নুরুলের দলবল। পুলিশ একবার লাঠিচার্জও করল লোকগুলোকে সরানোর জন্য। বোধহয় মুখে মুখে রটে গেছে সত্যব্রতবাবুর কুকীর্তির কথা। তাই লোকজন ক্ষিপ্ত। স্থানীয় মানুষদের দু'একজনের বাইটও শোনাল টিভি-তে।

টিভি চ্যানেল এমন ভাবে খবরটা দেখাচ্ছে, যেন

সত্যব্রতবাবু জঘন্য অপরাধ করছেন। সত্যিই কি তাই? অর্কর মনে এ নিয়ে দ্বিধা আছে। আজ ভবানী ভবন থেকে ফেরার সময় ও যখন গাড়িতে উঠছে, সেই সময় হঠাৎ ওর সঙ্গে দেখা হয়ে যায় দীপঙ্কর দাশগুপ্তের। দীপিকাদির পিসতুতো ভাই, সেই সি বি আই অফিসার। দীপঙ্করবাবুকে দেখেই ও দাঁড়িয়ে যায়, 'কী ব্যাপার আপনি এখানে?'

'আপনার হনুমান রহস্য উদ্ধার করতে।' দীপঙ্করবাবু বললেন, 'ভালোই হল, আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। বেঁচে ফিরেছেন শেষ পর্যন্ত। এ দিকে শুনেছেন তো সব। বুঝতেই পারছেন, কী এমব্যারাসিং সিচুয়েশনে পড়েছি আমি।'

অর্ক বলেছিল, ' সি বি আই কি এই কেসটা ইনভেস্টিগেট করছে?'

' না। সি বি আই নয়। গভর্নমেন্টের একটা আলাদা ডিপার্টমেনটি আছে,যারা বন্যজন্তু চোরাশিকার সংক্রান্ত অপরাধগুলো দেখাশুনা করে। এই ডিপার্টমেন্টের নাম হচ্ছে, ওয়াইল্ডলাইফ ক্রাইম ব্যুরো। প্রাইম মিনিস্টারের উদ্যোগে এই ব্যুরো চালু হয়েছে বছর দুয়েক আগে। আপনাকে বলিনি, সিবিআই থেকে আমাকে সেই ব্যুরোতে ট্রান্সফার করা হয়েছে। সেই কারণেই কলকাতায় এসেছি। কিছুদিন আগে আমরা ফুট শিকিং বর্ডারে জয়া গাঁ বলে একটা জায়গা থেকে একজন পোচার- কাম ট্রেডারকে অ্যারেস্ট করেছি। তার নাম রতিরাম শর্মা। এই লোকটা নেপাল দিয়ে ট্র্যাফিকিং করত। দিল্লির কুখ্যাত পোচার সংসার চাঁদের মতো ভয়ানক এই লোকটার নেটওয়ার্ক। এর পুরো পরিবার ইনভলভড। ব্যুরো থেকে বেশ কিছুদিনের জন্য আমাকে এই রিজিয়নে থাকতে বলা হয়েছে। আর আমার কী কপাল দেখুন, ফার্স্ট কেসটাতেই আমার এক রিলেটিভ জড়িয়ে গেল।'

অর্ক বলল, 'সত্যব্রতবাবুর মতো একজন রিনাউড সার্জেন এ রকম

একটা র‍্যাকেটে থাকতে পারেন, ভাবা যায় না। তাই না?'

কথাটা শুনে যেন একটু দমে গেলেন দীপঙ্করবাবু। তার পর বললেন, 'আপনি ভুল ভাবছেন অর্ক। টাকাপয়সা রোজগারের জন্য কিন্তু সত্যদা এ কাজটা করতেন না। একটা রিসার্চের সঙ্গে উনি যুক্ত। সারা পৃথিবীর পাঁচজন ডাক্তার মিলে এই রিসার্চটা করছেন। সত্যদার ল্যাপটপ সিজ করে আমি নিয়ে এসেছি। সেটা খুলে এমন অনেক তথ্য পেলাম, যা অবিশ্বাস্য।'

'কী নিয়ে রিসার্চ করছিলেন ডাঃ সেন?'

' জেনেট্রান্সপ্ল্যান্টেশন নিয়ে রিসার্চ। এ ব্যাপারটা নিয়ে খবর করছেন যখন, তখন ধরেই নেব আপনার সামান্য আইডিয়া আছে।'

'হ্যাঁ খানিকটা আছে। আপনি বলুন।'

ট্রান্সপ্ল্যান্টেশনের মলিক্যুলার রিসার্চ এখন যে লেভেলে গেছে, তা আমরা ভাবতেও পারি না। ট্রান্সপ্ল্যান্ট করে ফরেন কিছু কোষ যখন কোনও প্রাণীর শরীরে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়, তখন তার শরীরের কিছু কোষ সেটা জানতে পেরে যায়। প্রশ্ন হচ্ছে, এটা তার জানতে পারছে কী করে? জানতে পারছে এই কারণে যে, এই কোষগুলোর মধ্যে হাজার হাজার রিসেপটর আছে। এই রিসেপটরগুলোর যদি কেমিকেল কোয়ান্টিফিকেশন না করা যায়, তা হলে ওই রিসেপটরকে ব্লক করতে পারে, এমন ওষুধ আবিষ্কার করা সম্ভব না। হয়তো ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপি দরকার অথবা সার্টেন হায়ার মাইক্রোনলজি কোনও টেকনিক। সে ক্ষেত্রে জীবিত কিডনির দরকার

নেই। আবার পচে যাওয়া কিডনিও চলবে না। কিন্তু যে কিডনিকে কুড়ি পঁচিশ ঘণ্টা ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছে, তার রিজনবেল টিসুস রিসার্চের কাজে লেগে যেতে পারে। জাপানে একটা ওষুধ কোম্পানির হয়ে সত্যদারা এই রিসার্চটাই করছে। ওই রিসেপটরকে ব্লক করতে পারে, এমন সলিউশনই ওঁরা আবিস্কার করতে চান।'

'হনুমানের কিডনি উনি তা হলে মানুষের শরীরে ট্রান্সপ্ল্যান্ট করার কাজে লাগাচ্ছেন না।'

'সার্টেনলি নট। জাপানের কোম্পানিটার নাম আমি সত্যদার ল্যাপটপে পেয়েছি— নাকাতা ইন্টারন্যাশনাল। সল্ট লেকে ওরা একটা সার্জিকাল ল্যাবও বানিয়ে নিয়েছে। সত্যদারা হনুমানের কিডনি শুয়োরের দেহে বসানোর এক্সপেরিমেন্ট করেছেন। হনুমানের কিডনি এখানে সত্যদার কাজে তো লাগছেই, তার ওপর একজন এজেন্টের মাধ্যমে কিছু কিডনি চলে যাচ্ছে জাপানেও। এই এজেন্টটি হল রতিরাম শর্মার ভাই যুগলপ্রসাদ শর্মা। ওই হল আসল পোচার। যে অপারেট করে মেদিনীপুর অঞ্চলে। সত্যদার ল্যাপটপ থেকে এই যুগলপ্রসাদের নামটা আমি পেয়েছি।'

'তা হলে এই যুগলপ্রসাদই আসল কালপ্রিট?'

'হ্যাঁ। এই লোকটাই ফোনে আপনাকে থ্রেট কল দিয়েছিল। এবং দীপিকাদিকেও। কারণ ও জানত না, দীপিকাদি সত্যদার স্ত্রী। এই যুগলপ্রসাদই নয়াগ্রামের সেই ছেলেটাকে মার্ডার করিয়েছিল, যে জিপসি গাড়ি দেখে ফেলেছিল গুড়গুড়িপালের জঙ্গলে।'

'একটা জিনিস বুঝতে পারছি না। সত্যব্রতবাবু নিজে কেন শালবনিতে গেলেন? না গেলে তো ধরাছোঁয়ার বাইরে থাকতে পারতেন।'

'গিয়ে বোকামি করেছেন। ওখানে ফিজিক্যালি প্রেজেন্ট থাকা ওঁর উচিত হয়নি। আসলে কী জানেন, যা শুনলাম, তাতে মনে হল, কিডনি বের করে আনার পর, সেগুলো হাইপোথেরামাইজ কবা দরকার হয়। অর্থাৎ ঘুম পাড়িয়ে রাখার কাজ। হয়তো সেটা করার জন্যই সত্যদা ওখানে গিয়েছিল।'

'সত্যব্রতবাবুর সঙ্গে আপনার কি কোনও কথা হয়েছে?'

'হ্যাঁ, ফোনে কথা হয়েছে। উনি তে বললেন, এই এক্সপেরিমেন্টের জন্য গভর্নমেন্টের কাছে পারমিশনও নিয়েছেন। সত্যি কি মিথ্যে, জানি না।'

অর্ক বলেছিল, 'যদি পারমিশন নিয়ে থাকেন, তা হলে তো বেআইনি কিছু করেননি?'

'আই হোপ সো। আমার অবশ্য মনে হয়, রেসাস মাঙ্কির বডি পার্টস কেটে এক্সপেরিমেন্ট করার পারমিশন হয়তো পাননি। আসলে ল্যাব-এর ভেতরে কী হচ্ছিল, তা জানা মুশকিল। ব্যাপারটা কী জানেন, সত্যদার মতো লোকগুলো জিনিয়াস। এঁরা আইন-কানুনের ধার ধারেন না। এঁরা নতুন কিছু আবিষ্কারের নেশায় মশগুল থাকেন। এঁরা যদি সাকসেসফুল হন, তা হলে হয়তো বড় কোনও অ্যাওয়ার্ডও পেয়ে যেতে পারেন। তখন আপনি কী বলবেন?'

'সত্যব্রতবাবু এখন কোথায়?'

' জেল কাস্টোডিতে

। কাল ওঁকে কলকাতায় নিয়ে আসতে বলেছি। খুব বদনাম হয়ে গেল সত্যদার। কাগজের লোকেরা তো এত কিছু জানে না। অর্ধেক বুঝেই হয়তো অনেক কিছু লিখে দেবে। আচ্ছা,

চলি। এখন দীপিকাদির বাড়িতে একবার যেতে হবে। বুঝতেই পারছেন, ওর মনের অবস্থাটা কী?'

দীপঙ্করবাবুর শেষ কথাগুলোই অর্ককে এখন ভাবাচ্ছে। একটা প্রশ্নই ওর মনে নাড়াচাড়া করতে লাগল, হনুমানের কিডনি রহস্য শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে দাঁড়াল? মানুষের কল্যাণে যদি সত্যব্রতবাবুরা জীবহত্যা করেই থাকেন, তা হলে কী এমন গর্হিত কাজ উনি করেছেন? খাওয়া বা শৌখিন জিনিস

বানানোর জন্য মানুষ প্রাণী হত্যা করে না? হনুমানের কিডনি রহস্য নিয়ে আর ভাবার কি কোনও দরকার আছে? মনে হয়, নেই। এই সিদ্ধান্তটা নিয়ে, অর্ক বাথরুমে যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়াল।

পোশাক খুলে, বাথরুমে ঢুকে, ও শাওয়ারের নীচে এসে দাঁড়াল। ঠাণ্ডা জল মাথার ওপর থেকে নেমে আসছে। জলের তোড়ে প্রশ্নের জটগুলো যেন আস্তে আস্তে খুলতে লাগল। স্নায়ুগুলো ফের একটু একটু করে সতেজ হচ্ছে। চোখ বন্ধ করে অর্ক প্রাণশক্তি ফিরে পাওয়ার প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগল। ও জানে, একটু পরেই চারতলা থেকে মাসিমা অথবা মেসোমশাইয়ের মধ্যে কেউ না কেউ একজন একতলায় নেমে আসবেন। সুনীলের কথা জানতে চাইবেন। কী উত্তর দেবে তখন অর্ক? পুত্রহারা মা-বাবার মুখোমুখি হওয়ার জন্য গাটস্ দরকার। অর্ক সেই সাহস আর শক্তিটাই সঞ্চয় করতে চাইছে। গত পরশু মারুতি থেকে নামিয়ে সুনীলের একটা ছেলে ওর দিকে রাইফেল তাক করেছিল। গুলি চালিয়ে দিলে আজ আর ওকে ফিরে আসতে হত না। কই, তখন তো ও ভয় পায়নি? তা হলে আজ কেন ও এত বিচলিত হয়ে পড়েছে? স্নান করতে করতে অর্ক আরও বোঝার চেষ্টা করল, সুনীল কেন আত্মাহুতি দিল?

হঠাৎই অর্কর মনে হল, সাংবাদিক জীবনে এমন কঠিন সময় আর

কখনও আসেনি। এত বড় ঝুঁকি নেওয়া ওর উচিতই হয়নি। হনুমানের পেট কাটা রহস্যটা ও উদ্ধার করেছে বটে, কিন্তু তাতে ওর কী লাভ? স্টোরিটা ও যখন দিব্যদাকে দেবে, তখন হাজার কৈফিয়ত ওকে দিতে হবে। অনেকেই বিশ্বাস করবে না, সত্যি সত্যিই ও একজন মাওবাদী নেতার ইন্টারভিউ নিয়েছে। এক পয়সা মাইনেও ওর বাড়বে না। অফিসে যখন অ্যাসেসমেন্ট হবে, সেই সময় যাবতীয় সুবিধে নিয়ে যাবে দিব্যদার পেটোয়া

সাংবাদিকরা। আর জীবন লাভ করে খবর এনেও, ওর মতো রিপোর্টাররা বসে বসে কলা চুষবে। শাওয়ারের নীচে দাঁড়িয়ে অর্ক ভাবতে লাগল, এই পেশায় ও আর থাকবে কী না।

স্নান সেরে ঘরে ঢুকে, একটা পাজামা-পাঞ্জাবি গলিয়ে দেওয়ার পরই, হঠাৎ ওর শরীরটা কেমন যেন করে উঠল। মারাত্মক ঠাণ্ডা লাগছে। ঠকঠক করে ও কাঁপতে শুরু করল। একটা ব্ল্যাঙ্কেটের খোঁজে ও ডিভানের দিকে তাকাল। তখনই ওর চোখে পড়ল, দাদু দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। হাসি হাসি মুখ, পরনে ওর মতোই সাদা পাজামা আর পাঞ্জাবি। দাদু সেই একই রকম আছে। চোখের সামনে দাদুকে দেখে ও চমকে উঠল। এ কী, দাদু তো বহু দিন হল মারা গেছে। আবার ফিরে এল কী করে?

প্রশ্নটা ওর মুখ থেকে বেরোবার আগেই দাদু বলল, 'তুই ভাবছিস, আমি আবার কোত্থেকে এলাম রে, তাই না? আমি কিন্তু সব সময় তোর সঙ্গে সঙ্গেই আছি বাবু সোনা।'

ঠাণ্ডায় কাঁপতে কাঁপতে অর্ক কোনও রকমে প্রশ্ন করল, 'দাদু, তুমি

ভালো আছ?

'খুব ভালো আছি রে। আমার জন্য তুই একদম চিন্তা করবি না। তোর খবর কী, সেটা বল।' কথাগুলো বলে দাদু সোফায় এসে বসল। তার পরে গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল।

অর্ক বলল, 'আমি ভালো নেই দাদু। বোকার মত বিরাট একটা ঝুঁকি নিয়ে ফেলেছিলাম। প্রাণে বেঁচে এসেছি।'

'আমি সব জানি। তোকে কিছু বলতে হবে না বাবু সোনা, খুব ভালো কাজ করেছিস। নিরীহ পশুগুলোকে অন্তত বাঁচাতে চেয়েছিস। তুই জানিস না বাবু সোনা, তোর এক পূর্বপুরুষ তোকে এখন দু'হাত তুলে আশীর্বাদ জানাচ্ছেন স্বর্গ থেকে। তিনিও খুব নামী মানুষ। পশুপ্রেমী ছিলেন। তাঁর রক্ত যে তোর শরীরে বইছে বাবা।'

'তুমি কার কথা বলছ দাদু? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।'

' সে কী রে, তোর কি কিছুই মনে নেই? মনে করে দ্যাখ তো, খুব ছোট্টবেলায় তোর ঠাকুর্দার হাত ধরে তুই একবার চিড়িয়াখানার উল্টোদিকে একটা অডিটোরিয়মে গিয়েছিলি । সেদিন সেই অডিটোরিয়াম যাঁর নামে করা হয়েছিল, সেই রামব্রহ্ম সান্যাল তো তোর পূর্বপুরুষ রে। সারাটা জীবন উনি উৎসর্গ করেছেন পশুপাখির কল্যাণে। তুই যখন জন্মাস, তখন তোর দিদা হাসপাতালে তোকে দেখে এসে বলেছিল, রামব্রহ্ম সান্যালই নাকি আবার জন্ম নিয়েছেন তোর মায়ের পেটে। তোকে জন্ম দিয়েই তোর মা মারা গেল। তার পর তোর বাবাও মোটর অ্যাক্সিডেন্টে মাথায় চোট পেয়ে আমাদের ছেড়ে চলে গেল। তোকে দেখাশুনোর কেউ নেই। তখন ঠাকুর্দার কাছ থেকে আমি আর তোর দিদা তোকে চেয়ে নিয়ে এলাম।'

'এ সব কথা তুমি তো আমায় কখনও বলনি দাদু?'

' কী হত বলে? শুধু শুধু তুই কষ্ট পেতিস। পরম্পরা বলে একটা কথা আছে, জানিস বাবু সোনা। আমি তোকে মানুষ করেছি বটে, কিন্তু অ্যাট দ্য এন্ড অব দ্য ডে... তুই কিন্তু তোদের পরম্পরা কনটিনিউ করার জন্যই জন্মেছিস। পশুপাখিদের কল্যাণে যদি কিছু করতে পারিস, করিস। তোর সব খবর কিন্তু আমি রাখি। আমার খুব ভালো লাগছে এটা দেখে যে, জীবনসঙ্গিনী হিসাবে তুই যাকে বেছে নিয়েছিস, সে রামব্রহ্ম সান্যালের বংশে কুলবধূ হবার উপযুক্ত।'

'সাঁঝেলির কথা তা হলে তুমি জান?'

'সব জানি। খুব ভালো মেয়ে। শোন, খুব শিগগির বিয়েটা সেরে ফেলিস বাবা। কী রে, আমার কথা মনে থাকবে তো।' কথাগুলো বলেই দাদু উঠে দাঁড়াল। তার পর দরজার ছিটকিনি খুলে বাইরে বেরিয়ে গেল।

দরজাটা হাট করে খোলা। বাইরে নিকষ কালো অন্ধকার যেন গিলতে আসছে। দাদু হঠাৎ চলে গেল কেন, সেটা বুঝে ওঠার আগেই অর্ক শুনতে পেল, কে যেন ডোর বেল বাজাচ্ছে। একবার, দু'বার... তিন বার। নিশ্চয়ই ওপর তলার মেসোমশাই মাসিমা। কোনও মতে, সোফা থেকে উঠে। দরজা খুলে অর্ক দেখল, না মাসিমারা নয়, দরজার গোড়ায় সাঁঝেলি। ওর সঙ্গে রয়েছেন মাঝবয়সী এক ভদ্রলোক আর ভদ্রমহিলা। সাঁঝেলির পরনে নীল রঙের সালোয়ার কামিজ। ওকে আশ্চর্য সুন্দর লাগছে। ঘোরের মাঝেই সাঁঝেলিকে ও বলল, 'ইস, আর একটু আগে যদি আসতে, দাদুর সঙ্গে তোমার দেখা হয়ে যেত। দাদু এই মাত্র বেরিয়ে গেল।'

দ্রুত পায়ে ঘরের ভেতর ঢুকে এল সাঁঝেলি। বলল, 'দাদু এসেছিলেন? কী বলছ তুমি অর্ক? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি

না। তোমার দাদু তো অনেকদিন আগে মারা গেছেন।' ওর গলা আর কপালে হাত দিয়ে চমকে উঠে ফের সাঁঝেলি বলল, 'এ কী, জ্বরে যে তোমার গা পুড়ে যাচ্ছে।'

৩৪

সকাল থেকেই মনটা ভার হয়ে আছে সাঁঝেলির। অথচ তা হওয়ার কথা নয়। নার্সিংহোম থেকে অর্ককে আজ ছেড়ে দেবে। কাল বিকেলেই কথাটা বলে দিয়েছিলেন ডাঃ ত্রিপাঠী। খবরটা ওকে খুশি করার পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু তারপরই যে প্রশ্নটা ওঠে, সেটা হল, অর্ক থাকবে কোথায়? ডাঃ ত্রিপাঠী বলেছেন, এখনও দিন সাতেক ওকে যত্নে রাখা দরকার। অর্ককে ওর ফ্ল্যাটে নিয়ে যাওয়ার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। ওখানে ওকে দেখাশুনো করার কেউ নেই? রমলার ওপর ভরসা করার থেকে অর্ককে নার্সিংহোমে রেখে দেওয়া অনেক ভালো। তাই সাঁঝেলি চেয়েছিল, ওদের বাড়িতে নিয়ে যেতে। মা আর বাবার কোনও আপত্তি ছিল না। কিন্তু অর্ক তাতে রাজি হয়নি। কার রাতে সবার সামনে ও বলে দিয়েছে, অসম্ভব।

দিন দশেক আগে অর্ককে নার্সিংহোমে ভর্তি করেছিল সাঁঝেলি। অর্কর গায়ে তখন প্রবল জ্বর। ভুলভাল বকছে। রক্ত পরীক্ষার পর আবিষ্কার হয়, ওর মেনেনজাইটিস হয়েছে। আড়াবাড়ির জঙ্গলে মশার কামড় যে ওর এই হাল করবে, সাঁঝেলি তা ভাবতেও পারেনি। এই ক'টা দিন নিজের নাওয়া

খাওয়া ভুলে ও স্রেফ নার্সিংহোমে পড়েছিল। ও অবশ্য একা নয়, নার্সিংহোমে সারাদিনই ওদের কেউ না কেউ হাজির থেকেছে। সকালের দিকে দেশপ্রিয় পার্কে একহাত টেনিস খেলে প্রায়ই অর্ককে দেখতে এসেছে দাদা। ওর সঙ্গে গল্প করে তারপর অফিসে গিয়েছে। তারপর আসত বাবা, চেম্বারে যাওয়ার আগে। বিকেলের দিকে মা আসে আভা মাসিদের নিয়ে। সাঁঝেলি লক্ষ করেছে সেই সময়টা সব থেকে ভালো কাটে অর্কর। প্রায়ই দিন মাসিরা এটা সেটা করে আনে। বেচারা অর্ক, মায়ের ভালোবাসা

কোনওদিন পায়নি। মা আর আভা মাসিরা চারজন মিলে সেটা একসঙ্গে পুষিয়ে দিচ্ছে। এই তো সেদিন ইরা মাসি বলেই ফেলল মাকে, 'প্রণতি, এই রকম একটা ছেলে যদি আমাকে ভগবান দিত, সত্যি তা হলে খুব ভালো হত রে। ছেলেটাকে দেখলেই ভালোবাসতে ইচ্ছে করে।'

মা বলেছিল, 'এতটা বলিস না ভাই। নজর লেগে যাবে।'

পিছন থেকে মায়েদের কথা শুনে ফেলেছিল সাঁঝেলি। গর্বে বুকটা ভরে উঠেছিল। আড়চোখে ও তখন অর্কর দিকে তাকিয়েছিল। মিটিমিটি হাসছে। 'ভালোবাসতে ইচ্ছে করে, না... ছাই'। ইরা মাসিরা তো আর জানে না, কী চিজ্। জানলে ও কথাটা আর বলত না। অর্ককে ওরা যতটুকু দেখেছে, তা নার্সিংহোমের এই বেডে। এখানে তো ওকে সুবোধ বালক মনে হবেই। সেদিন রাতে জ্বরের ঘোরে অর্ক যা বলতে আরম্ভ করেছিল, ভাগ্যিস মা আর মাসিমা শোনেনি। শুনলে লজ্জার শেষ থাকত না। ওর সম্পর্কে একটা বিশ্রী ধারণা করত। অর্কর সঙ্গে ওর শারীরিক সম্পর্ক হয়েছে। জ্বরের ঘোরে সেদিন ও মেসোমণি আর মাসিমণির সামনে সে সব কথা যদি পুরো উগরে দিত, তা হলে? নার্সিংহোমে নিয়ে যাওয়ার আগে অর্ক সবে বলতে শুরু করেছিল, 'আলোটা নিভিয়ে দিয়ে আমার পাশে এসে বস না সোনা। সেদিনকার মতো তোমাকে একটু আদর করি। জান, কাল আড়াবাড়ির জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসার সময়ই আমি বুঝতে পারলাম, তোমাকে ছাড়া বাঁচব না।' সাঁঝেলি তখন ওর মুখে হাত চাপা দিয়ে ওকে কোনওরকমে থামায়। মেসোমণি আর মাসিমণির কাছ থেকে সাঁঝেলি এখন পালিয়ে বেড়াচ্ছে। সব কথা ওর স্পষ্ট মনে আছে। ছি ছি, জ্বরের ঘোরে অর্ক যা ইচ্ছে তাই বলে যাচ্ছিল। সাঁঝেলি তখন

বলেছিল, 'চুপ কর অর্ক, প্লিজ চুপ কর।'

' কেন চুপ করব সোনা ? দাদু আমায় কী বলে গেল, জান ? তোমাকেই যেন লাইফ পার্টনার করি। উইল ইউ ম্যারি মি সোনা?'

বলতে বলতে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল অর্ক। ওর মাথাটা কোলে তুলে নিয়ে সাঁঝেলি তখন আতঙ্কে চেঁচিয়ে উঠেছিল ' মেসোমণি, তুমি শিগগির ডাক্তার চৌধুরীকে ফোন কর।'

সেদিন রাত্তিরে হঠাৎ যদি অর্কর বাড়িতে গিয়ে হাজির না হত, তা হলে হয়তো অবস্থা আরও জটিল হতে পারত। সঙ্গে সঙ্গে ট্রিটমেন্ট শুরু হওয়ায়, এ যাত্রায় অর্ক বেঁচে গেছে। জ্বর অর্কর শরীরটা খুব দুর্বল করে দিয়েছে। কয়েকটা দিন যত্ন নিলে অবশ্য ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু সাঁঝেলির আসল দুশ্চিন্তাটা এখন অন্য কারণে। দশ বারো দিন আগে ওর পিরিয়ড হওয়ার কথা। হয়নি। ঋতুমতী হওয়ার পর থেকে এমনটা কখনও হয়নি। একটা অজানা আশঙ্কা ওকে কুরে কুরে খাচ্ছে। গায়নোকোলজিস্ট বন্ধু জয়ন্তীর কাছে ও গিয়েছিল। ইউরিন টেস্ট করতে বলেছে। কাউকে এখন আর ওর ভালো লাগছে না। এমন কী টুকি টাকিকেও না। ইদানীং ওদের ভার ও শোনপুরির ওপর ছেড়ে দিয়েছে। ওরা কেমন আছে, খোঁজ নেওয়ার সময়ই পায় না সাঁঝেলি। কাল রাতে শোনপুরি একবার বলে গেল, টুকি টাকি নাকি খাওয়া দাওয়া করছে না। আশ্চর্য, খবরটা শুনে ওর মনে কোনও রেখাপাতই

করল না।

দুশ্চিন্তার শুরু অবশ্য অর্ককে দেখতে বুবাই নার্সিংহোমে আসার পর থেকে। সেদিন কথায় কথায় ও বলেছিল, 'অর্কদা, আপনার লেটার বক্সে বেশ কিছু চিঠি পড়ে আছে। আমি কি নিয়ে আসব?'

অর্ক বলেছিল, 'নিয়ে এস।'

পরদিন বিকেলে বুবাই একগাদা চিঠি নিয়ে এল। তার মধ্যে একটা চিঠি বিবিসি-র। অর্ককে ওরা স্কলারশিপ দিতে রাজি। সেই সময় নার্সিংহোমে মা আর আভা মাসিরা বসে। শুনে ওরা লাফিয়ে ওঠে।

pathagar.net

তারপর থেকে সবাই মিলে অর্ককে উৎসাহ দিচ্ছে, বিলেত চলে যাও। স্কলারশিপটা অবশ্য চার বছরের জন্য। তারপর ওকে ফিরে আসতে হবে। কিন্তু এই চিঠিটাই সব জট পাকিয়ে দিয়েছে। বাড়িতে এখন রোজ আলোচনা হচ্ছে। সবাই অর্কর দিকটাই ভাবছে। বাড়ির জামাই বিলেতে থাকে, এটা গর্ব করে বলার মতো বিষয়। তাই বোধহয় কেউ সাঁঝেলির মতামতটা জানতে চাইছে না। যেন ধরেই নিয়েছে, ওর কোনও আপত্তি নেই। অনেক ভেবেচিন্তে সাঁঝেলি সিদ্ধান্ত নিয়েছে, অর্ক লন্ডন যেতে চায় যাক, ও যাবে না। ও কেয়ার ফর অ্যানিম্যালস নিয়ে জীবন কাটাবে।

কাল রাতে সাঁঝেলি অনেক ভেবে চিন্তে মুম্বইয়ের হাসপাতালে ফোন করেছিল আশিসদার সঙ্গে কথা বলার জন্য। গলা শুনেই মনে হচ্ছিল লোকটা ভালো নেই। অনেক কষ্টে, থেমে থেমে আশিসদা কথা বলছিল। বারবারই বলছিল, 'কলকাতায় আর ফিরে যেতে পারব কী না, জানি না। তুমি আমার অর্গানাইজেশনটাকে দেখ। তুমি কথা না দিলে, আমি নিশ্চিন্তে মরতেও পারব না।'

শুনে মনটা খুব খারাপ হয়ে গেছিল সাঁঝেলির। আশিসদা মরার কথা বলছে কেন ? মুম্বই যাওয়ার আগে দাদার কাছে কয়েকটা ফাইল রেখে গেছে আশিসদা। ভেবেছে, সেগুলোয় ও চোখ বুলিয়েছে। কথাগুলো সেই ভাবেই বলছিল। আসলে পুলিশের ঝামেলায় দাদার জড়িয়ে যাওয়া, অর্কর অসুখ— সব মিলে অ্যাদ্দিন একটা বিতিকিচ্ছিরি অবস্থা চলছিল। তাই ফাইলগুলো দাদার কাছ থেকে চেয়ে নিতে পারেনি সাঁঝেলি। সে কথা তো আর আশিসদাকে বলা যায় না। তাই হ্যাঁ, না করে সাঁঝেলি এমনভাবে । দিয়েছে, যাতে আশিসদা কিছু বুঝতে না

পারে। টাটা হসপিটালের ডাক্তাররা কী বলেছেন, সে সব শুনতে আরও সময় চলে গেল। শেষে নিজের সমস্যাটার কথা আর জানাতেই ইচ্ছে করল না সাঁঝেলির। ওর মন ভালো থাকবে কী করে?

বেডে আধশোয়া হয়ে খবরের কাগজে মন দিয়েছে অর্ক। কেউ এসে পড়ার আগে ওকে ব্রেকফাস্ট করিয়ে দেওয়া দরকার। প্লেট নিয়ে সাঁঝেলি যখন বেডের দিকে এগোচ্ছে, সেই সময় ওর কানে এল, 'গুড মর্নিং বোন, আজ অর্ক কেমন আছে রে?

মুখ ফিরিয়ে দাদাকে দেখতে পেল সাঁঝেলি। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে। পরনে পুমার টি শার্ট, সাদা শর্টস। হাতে টেনিস র‍্যাকেট। দেখে খুব ভালো লাগল ওর। বলল, 'ভালো আছে। মনে হচ্ছে, আজ রিলিজ করে দেবে।'

'গুড, ভেরি গুড।' খুশি খুশি মুখে দাদা ভেতরে ঢুকে এল।

চেয়ার টেনে অর্কর বেডের কাছে এসে বসল। তারপর বলল, 'ভালোই হল, বুঝলে অর্ক। আজ তোমার ছুটি হয়ে গেলে, চল আমাদের লেক গার্ডেন্সের বাড়িতে যাই। সবাই মিলে সারাটা দিন চুটিয়ে আড্ডা মারি। কী, আইডিয়াটা কী রকম বল তো?'

সাঁঝেলি বলল, 'দাদা, তোমার অফিস?'

' নিকুচি করেছে অফিসের। পয়সা দিয়ে এত লোক রেখেছি কী জন্যে? ডে টু ডে ব্যবসা চালানোর চিন্তাটা ওরাই করুক। আমি অত টেনশন নেব কেন? জান অর্কভাই, পুলিশের ঝামেলাটার পর থেকে আমি লোকটা না... বদলে গেছি।

এখন আমার জীবনের মন্ত্র কী জান? মুন্নাভাই সিনেমার সঞ্জয় দত্তের মতো। টেনশন লেনে কা নেহি, টেনশন দেনে কা। ক্যারাক্টরটা আমার এত ভালো লেগেছিল, মুন্নাভাইয়ের

দু'টো ছবি আমি বার দশেক করে দেখেছি।' বলেই দাদা হা হা করে হাসতে শুরু করল।

অর্ক বলল, 'দাদা, আপনি ব্যস্ত লোক, তা সত্ত্বেও সিনেমা দেখার সময় পান কী করে।?'

'আমি আজ থেকে সিনেমা দেখছি নাকি? কলেজ লাইফে তো আমি সিনেমার পোকা ছিলাম। শুনলে তুমি অবাক হবে, আমি ছিলাম শত্রুঘ্ন সিনহার ফ্যান। ইয়েস, অমিতাভ বচ্চন বা রাজেশ খান্নার নয়। শত্রুঘ্ন সিনহার কোনও ছবি বাদ দিতাম না। আরে দীপা... মানে তোমার বউদির সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ হয়েছিল কোথায় জানো? দিল্লিতে শত্রুঘ্নর ছবি দেখতে গিয়ে। সে অদ্ভুত এক গল্প, শুনলে তুমি অবাক হয়ে যাবে।' কথাগুলো বলে নিজেকেহঠাৎ সামলাল দাদা। তারপর বলল, 'যাক সে সব কথা, আমার পরমপূজ্য বাবাকে দেখছি না যে? এখনও আসেনি বুঝি। কেন বল তো? প্রায় ন'টা বাজতে চলল। এত দেরি তো করে না।'

সত্যিই, বাবা এত দেরি করে না। রোজ ন'টার মধ্যে চলে আসে। এসেই ডাঃ ত্রিবেদীর সঙ্গে দেখা করে। মাঝে মাঝে বাবার সঙ্গে দাদার দেখাও হয়ে যায়। তখন দু'জনে কথা বলে। বাপ-ছেলের মধ্যে আগেকার মতো সেই টেনশন আর নেই। অর্কর অসুখ বাবা আর দাদার সম্পর্কটাই শুধু ভালো করে দেয়নি, ওদের পুরো পরিবারটাকেই ফের আগের মতো জুড়ে দিয়েছে। আজ বাবার সঙ্গে বোধহয় কোনও দরকার আছে দাদার। সেই কারণেই বাবার কথা জিজ্ঞেস করছে। সাঁঝেলি অবশ্য জানে, বাবার কেন দেরি হচ্ছে। কাল বিকেলে দীপা বউদি কলকাতায় এসেছে। কোন একটা হিন্দি সিরিয়ালের প্রোমোশন করার জন্য। উঠেছে পার্ক হোটেলে। সকালবেলায় লেক গার্ডেন্সে যাওয়ার কথা ছিল। গেছে কী না, সাঁঝেলি জানে না। বউদিকে নিয়ে একটু পরেই বাবার নার্সিংহোমে আসার কথা। বউদি ফোন করে নাকি দেখতে চেয়েছে অর্ককে। এ সব কথা দাদা জানে না। সাঁঝেলি তাই বলল, 'একটু ওয়েট কর। বাবা আসবে।'

'বাবার জন্য আজকাল খুব চিন্তা হচ্ছে জানিস বোন। চেহারাটা কী হয়েছে, ইদানীং লক্ষ করেছিস? আমি তো সেদিন বললাম, তোমাকে আর ডাক্তারি করতে হবে না। সারা জীবন অনেক খেটেছ। এ বার রেস্ট নাও।'

দাদার মুখে এ সব কথা শুনতে খুব ভালো লাগছে সাঁঝেলির। ভূতের মুখে রামনাম বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু দাদা তো আর আগের মতো রাফ অ্যান্ড টাফ নেই। অনেক বদলে গেছে। তর্কের খাতিরে তবুও ও বলল 'তুমি ভাবলে কী করে দাদা, বাবা চুপচাপ বসে থাকবে। পেশেন্টরা থাকতে দেবে?'

'তুই চুপ কর তো বোন। দেবে না কেন শুনি? ছেলে হিসাবে আমি তো এটা চাইতেই পারি।' বলেই দাদা অর্কর দিকে মুখ ঘোরাল। তারপর বলল, 'জান অর্কভাই, আমার এই বোনটা না... এক নম্বরের হাঁদা। বড্ড সাধাসিধে। শেষে কোন ছেলের পাল্লায় পড়বে, এ নিয়ে আমি আর মা খুব চিন্তায় ছিলাম অ্যাদ্দিন। তোমাকে দেখার পর থেকে অবশ্য আমাদের সেই চিন্তাটা গেছে। তোমাকে একটাই রিকোয়েস্ট ভাই, কনজুগাল লাইফ যদি ভালো কাটাতে চাও, তা হলে একটু ধৈর্যশীল হয়ো। আমার এই ভোলেভালা বোনটাকে অবহেলা কর না। আমি এই ভুলটাই করেছি। তাই এখন রিপেন্ট করছি।'

কথাগুলো শুনে দাদার দিকে চমকে তাকাল সাঁঝেলি। বলছেটা কী ? বউদিকে অবহেলা করার জন্য দাদা এখন অনুতাপ করছে। বউদি কি জানে সে কথা ? জানলে কি নরম হবে ? পুলিশ দাদাকে অ্যারেস্ট করেছে, এই খবরটা সোনার পর মুম্বই থেকে বউদি অবশ্য একবার ফোন করেছিল। বাবার কাছে জানতে চেয়েছিল, পুলিশ কতটা দাদাকে জড়াবে। সেই সময় বউদি নাকি একবার কেঁদে ফেলেছিল ফোনে। পরে বাবা কথাটা মাকে বলেছিল এইভাবে, 'তোমরা দীপা মায়ের যত দোষই দাও না কেন, আমি কিন্তু ওর কোনও খুঁত খুঁজে পাই না।' প্রচুর টাকাপয়সা খাইয়ে দাদা বাড়ি ধসে পড়ার কেসটাতে আপাতত ধামাচাপা দিয়েছে। কিন্তু দাদার ভেতরে যেটা একেবারে ধসে গেছে, সেটা হল মনের জোর। সাঁঝেলি সেটা বুঝতে পারছে।

অর্ক জিজ্ঞেস করল, 'দাদা, বউদির সঙ্গে সম্পর্কটা আবার মেরামত করা যায় না ?'

দাদা করুণ মুখে বলল, 'কেন মেরামত করা যাবে না ? আসলে কী জানা, পেশায় সফল হওয়ার জন্য আমি বাইরে এত সময় দিয়েছি, ঘরের মানুষটার দিকে একদম নজর দিইনি। এখন মনে হচ্ছে, ঠিক করিনি। ভাই, তুমি কিন্তু এই ভুলটা কর না। সাংবাদিকতা করছ কর, আমার বে'নটার দিকেও তাকিও। সেইসঙ্গে এমন একটা কিছু কর, যাতে দু'জনেরই আগ্রহ আছে। আগে যদি আমি এটা বুঝতে পারতাম, তা হলে আমার কনজুগাল লাইফটা এ রকম বরবাদ হয়ে যেত না।'

'বুঝতে পারেননি কেন ?'

'ফালতু ইগো। আমার অনেক টাকা। দীপা চেয়েছিল, কলকাতাতেই একটা প্রোডাকসন হাউস খুলবে। নিয়মিত সিরিয়াল আর মুভি প্রোডিউস করবে। টাকাটা তখন ওকে দিলে ভালো করতাম। একটা কাজ নিয়ে ও ব্যস্ত থাকত। সেইসঙ্গে নিজের অভিনয় করার শখটাও মেটাতে পারত। তখন আমার কী জেদ চাপল, টাকাটা ওকে দিলাম না। দোষ আমারই।'

শুনে সাঁঝেলি বলল, 'দাদা, এ সব কথা এখন থাক না।'

'থাকবে কেন রে বোন ? অর্কভাইয়ের কাছে লুকিয়ে কোনও লাভ আছে ? আর ক'দিন পর ও তো আমাদের ফ্যামিলিরই একজন হতে

যাচ্ছে। এই রে দ্যাখ, একটা কথা বলতে তোকে ভুলে গেছি। কারমারকার আজ সকালে ফোন করেছিল মুম্বই থেকে। কাল আশিসবাবুর অপারেশন।'

'জানি। আমার সঙ্গে আশিসদার কথা হয়েছে।'

'ফিরে এসে মনে হয় না, আশিসবাবু আর গোবিন্দপুরে যেতে পারবেন। অর্কভাই, তোমরা দু'জন মিলে ওর অর্গানাইজেশনটাকে ধর। টাকাপয়সার কথা ভেবো না। আমি তোমাদের পাশে থাকব, কথা দিচ্ছি।'

কথাগুলো বলতে বলতেই খবরের কাগজটা টেনে নিল দাদা। [illegible] লাইনগুলোতে চোখ বোলাতে লাগল। তারপর হঠাৎই একটা সময় বলল 'মাই গড। শেষ পর্যন্ত [illegible] লাখানাটা ভগবানপুরেই হচ্ছে।

[illegible], রথীন সর বেঁচে থাকলে কী খুশিই না হতেন।'

অর্ক বলল, 'এতে এত আশ্চর্য হচ্ছেন কেন দাদা। এ তো আগে থেকেই ঠিক ছিল। চিফ মিনিস্টারের এক রিলেটিভ ওই প্রোজেক্টের সঙ্গে জড়িয়ে। আপনি জানতেন না, ওরই উদ্যোগে তো ভগবানপুরে ইকো বায়োলজিক্যাল পার্কটা হচ্ছে?'

'না জানতাম না। ইস, তোমার সঙ্গে আগে পরিচয় হলে, আমার খুব সুবিধে হত। রথীনবাবু একবার বলেছিলেন বটে, তোমার সাহায্য নিতে। তা হলে আলিপুরের জায়গাটার কী হবে বল তো?'

'জানি। তাজ বেঙ্গল যারা বানিয়েছে, তারাই ওই জমিটা পাবে। সবাই জানে।'

'ইস, আমি কী রকম বোকা দেখ। ফালতু বারো তেরো লাখ টাকা গচ্চা দিলাম।' কথাগুলো বলেই দাদা ফের খবরের কাগজে মন দিল

। আর তখনই দরজার দিকে তাকিয়ে সাঁঝেলি দেখল, বউদি কেবিনে ঢুকছে। হাতে অর্কিডের বোকে। হাসি হাসি মুখে ঢুকছিল। কিন্তু দাদাকে দেখার পরই মুখটা কঠিন করে ফেলল। দাদাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে, বেডের কাছে এসে অর্কিডের বোকে এগিয়ে দিয়ে বউদি বলল, 'গুড মর্নিং অর্ক। দিস ইজ ফর ইয়োর কুইক রিকভারি।'

অর্ক বলল, 'থ্যাঙ্ক ইউ বউদি। ইট'স নাইস টু সি ইউ।'

সাঁঝেলি সত্যিই অবাক। ও বলল, 'বুঝলে কী করে তুমি? বউদিকে আগে তো কখনও দেখনি?'

'সাংবাদিকদের যে আলাদা একটা ইনটুইশন পাওয়ার থাকে, তুমি তো জানই সাঁঝেলি।'

দাদা চেয়ার ছেড়ে উঠে কখন জানলার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছে, সাঁঝেলি তা লক্ষ্য করেনি। ও বলল, 'বউদি, তোমার সঙ্গে বাবা আসেনি?'

খালি চেয়ারটায় বসে বউদি বলল, ' এসেছেন। উনিই তো আমাকে নিয়ে এলেন। তারপর লিলি, আই মাস্ট সে, ইই হ্যাভ রিয়েলি গুড চয়েস। অর্কভাই, তোমার কথা ফোনে লিলি আমাকে অনেক আগেই বলেছিল। তোমাকে দেখার খুব ইচ্ছে ছিল। কপালে ছিল, তাই দেখা হয়ে গেল।'

সাঁঝেলি বলল, ' কেন, আমরা মুম্বই গেলেও কি তোমার দেখা পাব না?'

'পুজোর আগে তো প্রশ্নই নেই। হাতে প্রচুর কাজ। নেক্সট উইকে একতা কাপুরের সিরিয়ালে শুটিং করার জন্য সুইজারল্যান্ড যাচ্ছি। প্রায় পাঁচ সপ্তাহের সিডিউল।' কথাগুলো বলতে বলতেই হাত ঘড়ির দিকে তাকাল বউদি, তারপর বলল, 'এই রে, আর বসা যাবে না গো। সাড়ে এগারোটায় হোটেলে আমাকে রেডি থাকতে হবে। একের পর এক ইন্টারভিউ, রিপোর্টাররা সব আসবে। আমি চলি।'

সাঁঝেলি বলল, 'এই তো এলে, এত তাড়াতাড়ি চলে যাবে? আর একটু বস না বউদি। কার সঙ্গে যাবে? বাবা কি তোমাকে দিয়ে আসবে?'

'একটা ট্যাক্সি নিয়ে চলে যাব। তুই ভাবিস না।'

' না তা হয় না।' এই সময় ঘরে ঢুকে বাবা হুকুমের সুরে বলল, ' তোমায় আমি একা ছেড়ে দিতে পারব না মা। পুলু তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসবে। সঙ্গে কেউ না থাকলে তুমি মবড্ হয়ে যাবে।'

বউদি বলল, 'আপনি কী বলছেন, বাবা ভেবে বলছেন?'

'প্লিজ বউমা, তুমি না কর না। সঙ্গে আমি যেতে পারতাম। কিন্তু অর্ককে এখনই ছেড়ে দিচ্ছে। এখানে আমায় থাকতে হবে। এই পুলু, যা তো বউমাকে পার্ক হোটেলে পৌঁছে দিয়ে আয়।'

শেষ কথাটা বাবা বলল আদেশের সুরে। দশ দিন আগে হলে দাদা পাত্তাই দিত না। কিন্তু আজ দাদা যেন বাধ্য ছেলে। বউদির কাছে গিয়ে নরম গলায় বলল 'চল, তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।'

আশ্চর্য, বউদি কিন্তু এ বার আর আপত্তি করল না। দাদা-বউদি কেবিন ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। সে দিকে তাকিয়ে বাবা বলল, 'পুলুর গোঁয়ার্তুমিটা একটু কমেছে। না রে লিলি?'

শুনে অর্কর দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলল সাঁঝেলি, গত দশ বারো দিনে এই প্রথম।

৩৫

ড্রয়িংরুমে রাখা মোবাইল ফোনটা বাজছে। ড্রয়িংরুমে এসে ফোনটা ধরে অর্ক বুঝতে পারল, নন্দিনী। নার্সিংহোম থেকে ফেরার পর অর্ক আর অফিস যেতে পারেনি। ডাক্তার দিন সাতেক বিশ্রাম নিতে বলেছিলেন। সেই সময় নন্দিনী একবার দেখতে এসেছিল। সেদিন ওকে বেশি সময়

দিতে পারেনি। কেননা সেদিনই প্রোজ্জ্বলদা মুম্বই থেকে ফোন করে খবর দেন, আশিস ভটচায মারা গেছেন। উনি প্লেনে ডেডবডিটা পাঠিয়ে দিচ্ছেন। খবরটা শোনার পর সাঁঝেলির মতো, অর্কও খুব মুষড়ে পড়েছিল। কেননা, আশিস ভটচায সম্পর্কে প্রথম দিকে ওর খুব একটা ভালো ধারণা ছিল না। পরে সেটা বদলায় ও যখন নার্সিংহোমে ছিল। রোজ দেখতে গিয়ে, প্রোজ্জ্বলদাই ওর ভুল ভাঙিয়ে দেন আশিসবাবুর প্রশংসা করে। বেঁচে থাকার সময় লোকটার সঙ্গে কোনওদিন অর্কর দেখা হয়নি। ওর এমনই কপাল, এয়ারপোর্ট থেকে নিমতলা শ্মশান পর্যন্ত সেই লোকটার মরা মুখ ওকে দেখতে হয়েছে।

অর্কর ইচ্ছে ছিল, আজই একবার অফিসে ঢুঁ মারবে। রেজিগনেশন লেটারটা দিয়ে আসবে পার্সোনেল

ডিপার্টমেন্টে। সেই সময় দেখাও করে আসবে অন্য কলিগদের সঙ্গে। এরই মাঝে নন্দিনীর ফোন। 'বল' বলার সঙ্গেই নন্দিনী খুব কাঠ কাঠ গলায় বলে উঠল, 'শোন, দুটো কথা বলার জন্য তোকে ফোন করলাম। এক, এডিটর তোকে আজ একবার দেখা করতে বলেছেন। কখন দেখা করবি বা আদৌও দেখা করবি কী না, সেটা তোর ব্যাপার। আর সেকেন্ড কথাটা হল...'

ওকে থামিয়ে দিয়ে অর্ক বলল, 'তুই এভাবে কথা বলছিস কেন ন্যানি?'

নন্দিনী দমল বলে মনে হল না। গলা চড়িয়ে ও বলল, ' তো... কীভাবে কথা বলব? তুই যেমন, ঠিক তেমনভাবেই তোর সঙ্গে কথা বলা উচিত। তোর মত ডিবচ... সেলফিশ... প্লে বয় মার্কা ছেলেকে আমার ফোন করাই উচিত হয়নি।'

'ন্যানি প্লিজ, এত রেগে রেগে কথা বলছিস কেন? আর ক'দিন পর এখান থেকে চলে যাচ্ছি। এমনিতেই আমার মন খুব খারাপ। তার মধ্যে কেন তুই এত গালাগাল দিচ্ছিস...'

'তুই বাইরে যাচ্ছিস নাকি? কই, আমাকে তো কিছু বলিসনি। আমি তো শুনলাম এডিটরের মুখে। তোর বাইরে যাওয়া নিয়ে আমি

কতটা কী জানি, সেটা জানতে চাইছিলেন। তুই ভাবিস কী না জানি না, অফিসশুদ্ধ লোক জানে, আমি নাকি তোর খুব ক্লোজ।'

বিবিসি-তে চাকরি পাওয়ার কথা নন্দিনীকে বলেছে কী না, অর্ক মনে করতে পারল না। হয়তো বলা হয়নি। সেজন্যই নন্দিনী এত চটে গেছে। কথা [illegible] ও বলল, 'সরি ন্যানি, এক্সট্রিমলি সরি। আমার ধারণা ছিল, তুই জানিস। তোকে না [illegible] চাইছি। এখন বল, এডিটর তোর [illegible] জানতে চাইছিলেন। আমি [illegible] অফিসে যেতাম।'

'তুই কি রেজিগনেশন দিয়ে যাচ্ছিস?'

'হ্যাঁ, সে রকমই ইচ্ছে ছিল। আঙ্কল আর আন্টি তাই চাইছেন।'

'তোর তো সাত কূলেও কেউ ছিল না বলে জানতাম। এই আঙ্কল আর আন্টিটা কে রে? পিপি-র বাবা আর মা না কি? ঠিক আছে, ওঁরা যখন বলছেন, তা হলে তাই কর।'

'এ ছাড়া তো আর কোনও উপায়ও নেই ন্যানি। অফিস থেকে কি আমাকে চার বছর ছুটি দেবে? দিব্যদাকে তো তুই জানিস। অ্যালাউ করবে না।'

'কাগজটা কি দিব্যদার বাবার? ওর ওপরে আর কেউ নেই? এডিটর তো চাইছেন, দিব্যদার জায়গায় তোকে বসাতে। যদি তুই বিবিসি-র চাকরিটা না নিস। যাক গে, তোর সঙ্গে কথা বলে লাভ নেই। হ্যাঁ, শোন। আর যে কথাটা বলার জন্য তোকে ফোন করেছিলাম, পিপি বাড়ি ছেড়ে চলে এসেছে।'

'বাড়ি ছেড়ে চলে এসেছে? কার বাড়িতে?'

'ইডিয়েট, কার বাড়িতে আবার, আমার বাড়িতে। আজ

ভোরবেলায় এসে হাজির। চোখের কোণে কালি। উদভ্রান্তের মতো চেহারা। এসেই বলল, আমায় কয়েকটা দিন থাকতে দিবি? কেউ যেন না জানে। তখনই আমার সন্দেহ হল, তোর সঙ্গে নিশ্চয়ই পিপির কিছু হয়েছে?'

'না তো। কেন, কিছু বলেছে নাকি?'

'না কিছু বলেনি। আমিও জিজ্ঞেস করিনি। কাল রাতে বোধহয় ঘুমোয়নি। আমার এখানে এসে

দু'চারটে কথা বলেই ঘুমিয়ে পড়ল। সেই ফাঁকে তোকে ফোনটা করলাম। তোর সঙ্গে কি ঝগড়া টগড়া কিছু হয়েছে? কাল সন্ধেবেলায় শুভশ্রী বলে আমাদের এক বন্ধুর ম্যারেজ অ্যানিভার্সারি ছিল। ওর বাড়িতেই পিপির সঙ্গে দেখা। তখন দেখলাম, হাসিখুশি। তোকে নিয়ে আমরা বন্ধুরা কত মজা করলাম। তারপর সাতটা সোয়া সাতটার সময় ওর মোবাইলে একটা ফোন এল, দেখলাম, ও তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে গেল।'

'কার ফোন ছিল, কিছু বলেছিল?'

'আমরা তো ভেবেছিলাম, তোর ফোন। কিন্তু শুভশ্রীর হাজব্যান্ডকে ও বলল, পাম অ্যাভেনিউ যাবে। ওদের ড্রাইভার ওখানে নামিয়েও দিয়ে এসেছিল পিপি-কে। ওর পরিচিত বা রিলেটিভ কি কেউ ওখানে থাকেন, তুই জানিস?'

'মনে হচ্ছে দীপিকা সেন। ওই যে, কিডনি র‍্যাকেটে যিনি জড়িয়ে পড়েছেন সেই সত্যব্রত সেনের স্ত্রী।'

'তা হলে ওখানে এমন কিছু হয়েছে, পিপি আপসেট হয়ে গেছে?'

নন্দিনীর গলার স্বরে তেমন ঝাঁঝ আর নেই। অর্ক বলল, 'তুই বলছিস বটে, কিন্তু আমার মনে হয়, অন্য কিছু। আন্টির সঙ্গে কোনও প্রবলেম। গত দু'তিন দিন ধরেই দেখছি, সাঁঝেলি আমাকেও এড়িয়ে যাচ্ছে। ইন ফ্যাক্ট, রোজই আঙ্কল ওদের বাড়ি আমাকে ডাকছেন। সেই সময় বাড়িতে থাকবে বলেও সাঁঝেলি থাকছে না। ফোন ধরছে না।

মেসেজের উত্তর দিচ্ছে না।'

' তোর সঙ্গে এই রকম বিহেভই করা উচিত। তুই যে এত বড় একটা ডিসিশন নিলি, একবারও কি পিপি-র সঙ্গে ডিসকাস করেছিস? অথবা বোঝার চেষ্টা করেছিস, তোর লন্ডন যাওয়া নিয়ে পিপি-র কী মত? করিসনি। কী করে পারলি রে?'

'কিন্তু সাঁঝেলি তো সব জানে। একেবার ডে ওয়ান থেকে। আচ্ছা মুশকিল? ওর সামনেই তো সবকিছু আলোচনা হচ্ছে। ও কি এ ব্যাপারে তোকে কিছু বলেছে?'

'বলবেটা আর কী। কাল শুভশ্রীর বাড়িতে দু'একটা কথা শুনেই আমি বুঝতে পেরেছি। আমি যদি তোর হয়ে এখন কিছু বলতে যাই, তা হলে পিপি সেই মুহূর্তে আমার বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে। ও কী র'ম জেদি মেয়ে তুই তো জানিস।'

'আমার কী করা উচিত, বল তো।'

' শোন অর্ক, যতদূর আমি জানি, কলকাতা ছেড়ে পিপি কিন্তু এক পা'ও নড়বে না। তোর আঙ্কল বা আন্টি যতই ওকে চাপ দিক। এমনিতে ও ব্রিটিশ সিটিজেন। তুই কি জানিস, ও জন্মেছিল ইংল্যান্ডে? তখ ন ওর বাবা আর মা থাকতেন ওখানে। ইচ্ছে করলেই পিপি ইংল্যান্ডে গিয়ে থাকতে পারে। কিন্তু ও যাবে না। আশিসদার অর্গানাইজেশনটা ও এখন আঁকড়ে ধরতে চাইছে। ও চায় না, এই সময়টায় তুই ওর পাশ থেকে সরে যাস।'

সাঁঝেলি যে ব্রিটিশ সিটিজেন, অর্ক সেটা জানত না। ও কোনও দিন বলেওনি। শুনে একটু অবাকই হল। সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। একটু চুপ করে থেকে ও বলল,' একটা জিনিস বল তো, বিয়ের ব্যাপারে কি ওর কোনও আপত্তি আছে? তোর কি মনে হয় ন্যানি?'

হঠাৎ চটে উঠল নন্দিনী, 'কী উল্টোপাল্টা বলছিস অর্ক। তোরা... পুরুষরা না সব সমান। নিজেদের অ্যাঙ্গেল থেকেই সব কিছু দেখিস। ভুলে গেলি, তোর অসুস্থতার সময় দু'বার পিপি তোর জন্য কী করেছে? আমার তো এখন সন্দেহ হচ্ছে, তুই পিপিকে ভালোবাসিস কী না। ভালোবাসলে এত কথাই

বলতিস না। এখুনি আমার বাড়িতে ছুটে আসতিস। তোকে ফোন করাই আমার অন্যায় হয়েছে।' বলেই ধুম করে রিসিভারটা ক্রেডলে রেখে দিল নন্দিনী।

গুম হয়ে অর্ক বসে রইল। কার ওপর অভিমান করে বাড়ি ছাড়ল সাঁঝেলি, এই প্রশ্নটাই ওর মাথায় ঘুরপাক খেতে লাগল। ও বুঝতে পারল না, এই মুহূর্তে ঠিক কী করা উচিত। এখনই নন্দিনীর বাড়িতে যাওয়ার দরকার নেই। সাঁঝেলি ঘুমোচ্ছে, ঘুমোক। পরে ওর সঙ্গে কথা বলা যাবে। তার আগে দীপিকাদিকে

ফোন করে জেনে নেওয়া যাক, সাঁঝেলি কেন এত আপসেট হয়ে পড়েছিল ওঁর বাড়ি থেকে ফিরে। মোবাইলে দীপিকাদির নামটা বের করেও, অর্ক দ্বিধাগ্রস্ত, সুইচ অন করবে কী না? মোবাইলের পর্দায় ঠিক আগের নামটা ওর চোখে পড়ল—দীপঙ্কর দাশগুপ্ত। কী ভেবে ও দীপঙ্করবাবুকে ফোন করে বসল। ভদ্রলোকের সঙ্গে অনেক দিন কথা বলা হয়নি।

'আরে অর্কবাবু, কী সারপ্রাইজিং ব্যাপার দেখুন, এখুনি আপনাকে ফোন করতে যাচ্ছিলাম।'

'কেন বলুন তো?'

'জামাইবাবু... মানে সত্যদা আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান।'

শুনে অর্ক একটু অবাকই হল, 'উনি কি জামিন পেয়ে গেছেন?'

'হ্যাঁ, দু'তিন দিন আগে। আপনি কি এখনই আসতে পারবেন পাম অ্যাভেনিউতে? আর্জেন্ট দরকার। আসলে সত্যদা একটা বড় খবর দিতে চান। যদি আসতে পারেন, ভালো হয়।'

কী ভেবে অর্ক বলল, 'বেশ, আসছি।

চট করে পোশাক বদলে বাইরে বেরিয়ে অর্ক গাড়ি [illegible] করল।

[illegible] । দুই পাখি মারা যাবে। সত্যব্রতবাবু কী বলতে চান, সেটা [illegible] যাবে, [illegible] দিদির সঙ্গেও কথা বলা যাবে সাঁপোলি সম্পর্কে। গাড়ি চালাতে [illegible] কী [illegible] সাঁপোলি বাড়ি ছেড়ে [illegible] আঙ্কল এতক্ষণে নিশ্চয়ই ওকে একবার ফোন করতেন।

[illegible] প্রায় আধঘণ্টা পর দীপিকাদির বাড়িতে পৌঁছতেই অর্ক দেখল, রীতিমতো প্রেস কনফারেন্স ডেকেছেন
ডাঃ সত্যব্রত সেন। খবরের কাগজ আর টিভি চ্যানেলের বারো চোদ্দো জন রিপোর্টার সেখানে হাজির। ওদের কাগজের কমলেন্দুকেও চোখে পড়ল অর্কর। ঘরের এক কোণে একজনকে ইন্টারভিউ দিচ্ছেন সত্যব্রতবাবু। চোখমুখ খুশিতে উপচে পড়ছে। যে মানুষটা কয়েকদিন জেল হাজতে কাটিয়ে এলেন, তাঁর তো এত উচ্ছ্বসিত হওয়ার কথা নয়। দেখে অর্ক একটু অবাকই হল। ভিড়ের মাঝে ও দীপঙ্করবাবুকে খুঁজতে লাগল। ঘরের অন্য দিকে, রিপোর্টারদের হাতে একটা করে হ্যান্ডআউট ধরিয়ে দিচ্ছিলেন দীপঙ্করবাবু। ওকে দেখে এগিয়ে এসে বললেন, 'আপনার জন্যই এতক্ষণ অপেক্ষা করছিলাম। একটা সুখবর আছে। এই নিন, এই হ্যান্ডআউটে সব লেখা আছে।'

হ্যান্ডআউটে চোখ বোলাতে লাগল অর্ক। 'ওয়ার্ল্ড সায়েন্স কংগ্রেস সম্মানিত করতে চায় ভারতীয় বিজ্ঞানী ডাঃ সত্যব্রত সেনকে। কিডনি ট্রান্সপ্ল্যান্টেশনে তাঁর অসামান্য সাফল্যের কারণে। তিনি এমন একটি সলিউশন আবিষ্কার করেছেন, যার দ্বারা যে কোনও প্রাণীর কিডনি, দেহের বাইরে বের করে আনার পরও, আটচল্লিশ ঘণ্টা সজীব রাখা সম্ভব । চিকিৎসা জগতে এটা একটা যুগান্তকারী আবিষ্কার । এই

সলিউশন বহু মানুষের কিডনি রোগ নিরাময়ে সাহায্য করবে।'

'সাত বছর আগে ডাঃ সেন ওয়ার্ল্ড সায়েন্স কংগ্রেসে তাঁর এই রিসার্চ পেপার পাঠান। তিনি দাবি করেন, কলকাতায় তিনি রমেন্দ্রনারায়ণ মুখার্জি নামে এক রোগীর কিডনি ট্রান্সপ্ল্যান্ট করার সময় এই

সলিউশনটি ব্যবহার করেন। সেই রোগী সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে যান। ডাঃ সেনের এই পেপার নিয়ে কংগ্রেসে সেই সময় তুমুল বাকবিতণ্ডাও হয় ডাঃ সেনকে বলা হয়, রোগী সম্পর্কে নিয়মিত রিপোর্ট দিতে। সেই রোগী চার বছর বেঁচে ছিলেন। কংগ্রেস সদস্যরা সম্প্রতি একমত হয়েছেন, ডাঃ সেনের এই সলিউশন ভবিষ্যতে কিডনি রোগীদের চিকিৎসায় কাজে লাগবে। সেই কারণে তাঁকে পুরস্কৃত করতে চায়। আগামী মাসের চার তারিখে ফিলাডেলফিয়ায় কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে ডাঃ সেনকে আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে।'

হ্যান্ডআউটের পাঠোদ্ধার করে ডাঃ সত্যব্রত সেনের দিকে তাকাল অর্ক। যে কিডনি রোগীর কথা সত্যব্রতবাবু লিখেছেন, সেই রমেন্দ্র নারায়ণ মুখার্জি আর কেউ নন, ওরে দাদু। আশ্চর্য, আজ সকালেই দাদুর ঘর গোছানোর সময় দাদুর কিডনি অপারেশনের কথা জানতে পেরেছে অর্ক। আর সেই অপারেশন করেই একজন অ্যাওয়ার্ড পাচ্ছেন ? এ তো বিরাট খবর। দাদুর নামটা সারা পৃথিবীর কাগজে বেরবে। ভাবা যায়! ইন্টারভিউ দেওয়া শেষ করে চেয়ারে এসে বসলেন সত্যব্রতবাবু। প্রেস কনফারেন্স শুরু হয়ে গেল। ওয়ার্ল্ড সায়েন্স কংগ্রেসের এই অ্যাওয়ার্ড কতটা গুরুত্বপূর্ণ, সেটা বোঝাচ্ছেন সত্যব্রতবাবু। কে একজন প্রশ্ন করল, 'এর আগে কি কোনও ভারতীয় এই সম্মান পেয়েছেন?'

'হ্যাঁ, তিরিশ বছর আগে ড.মণিলাল মেহতা।'

'এই আবিষ্কারটা যুগান্তকারী বলা হচ্ছে কেন?'

'কারণ চিকিৎসাশাস্ত্রে এক ধাপ এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হল।'

'এই খবরটা আগে কেন মিডিয়াকে দেননি?'

'তখন খবরটা দিলে ভুল বোঝাবুঝি হত। জানেনই তো বাঙালি কাঁকড়ার জাত। আমাকে টেনে নামানোর চেষ্টা শুরু হয়ে যেত। আমি চেয়েছিলাম ওয়ার্ল্ড সায়েন্স কংগ্রেসের ছাপটা আগে নিয়ে আসতে।'

'আপনার তৈরি সলিউসনের অভিনবত্বটা কী?'

'বুঝিয়ে বলছি। কিডনি ট্রাসপ্ল্যান্ট করার সময় দু'টো অপারেশনই আমাদের খুব দ্রুত করতে হয়। অর্থাৎ ডোনারের দেহ থেকে কিডনি তুলে নেওয়ার কয়েক মিনিটের মধ্যেই অন্যের দেহে সেই কিডনি

ট্রান্সপ্ল্যান্ট না করলে, ডোনারের সেই কিডনি নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। আমার সলিউশন

মারফত ডোনারের দেহ থেকে কিডনি তুলে নেওয়ার পরও, সেটা দু'দিন বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব। এর ফলে কী সুবিধাটা হল শুনুন। যে কোনও মৃতদেহ থেকে কিডনি তুলে নিয়ে, ধীরে সুস্থে এখন অন্যের দেহে লাগিয়ে দেওয়া সম্ভব। সরকারি লাল ফিতের জন্য এখন একেকজন রোগীকে বহু দিন অপেক্ষা করতে হয়। নিয়মকানুনের এত কড়াকড়ি। আমার সলিউশন স্বীকৃতি পাওয়ার পর, অনেক অনেক বেশি সংখ্যক রোগী অনেক তাড়াতাড়ি কিডনি বদলে নিতে পারবেন। জাপানের নাকাতা ইন্টারন্যাশনাল এই রিসার্চের জন্য আমাকে অ্যাপয়েন্ট করেছিল। ওই কোম্পানিকেই আমি পেটেন্ট রাইটস দিয়ে দিয়েছি।'

'রিসেন্টলি আপনি হনুমানের কিডনি র‍্যাকেটে জড়িয়ে পড়েছেন। কেন আপনার নামটা উঠে এল?'

'প্লিজ, আজ অন্তত এই প্রশ্নটা করবেন না।'

' কেউ কি আপনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে? আপনার সাফল্যে জেলাস?'

'আপনারা খোঁজ করে দেখুন।'

'তারাই কি আপনাকে হনুমানের কিডনি র‍্যাকেটে জড়িয়েছে?'

' সে ব্যাপারেও আমি কিছু বলব না। কেসটা এখন সাবজুডিস। তা ছাড়া, ওয়াইল্ডলাইফ ক্রাইম ব্যুরো তদন্ত চালাচ্ছে। সময় এলে সবটাই জানাব প্রেস কনফারেন্স করে।'

'আপনাকে স্বীকৃতি দিতে ওয়ার্ল্ড সায়েন্স কংগ্রেসের এত বছর লাগল কেন?'

'গুড কোয়েশ্চেন। ওয়ার্ল্ড সায়েন্স কংগ্রেসে আমি রিসার্চ পেপার পাঠিয়েছি জেনে কলকাতারই এক ডাক্তার আমার পিছনে লেগেছিলেন। আপনারা তো জানেন, কিডনি ট্রান্সপ্ল্যান্ট করার সময় চার পাঁচজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের একটা টিম কাজ করে। একার পক্ষে কারও এই অপারেশন করা সম্ভব না। রমেন্দ্র মুখার্জির অপারেশনের সময় ইউরোলজিস্ট সেই ডাক্তার আমাকে সাহায্য করেন। পরে আমি জানতে পারি, ওয়ার্ল্ড সায়েন্স কংগ্রেসে মেল করে তিনি জানান, আমি নাকি মিথ্যে তথ্য দিয়েছি। অপারেশনটা করেছেন উনি। আসলে ভাসকুলার সার্জারি সম্পর্কে এখানকার চিকিৎসক মহলে তেমন কেউ কিছু জানতেন না। বিশেষজ্ঞ বলে, লিডারশিপটা আমিই দিয়েছিলাম। ইউরোলজিস্ট সেই ভদ্রলোক সেটা মানতে পারেননি। বয়সে উনি আমার থেকে বড়। সেই কারণে পুরো কৃতিত্বটা নেওয়ার জন্য উনি আমার পিছনে লেগেছিলেন। প্রোফেশনাল রাইভালরি বলতে পারেন। ওঁর অভিযোগ পেয়ে একটা কনফিউশন তৈরি হয়েছিল ওয়ার্ল্ড সায়েন্স কংগ্রেসে। পরে কোনওরকম বিতর্কে না গিয়ে, ওরা আমার তৈরি সলিউশনটাকেই বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। অ্যাওয়ার্ডটা সেই কারণেই দিতে এত দেরি হল।'

'কলকাতার সেই ইউরোলজিস্টের নাম কি আমরা জানতে পারি

?'

'আপনারা তাঁর নাম জানেন। ডাঃ সুব্রত মিত্র।'

নামটা শুনে অর্ক চমকে উঠল, মানে আঙ্কল... সাঁঝেলির বাবা। কিন্তু উনি তো এ রকম মানুষ নন।

৩৬

ভোরের আকাশটা যে এত সুন্দর, আগে তা জানত না সাঁঝেলি। গোবিন্দপুরে অ্যানিম্যাল হসপিটালে আসার পর থেকে সেটা ও টের পাচ্ছে। বাইপাসের পশ্চিমদিকে অনেক হাই রাইজ বিল্ডিং হয়েছে। কিন্তু পূর্বদিকটা একেবারে খোলা। নন্দিনীর বাড়ি থেকে চলে আসার পরদিন, এখানে খুব ভোরবেলায় ওর ঘুম ভেঙে গেছিল। জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে ও মুগ্ধ হয়ে যায়। একেবারে দিগন্তের কাছাকাছি সূর্য। আকাশটা লাল হয়ে রয়েছে। গেস্ট হাউসের বিছানা ছেড়ে ও জানলার সামনে এসে দাঁড়ায়। ওই দিকে তাকিয়ে ওব মনের ভেতরে খুশির একটা রেশ ছড়িয়ে পড়ে। সূর্য প্রণাম করার সময় হঠাৎই ওর মনে হয়, পশ্চিম দিকটা যেন অতীত। পূর্বদিকটা ওর ভবিষ্যৎ। পরদিন থেকে ও আর ঘরের মধ্যে বসে থাকেনি। মর্নিং ওয়াক শুরু করে দিয়েছে। ও বুঝতে পারছে, শরীরের মধ্যে একটা পরিবর্তন আসছে। এও লক্ষ করছে. সকলবেলায় হাঁটাহাটি করলে, সারা দিন শরীরটা খুব ভালো থাকে।

দিন দশেক হল, সাঁঝেলি লেক গার্ডেন্সের বাড়ি থেকে একবস্ত্রে বেরিয়ে এসেছে। ও যখন নন্দিনীর

বাড়িতে ছিল, সেই সময় অর্ক, বাবা, মা, মেসোমণি—অনেকেই অনেকবার ফোন করেছিল। ওর ধরার ইচ্ছে হয়নি। সেদিনই ও নতুন একটা মোবাইল নম্বর নেয়। এই ক'দিনে একমাত্র আভা মাসির সঙ্গেই ওর দেখা হয়েছে। হঠাৎই সাউথ সিটির শপিং মলে এ, কয়েকটা সালোয়ার কামিজ কিনতে গিয়ে। ও যে বাড়ি ছেড়ে চলে এসেছে, সেটা আভা মাসির অজানা নয়। পোড় খাওয়া মহিলা, আভা মাসি তবুও

জিজ্ঞেস করেনি, কেন বাড়ি ছেড়ে এলি। উল্টে একটা খবর দিল, বাবা আর মা নাকি লন্ডনে অর্কর থাকার একটা ব্যবস্থা করে দিয়েছে। খবরটা শোনার পর, সাঁঝেলি ঠিক করেছে, অর্ক চলে না যাওয়া পর্যন্ত ও কোথায় আছে কাউকেই জানাবে না। অন্তত, আগামী সাত-আট মাস তো বটেই।

গোবিন্দপুরে এসে পুরো অর্গানাইজেশনের দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে সাঁঝেলির এখন মনে হচ্ছে, ও পারবে। আশিসদার অভাব মেটানো সম্ভব নয়। তবুও চেষ্টা করলে, আশিসদার অসমাপ্ত কাজগুলো ও শেষ করে ফেলতে পারবে। দরকার শুধু টাকার। হাসপাতাল থেকে যা রোজগার হয় তাতে রোজকার খরচ চলে। ডেভেলপমেন্টের জন্য কোনও কাজ করা সম্ভব না। দাদা আশিসদাকে কথা দিয়েছিল, একটা চারতলা বিল্ডিং বানিয়ে দেবে। কিন্তু দীপা বউদিকে পৌঁছে দিতে দাদা সেই যে মুম্বই গেছে, এখনও ফিরে আসেনি। তবু, এই ক'দিনে সাঁঝেলি বেশ গুছিয়ে নিয়েছে। কেয়ার ফর অ্যানিম্যালস-এর একটা ওয়েবসাইট তৈরি করেছিল আশিসদা। সকালের দিকে সাঁঝেলি অফিসে এসেই ওয়েবসাইটটা খুলে দেখে। দেশ বিদেশ থেকে অসংখ্য মেল আসে। গুরুত্ব বুঝে উত্তর দেয়।

এই কাজে ওকে সাহায্য করে বিদিশা বলে একটা মেয়ে। এরপর পুরো হসপিটালটায় একবার চক্কর দেয় সাঁঝেলি। আউটডোরে গিয়ে একবার কথা বলে আসে ভেট সার্জেন অন্নপূর্ণা সামন্তের সঙ্গে। ইদানীং পেশেন্টের সংখ্যা এত বেড়ে গেছে আরও সার্জেন আর হ্যান্ডলার নেওয়া দরকার। ট্রাস্টি বোর্ডের মিটিং ডেকে সাঁঝেলি এ ব্যাপারে সম্মতি নিয়ে রেখেছে। আরও দু'টো কাজ ও করতে চায়। এক, আশিসদার একটা স্ট্যাচু বসাবে। দুই, কর্মীদের মাইনে বাড়াবে।

আজ আউটডোরে অন্নপূর্ণা সামন্তের সঙ্গে কথা বলে বেরোনোর সময় সাঁঝেলি দেখল, গেটের সামনে রিকশা থেকে নেমে ভাড়া

মেটাচ্ছে শিউচরণ। ওর হাতে মিষ্টির একটা প্যাকেট। অনেক দিন পর ওকে দেখে সাঁঝেলির ভালো লাগল। এগিয়ে গিয়ে ও বলল, ' 'কেমন আছ শিউচরণ?'

এক গাল হেসে শিউচরণ বলল 'খুব ভালো ম্যাডাম। আপনি কি আমাদের ওপর রাগ করেছেন? চিড়িয়াখানায় আর যাচ্ছেন না কেন?'

'রাগ করব কেন? আসলে এখানে খুব ব্যস্ত হয়ে গেছি। সময় পাই না। আমি যে এখানে আছি, তা তুমি জানলে কী করে শিউচরণ?'

' রমেশের কাছ থেকে। আপনাদের এখানে হ্যান্ডলারের কাজ করে। রথীনবাবুর সঙ্গে আগে আমাদের ওখানে যেত। ও-ই কথায় কথায় কাল আপনার কথা বলছিল।'

' এ দিকে কোথায় এসেছিলে শিউচরণ?'

'ভগবানপুর বলে একটা জায়গায়। এই রুবি হসপিটালের পাশ দিয়ে ভেতরে যেতে হয়। সকালবেলায় ডিরেক্টর স্যারের সঙ্গে এসেছি। আলিপুরে আর চিড়িয়াখানা থাকছে না ম্যাডাম। ভগবানপুরে চলে আসছে। ডিরেক্টর স্যার জায়গাটা দেখতে এসেছিলেন। ফেরার সময় উনিই আমাকে নামিয়ে দিয়ে গেলেন গোবিন্দপুরের মোড়ে।'

খবরটা শুনে সাঁঝেলি একটু অবাকই হল। বলল, 'তাই নাকি? জু এখানে শিফট করা হচ্ছে? ডিসিশন কি নেওয়া হয়ে গেছে? কই, কাগজে তো কিছু দেখিনি?'

'ডিরেক্টর স্যার তো তাই বললেন। আপনাদের জিত হল ম্যাডাম। কত দিন আন্দোলন করেছেন চিড়িয়াখানার গেটের সামনে। আপনারা যা চাইছিলেন, শেষ পর্যন্ত তাই হল। আশিসবাবুকে খবরটা দিয়ে দেবেন। শুনলে উনি খুব খুশি হবেন।'

কথাটা শুনে সাঁঝেলি চুপ করে গেল। সত্যিই আশিসদা খুশি হতেন। কিন্তু কোথায় আশিসদা? উনি তো সুখ-দুঃখের বাইরে চলে গেছেন। আশিসদার মৃত্যুর খবরটা নিশ্চয় শিউচরণ জানে না। আর জানবেই বা কী করে? আশিসদা তো আর সেলিব্রিটি ছিলেন না যে, ওঁর

মৃত্যুর খবর নিয়ে মিডিয়ার মাথাব্যথা থাকবে। চোখের কোণ ভিজে আসছে দেখে সাঁঝেলি প্রসঙ্গ এড়িয়ে বলল, 'চল শিউচরণ, অফিস ঘরে চল। এখানে খুব রোদ্দুর।'

বলেই ও হাঁটতে লাগল। শিউচরণ বলল, 'দাঁড়ান ম্যাডাম, আসল কাজটা আগে সারি। যে কারণে ডিরেক্টর স্যার আমাকে পাঠালেন। এই নিন, আপনার পাওনা টাকা। অনেক দিন পড়ে ছিল স্যারের কাছে।' বলেই একটা খাম এগিয়ে দিল ও।

'কিসের টাকা শিউচরণ?'

'বা রে, ভুলে গেছেন ম্যাডাম, আপনি যে একমাস চাকরি করেছিলেন জু-তে। হঠাৎ আপনি উধাও হয়ে গেলেন। ফোনেও আপনাকে পাওয়া যাচ্ছে না। স্যার মাঝে একবার আমাকে আপনার বাড়িতে পাঠালেন। বললেন, যাও শিউ, তোমার ম্যাডামের মাইনের টাকাটা দিয়ে এস। কিন্তু লেক গার্ডেন্সে গিয়ে শুনলাম আপনি ওখানে থাকেন না। মহা মুশকিল। অর্ক স্যারের কাছে গেলাম। উনিও দেখলাম, কিছু জানেন না।'

অর্কর নাম শুনে বুকের ভেতরটা কেমন যেন করে উঠল সাঁঝেলির। বহুদিন পর কেউ ওর সামনে অর্কর নাম করল। অর্কর সঙ্গে প্রায় দু'টো সপ্তাহ দেখা হয়নি। ওর কোনও খবরও রাখেনি। কোন লজ্জায়ই বা রাখবে? প্রথম ক'টা দিন ওর খুব কষ্ট হয়েছিল। মোবাইলে মিসড কল আর মেসেজ-এর বন্যা দেখে। সিম কার্ড বদলানোর পর সেই কষ্টটা ও চাপা দিতে পেরেছে। অর্কর সঙ্গে ওর সম্পর্কের কথা শিউচরণ জানে। প্রথমবার মেদিনীপুর থেকে যখন ওরা একসঙ্গে ফিরছিল, সেই সময় বুঝতে পেরেছিল। এখন অর্ক সম্পর্কে কিছু জানতে না চাইলে, শিউচরণ ভুল বুঝতে পারে। অফিস ঘরে এসে, সাঁঝেলি তাই বলল, 'অর্ক স্যারের সঙ্গে তোমার কোথায় দেখা হল শিউচরণ?'

'ওঁর বাড়িতে। সত্যি কথা বলব ম্যাডাম, দেখা না হলেই ভালো ছিল। উনি ভালো নেই। খুব রোগা হয়ে গেছেন। দেখেই মনে হল, খুব অশান্তিতে আছেন। আমাকে বললেন, লন্ডন চলে যাচ্ছেন। কী এক চাকরি নিয়ে।'

'কবে যাচ্ছেন, জান? তারিখটা আমাকে বলেছিল ভুলে গেছি।'

'তিন তারিখের বিকালে। আরে, তা হলে... তো ম্যাডাম আজকেই। উনি বলেছিলেন, বিকালের প্লেনে দিল্লি যাবেন। তারপর ওখান থেকে রাতের প্লেনে লন্ডনে।' কথাগুলো বলতে বলতেই শিউচরণ সরাসরি মুখের দিকে তাকাল। তারপর একটু থেমে বলল, 'আমি আনপড় মানুষ ম্যাডাম। ছোট মুখে বড় কথা বলা আমার উচিত না। তবুও একটা কথা বলছি। আপনিও লন্ডন চলে যান। আপনাকে ছাড়া অর্ক স্যার ভালো থাকবেন না।'

কথাটা শুনে অতি কষ্টে নিজেকে সামলাল সাঁঝেলি। শিউচরণের সামনে কোনওরকম দুর্বলতা দেখানো ঠিক হবে না। অর্ক প্রসঙ্গে আর কোনও কথা বলবে না সিদ্ধান্ত নিয়ে, কয়েক সেকেন্ড জানলার বাইরে তাকিয়ে সাঁঝেলি বলল, 'এখানে লাঞ্চ করে যাও শিউচরণ। কালীতলার বাজার থেকে ইলিশ মাছ আনিয়েছি।'

তখনই চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল শিউচরণ। হাত জোড় করে বলল, 'আজ না ম্যাডাম। এখুনি বাড়ি ফিরতে হবে আমাকে। একটা খুশ খবর আছে।'

'কী খবর গো?'

pathagar.net

'হনুমানজির কিরপায় আমার বউ মুন্নির পেটে বাচ্চা এসেছে।'

'কনগ্রাট, শিউচরণ। এই প্রথম নাকি?'

'হ্যাঁ ম্যাডাম। দেখুন, হনুমানজির কী লীলা। দশ বছর ধরে আমরা অনেক চেষ্টা করেছি। ডাক্তার দেখিয়েছি, মন্দিরে গিয়ে পুজো দিয়েছি। কিছু হয়নি। সেই যে আমরা নয়াগ্রাম গিয়ে রেসাস মাঙ্কিগুলোকে বাঁচানোর চেষ্টা করলাম, তারপরেই স্বপ্নে মুন্নিকে দেখা দিলেন হনুমানজি। তোদের ইচ্ছে পূরণ হবে। বউকে নিয়ে তাই একবার বালাজি মন্দিরে ঘুরে এলাম। পুজো দিলাম।'

'কোথায় এই মন্দির?'

'মেহেন্দিপুর বলে একটা জায়গায়। জয়পুরের কাছে। দিল্লি আগ্রা রোড ধরে যেতে হয়। ওইখানেই জন্মেছিলেন হনুমানজি। খুব বিখ্যাত মন্দির ম্যাডাম। ওখানে গিয়ে যদি কোনও মানত করেন, তা হলে ছয়মাসের মধ্যে সেটা ফলবেই। বালাজি মন্দিরে গিয়ে কী মানত করেছি, জানেন? আমার ছেলে হলে, সেই ছেলে যেন অর্ক স্যারের মতো হয়। আর মেয়ে হলে আপনার মতো।'

শুনে সাঁঝেলি হেসে ফেলল। 'তুমি কি চাও শিউচরণ? ছেলে না মেয়ে?'

'মেয়ে ম্যাডাম। বউ কিন্তু ছেলে চায়। ও দাঁড়ান, বালাজি থেকে একটা জিনিস এনেছি আপনার জন্য। ভুলেই গিয়েছিলাম। ভাগ্যিস মনে পড়ল।' বলেই বুক পকেট থেকে কী যেন বের করে আনল শিউচরণ। তারপর এগিয়ে দিয়ে বলল, 'হনুমানজির লকেট। এটা পরে নিন। হনুমানজি আপনার মনের ইচ্ছে পূরণ করে দেবেন।'

লকেটটা হাতে নিয়ে গলায় পরে সাঁঝেলি বলল 'থ্যাঙ্ক ইউ শিউচরণ।'

'আচ্ছা, আসি তা হলে ম্যাডাম। আর দেরি করতে পারব না।

আলিপুর অনেক দূর। যেতে যেতে বেলা প্রায় দু'টো হয়ে যাবে। বউ আমার জন্য বসে থাকবে।'

ওর নতুন মোবাইল নম্বরটা নিয়ে শিউচরণ বেরিয়ে যাওয়ার পর কী ভেবে গলায় হনুমানজির লকেটটা ঝুলিয়ে নিল সাঁঝেলি। ঠাকুর দেবতায় ও বিশ্বাস করে না। কিন্তু কেউ যদি বিশ্বাস করে, তাতে আঘাত দিতে চায় না। লকেটটা চোখের সামনে এনে মজা করার জন্যই ও মনে মনে বলল, 'অর্ককে আমার কাছে ফিরিয়ে দাও হনুমানজি, প্লিজ। তা হলে সারা জীবন তোমার এই লকেট গলায় ঝুলিয়ে রাখব।'

কথাগুলো বলে কয়েকটা মিনিট ও চুপ করে বসে রইল। ভুল করেছে, অর্ককে কোনও কিছু না জানিয়ে চলে এসে ও বোধহয় ভুল করেছে। ওকে ভুল বুঝে শেষপর্যন্ত অর্ক চলেই গেল। ভালো একটা ব্রেক পেয়েছে, যাবেই বা না কেন?

অর্কর তো কোন দোষ নেই। ও অনেক চেষ্টা করেছিল, সামনে এসে দাঁড়ানোর। কিন্তু সাঁঝেলি তা হতে দেয়নি। কারণটা অবশ্য সাঁঝেলি কাউকেই বলেওনি। ইস্টার্ন বাইপাসে অর্কর সঙ্গে ওর পরিচয় হয়েছিল ঠিক পাঁচমাস আগে। কত দ্রুত কেটে গেল এই সময়টা। কত সুন্দর সেই সব স্মৃতি। যে মানুষটাকে নিয়ে ও সারাটা জীবন কাটানোর কথা ভেবেছিল, আজ বোধহয় সে চিরদিনের জন্য হারিয়ে গেল। সাঁঝেলি এটা ভেবেই অবাক হয়ে গেল, অর্ককে দূরে সরিয়ে রেখে গত কয়েকটা দিন ও কাটাল কী ভাবে?

pathagar.net

এই তো ক'দিন আগে রায়চকের র‍্যাডিসন ফোর্টে ওকে নিয়ে গেছিল অর্ক। মিৎসুবিসি কোম্পানির কী একটা প্রোগ্রাম ছিল। সারাটা দিন ওখানে কাটাবে বলে ওরা তৈরি হয়েই গেছিল। বেলা একটার মধ্যে কাজ শেষ করে অর্ক রুমে

ফিরে এল। সাঁঝেলি তখন স্নান সেরে মুখে ক্রিম ঘষছে। ওর পরনে পাতলা ম্যাক্সি। শরীরের চড়াই উৎরাই স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। ঘরে ঢুকেই অর্ক থমকে দাঁড়িয়েছিল। ওর চোখে দুষ্টুমির ছাপ দেখে সাঁঝেলি বলে উঠেছিল, 'এই... এখন একদম কাছে আসবে না।'

হাতের ফাইল বেডের ওপর ছুঁড়ে ফেলে অর্ক বলেছিল, 'তা হলে কখন কাছে আসব গো?'

কথার ফাঁদে জড়িয়ে পড়ে সাঁঝেলি বলেছিল, 'তুমি এত ঘেমে আছ, তোমাকে দেখে আমার গা ঘিনঘিন করছে।'

শুনে জামার বোতাম খুলতে খুলতে অর্ক উত্তর দিয়েছিল, 'তা হলে যাই, স্নান করে আসি। তারপর কিন্তু তুমি না করতে পারবে না।'

'একদম না। ও
সব বিয়ের আগে একদম না। অ্যাটেম্পট করলেই কিন্তু আমি চেঁচিয়ে লোক জড়ো করব। তখন বুঝতে পারবে, কত ধানে কত চাল।'

'তুমি নিরামিষ জানতাম, কিন্তু এতটা নিরামিষ ভাবতে পারিনি। আমার তো এখন ভয়ই হচ্ছে, বিয়ের পরও না আমায় বাইরে ছুটতে হয়।'

'কী বললে? পাজি কোথাকার।' অর্কর কাছে গিয়ে ওর কান ধরে সাঁঝেলি বলেছিল, 'সাহস থাকে তো আরেক বার বল। বাইরে যাবে? যাওয়াচ্ছি।'

অর্ক তখনই ওর কোমর জড়িয়ে ধরেছিল। তারপর কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে ফিসফিস করে বলেছিল, 'আজ সব দেওয়ার জন্য তৈরি থেক। স্নান করে আসছি।'

অর্কর চওড়া বুকে মাথা এলিয়ে দিয়ে সাঁঝেলি বলেছিল 'না গো আমার ভয় করে।'

'ভয়টা এখুনি ভাঙিয়ে দিচ্ছি।' বলেই অর্ক ওকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়েছিল। গালে গাল ঘষতে শুরু করেছিল। তারপর ডিভানে শুইয়ে দিয়ে পাগলের মতো চুমু খাচ্ছিল। সারা শরীর অবশ হয়ে গিয়েছিল সাঁঝেলির। নিজেকে অর্কর হাতে সেদিন ছেড়ে দিয়েছিল ও। চোখ বুজে অনাস্বাদিত সুখের অনুভূতিগুলোকে সহ্য করার সময় ওর মুখ থেকে শিৎকার ধ্বনি বেরিয়ে আসে। দু'জন কখন যে পোশাক খুলেছে, টেরও পায়নি। একটা সময় ও নিজেও সুখ আদায় করে নেওয়ার প্রক্রিয়ায় সামিল হয়ে গেছিল। শরীর নিয়ে খেলা শেষ হয়ে যাওয়ার পর অর্ক যখন চিৎ হয়ে শুয়ে হাঁফাচ্ছে, তখন চাদরে রক্তের দাগ দেখে সাঁঝেলি মারাত্মক ভয় পেয়ে যায়।

মনে আছে, ওই দিনের খুঁটিনাটি ঘটনা সাঁঝেলির মনে আছে। ম্যাক্সি দিয়ে কোনও রকমে শরীরটা ঢেকে ও বলেছিল, 'ইস, এখন কী হবে?'

অর্ক মুচকি হেসে বলেছিল,'কী আর হবে। হোটেলের লোকেরা জানে, হনিমুন করতে আসা কাপল্‌রা এখানে কী করে। ওরা জানবে, তুমি এখনও ভার্জিন।

'ধ্যাৎ, আমি কি তাই বলেছি? আমি অন্য ভয় পাচ্ছি।'

ওকে ফের বুকের ওপর টেনে নিয়েছিল অর্ক। 'এত ভয় পাওয়ার কী আছে সোনা। যদি কিছু হয়েও যায়, আমি তো আছি। ধরে নাও গান্ধর্ব মতে, এখানেই বিয়েটা আমরা সেরে রাজা রাজড়ারা যা করত।'

ফেলেছি। আগেকার দিনে অর্কর এইসব ছেলেমানুষি কথাবার্তা

মনে পড়লেই সাঁঝেলির মনটা আনন্দে ভরে যায়। ও ঠিক করেছে, দেবে।

বাকিটা জীবন, হাসপাতালের এই গেস্ট হাউসেই ওইসব স্মৃতি আকঁড়ে না হয় ও কাটিয়ে

'সাঁঝেলি দিদি, প্লিজ এ ঘরে একবার আসবেন?'

পাশের ঘর থেকে বিদিশা ডাকল চিৎকার করে। ওর গলায় উত্তেজনার আঁচ পেয়ে সাঁঝেলি উঠে দাঁড়াল। দ্রুত পায়ে এ ঘরে ঢুকে ও বলল, 'কী ব্যাপার রে?'

'ওয়ার্ল্ড ওয়াইল্ড লাইফ সোসাইটি থেকে একটা মেল এসেছে সাঁঝেলিদিদি। দেখুন, কী লিখেছে।'

উঠে দাঁড়িয়ে চেয়ারটা ছেড়ে দিল বিদিশা। কম্পিউটারের পর্দার দিকে তাকিয়ে সাঁঝেলি দেখল মেল-টা আশিসদার নামেই। দ্রুত পড়তে লাগল ও, 'ওয়ার্ল্ড ওয়াইল্ড লাইফ সোসাইটি ইজ হ্যাপি টু অ্যানাউন্স দ্যাট, আ সাম অব ওয়ান হানড্রেড থাউজেন্ড ডলার হ্যাজ বিন গ্র্যান্টেড টু কেয়ার ফর অ্যানিম্যালস-ইয়োর অর্গানাইজেশন। দিস ডোনেশন ইজ ফর ইয়োর আউটস্ট্যান্ডিং রেকর্ড ইন প্রোটেক্টিং দ্য রাইটস অ্যান্ড ইন্টারেস্ট অব দ্য ওয়াইল্ড লাইফ। প্লিজ...'

প্রথম দুটো লাইন পড়েই সাঁঝেলি আনন্দে লাফিয়ে উঠল। ওয়ান হানড্রেড থাউজেন্ড ডলার... মানে প্রায় পঞ্চাশ লাখ টাকা? আশিসদার মুখে ডবলিউ ডবলিউ এল এস-এর নাম শুনেছে সাঁঝেলি। চার-পাঁচমাস আগে শিকাগোয় একবার ওদের একটা কনভেনশনে আশিসদা গেছিল। তার আগে কাকে দিয়ে যেন

কেয়ার ফর অ্যানিম্যালস নিয়ে একটা কুড়ি মিনিটের ডকুমেন্টারি ছবিও বানায়। শিকাগোয় নিয়ে গিয়ে ডবলিউ ডবলিউ এল এস-এর মেম্বারদের দেখানোর জন্য। ছবিটা বানানো নিয়ে ট্রাস্টি বোর্ডের দু'জন মেম্বার তখন প্রশ্ন তুলেছিল। বাজে খরচ করার অর্থটা কী? কেন এক দেড় লাখ টাকা জলে দেওয়া হল? কিন্তু আশিসদা যে ঠিক কাজ করেছিল, সেটা আজ প্রমাণিত হল। ভালোই হল, দাদার কাছে আর হাত পাততে হবে না। সাঁঝেলির মাথা থেকে অর্কর কথা হারিয়ে গেল।

খবরটা দ্রুত ছড়িয়ে যাওয়ার মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই হসপিটালের সব কর্মী এসে হাজির সাঁঝেলির ঘরে। সবার মুখেই চওড়া হাসি। হইচইয়ের মাঝে কথাটা তুললেন ভেট সার্জেন অন্নপূর্ণা সামন্ত, 'এত ভালো একটা খবর। আমাদের কিন্তু সেলিব্রেট করা উচিত ভাই সাঁঝেলি।

শিউচরণের দিয়ে যাওয়া খাম সাঁঝেলির হাতে ধরা ছিল। বিদিশার দিকে সেটা এগিয়ে দিয়ে ও বলল, 'ধর, এই খামের ভেতর টাকা আছে। আজ রাতে এখানে স্পেশাল ডিনার। সবাইকে থেকে যেতে বল। আর হ্যাঁ, মেনুটা যেন ভেজ হয়।'

কথাগুলো বলেই অফিস ঘরের বাইরে এল সাঁঝেলি। গেস্টহাউসে নিজের ঘরের দিকে যাওয়ার সময় ও দেখল, ভীষণ শব্দ করে একটা প্লেন আকাশ দিয়ে উড়ে যাচ্ছে। এয়ারপোর্ট খুব দূরে নয়। মাঝে মাঝেই প্লেনের গর্জন ওদের সহ্য করতে হয়। হসপিটালের পেশেন্টদের অসুবিধা হয়। তবুও কী আর করা যাবে। হসপিটালটা করার সময় আশিসদা সম্ভবত এ দিকটা ভাবেননি। আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকার সময় হঠাৎই মনে পড়ল, আজ এই সময়েই প্লেনে করে দিল্লি যাওয়ার কথা অর্কর। এই প্লেনটা কি দিল্লিতে যাচ্ছে? এই প্লেনটার ভেতর কি অর্ক আছে? থাক বা না থাক, আকাশের দিকে তাকিয়ে সাঁঝেলি একবার হাত নাড়ল। গুডবাই অর্ক। মনে মনে বলল, 'ভালো থেকো।'

দুপুরে ঘুমোনোর অভ্যাস কোনওদিন ছিলনা সাঁঝেলির । কিন্তু গোবিন্দপুরে আসার পর থেকে অভ্যাসটা বদলেছে। দুপুরের দিকে কিছুটা সময় পুরো হসপিটাল ঝিমোতে থাকে। কোনও কাজ থাকে না বলে সাঁঝেলি এক-আধঘণ্টা বিশ্রাম নেয়। তখন বই পড়ার সুযোগটা পায়। কয়েকদিন আগে স্টারমার্ক থেকে একটা বই কিনে এনেছিল। হিউম্যান জু। লেখকের নাম ডেসমন্ড মরিস। এই মনুষ্য সমাজটা যেন চিড়িয়াখানা। বন্দি প্রাণীর আচার-আচরণের সঙ্গে মানুষের অনেক মিল আছে। বইয়ের কয়েকটা পাতা পড়তে পড়তে সাঁঝেলির চোখ বুজে এসেছিল। আধো ঘুম আধো জাগরণের মাঝে ও টের পেল, দরজায় কে যেন আঁচড়াচ্ছে। হুটহাট কেউ যাতে ঘরে ঢুকে পড়তে না পারে, সেই কারণে দুপুর বেলাতেও দরজায় ছিটকিনি দিয়ে শোয় সাঁঝেলি। ঘুমটা ওর চটকে গেল টুকি আর টাকির ডাকে। দুষ্টু দুটো তা হলে ঘরে ঢোকার চেষ্টা করছে।

হসপিটালে আসার পর থেকে টুকি আর টাকি একেবারে বাঁধন ছাড়া। সারাদিন হসপিটাল জুড়ে

ওরা ঘুরে বেড়ায়। রাতে গেস্টহাউসে এসে শোয়। ওদের যত্ন করার জন্য আগে ছিল শোনপুরি। এখন চব্বিশ পঁচিশ জন হ্যান্ডলার। কর্মীরাও ওদের চোখে চোখে রাখে। কিন্তু আজ কী এমন হল, সন্ধে হওয়ার আগেই ঘরে ঢুকতে চাইছে? টুকি আর টাকি জোরে জোরে ডাকছে। পরিচিত কাউকে দেখলে ওরা এটা করে আনন্দে। এই সময় কে-ই বা আসতে পারে? ইস, ওদের নখের আঁচড়ে দরজায় দাগ পড়ে যাবে যে। কপট রাগে বিছানা ছেড়ে ওঠার সময় সাঁঝেলি বলল, 'পাজি কোথাকার। দাঁড়া, তোদের ক্রেশ-এ আটকে রাখার ব্যবস্থা করছি।'

দরজা খুলেই সাঁঝেলি চমকে উঠল। ওর মুখ থেকে বেরিয়ে এল,'তুমি?'

দরজার ঠিক বাইরেই দাঁড়িয়ে অর্ক। বলল, ' ভেতরে আসতে

বলবে না?'

কথাটা বলে অবশ্য উত্তরের জন্য ও অপেক্ষা করল না। ঘরের ভেতর ঢুকে এল। টুকি আর টাবি ওর গায়ের ওপর লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে। ওদের হালকা আদর করার ফাঁকে বেশ জোরেই অর্ক বলল, 'যাক, তোরা অন্তত আমাকে ভুলিসনি। তোদের সঙ্গে এই কারণেই মানুষের এত তফাত।'

বলেই ওর দিকে তাকিয়ে অর্ক হাসল। কতদিন পর দু'জনের দেখা। সাঁঝেলির বুকটা মুচড়ে উঠল। শিউচরণ ঠিকই বলেছিল, অর্ক অনেক রোগা হয়ে গেছে। কী বলবে, সাঁঝেলি ভেবেই পেল না। গোবিন্দপুরে আসার পর থেকে অনেকবার মনে মনে ও দৃশ্যটা কল্পনা করেছে। অর্ক যদি কোনওদিন ওর সামনে এসে দাঁড়ায়, ও কী কৈফিয়ত দেবে। অনেক ভেবেও ও কোনও উত্তর খুঁজে পায়নি। ওর সেই প্রিয় মানুষটা আজ কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। এখন কোথায় লুকোবে ও? অর্কর ছ'ফুট লম্বা দেহটার দিকে তাকিয়ে সাঁঝেলি টের পেল, প্রথম প্রেমে বোধহয় একটা অভিশাপ থাকে। এই মানুষটাকেই দু'দুবার ও প্রায় খোয়াতে বসেছিল

। তারপর ঘটনাপ্রবাহ এমন দিকে এগিয়েছে যে, দু'জন ছিটকে যেতে বাধ্য হয়েছে দু'দিকে।

ভেতরে ভেতরে দুর্বল হয়ে পড়েছে বুঝতে পেরে, সাঁঝেলি জানলার দিকেতাকাল। প্রায় সন্ধে হয়ে গেছে। হাসপাতালের মাঠে কয়েকটা ছেলে ফুটবল খেলছে। ওরা চলে গেলে পুরো হাসপাতালটা নিঝুম হয়ে যাবে। আজ অবশ্য ডিনার আছে। মাঠের একধারে বড়

বড় রঙিন চাঁদোয়া টাঙাতে বলেছে

সাঁঝেলি। সেই সঙ্গে চেয়ার-টেবলের ব্যবস্থা করতেও। চাঁদের আলোয় ক্যান্ডেল লাইট ডিনারের কথা

তুলেছিল বিদিশা। সাঁঝেলি রাজি হয়নি। জানলা দিয়ে ও দেখতে পেল, রবি বলে একজন হ্যান্ডলার

মইয়ের ওপর উঠে আলোর ব্যবস্থা করছে।

জানলার দিকে তাকিয়ে থাকার সময়ই কাঁধে অর্কর আঙুলের স্পর্শ পেল সাঁঝেলি। সঙ্গে সঙ্গে ওর

সারা শরীর কেঁপে উঠল। অর্ক পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে। সুন্দর একটা পারফিউমের গন্ধ ভেসে আসছে।

সাঁঝেলি চিনতে পারল... ব্রুট। অর্কর খুব পছন্দের পারফিউম। ফিসফিস করে তখনই অর্ক বলল, 'কী,

আমার সঙ্গে কথা বলবে না?'

সাঁঝেলি কোনও রকমে বলল, 'যাওয়ার আগে আমার সঙ্গে দেখা করতে এলে বোধহয়?'

প্রশ্নটা না-শোনার ভান করে অর্ক বলল, 'অনেক দিন পরে তোমায় দেখলাম। আরও সেক্সি

লাগছে। জিম টিম করছ নাকি।'

বলেই অর্ক পিছন থেকে ওকে জড়িয়ে ধরার চেষ্টা করল। দরজা খোলা, বিদিশা বা অন্য কেউ যে

কোনও মুহূর্তে ঘরে ঢুকে আসতে পারে। নিজেকে দ্রুত সামলে সাঁঝোলি সরে দাঁড়াল। তারপর বলল,

'থ্যাঙ্কস ফর দ্য কমপ্লিমেন্ট।'

'আমাকে কেন কিছু জানালে না সোনা? কেন নিজেকে সরিয়ে নিলে এ ভাবে? তোমার জন্য

নন্দিনীর কাছে কত গালাগাল শুনতে হয়েছে আমাকে, জান?'

বাইরের আঁধার ঘরেও নেমেছে। কথা বলতে বলতে অর্ক কয়েক পা এগিয়ে এসেছে। পিছোতে

গিয়ে দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেল সাঁঝেলির। অর্ককে ও ভালো মত জানে। অর্কর গায়ে অসম্ভব জোর।

ছোঁ মেরে ওকে কোলে তুলে নেবে। তারপর ওর বুকের মধ্যে মুখ গুঁজে দেবে। তখন প্রতিরোধ করার

আর কোনও ক্ষমতাই থাকবে না। অর্কর ফ্ল্যাটে এর আগে এই ধরনের পরিস্থিতিতে অনেকবার আত্মসমর্পণ

করতে হয়েছে সাঁঝেলিকে। নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টায় হাত বাড়িয়ে ও আলোটা জ্বালিয়ে দিল। তার

পর বলল, 'কী বলেছে নন্দিনী?'

'কী বলেনি? আমাকে ভিলেন বানিয়ে দিয়েছে। সবার ধারণা, তোমার সঙ্গে আমার এমন কিছু

হয়েছে, যে কারণে তুমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছ। নন্দিনী তো বলল, তোর মতো প্লে বয় মার্কা

ছেলে কাউকে ভালোবাসতেই পারে না। পিপি-র জীবনটা তুই নষ্ট করে দিলি।'

'তুমি কী বললে?'

'কী আর বলব। নিজেকে অপরাধী ধরে নিয়ে কয়েকটা রাত জাগলাম। তখনই ভাবলাম, বেঁচে

থেকে কী লাভ? গোটা কুড়ি স্লিপিং পিলও কিনে এনেছিলাম। কিন্তু তখনই দাদুর কথা মনে পড়ল।

ভাবলাম, আর ক'টা দিন অপেক্ষা করি। সেই পিলগুলো আমি সঙ্গে নিয়ে ঘুরছি। দেখা যখন হয়েই

গেল, তখন তোমার মুখ থেকে আমি শুনতে চাই। আমি কি অপরাধ করেছি সোনা?'

অর্ক ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

এ সব কী বলছে? সুইসাইড করতে যাচ্ছিল? সত্যি? প্রেমে ব্যর্থ

হয়ে, এখনকার যুগে কেউ কারও জন্য সুইসাইড করে নাকি? অর্কর দিকে ও আর তাকিয়ে থাকতে

পারল না। মুখ নামিয়ে বলল, ' তোমার আর আমার রাস্তা আলাদা অর্ক। তুমিই তো দীপিকাদিকে একদিন বলেছিলে, সাংবাদিকতার সঙ্গে পশুপ্রেম মিলবে না। সেই কারণেই নিজেকে সরিয়ে নিলাম। গোবিন্দপুরে এই হসপিটাল ছেড়ে আমার পক্ষে অন্য কোথাও যাওয়া সম্ভব না।'

'এটা তোমার ফাইনাল ডিসিশন?'

'হ্যাঁ।'

'তা হলে আমার ডিসিশনটাও শুনে রাখ।

তোমাকে ছেড়ে থাকা আমার পক্ষে সম্ভব না। আজ থেকে আমিও এখানে থাকব।'

'কী বোকার মতো কথা বলছ? তোমার তো আজই লন্ডন যাওয়ার কথা। সামনে ব্রাইট কেরিয়ার। তুমি এখানে থাকবে কেন?'

'আমাকে কী ধরনের রিপোর্টার বলে মনে হয় সোনা? আমার সম্পর্কে ধারণাটা কি তোমার একটুও বদলায়নি?'

'কেন, এ কথা জিজ্ঞেস করছ কেন?'

'মনে আছে, অনেকদিন আগে আমার অফিসে ফোন করে আমি কী ধরনের রিপোর্টার, সেটা তুমি পরীক্ষা করেছিলে। তোমার সঙ্গে পরিচয়ের... সেটা ছিল দ্বিতীয় দিন। আজ শেষ দিন কী না, আমি বুঝতে পারছি না। আজ আমি জানতে চাইছি, আমার ভালোবাসাকে তোমার এতটা ঠুনকো বলে মনে হল কেন? তারও আগে আমি জানতে চাই, নিজেকে হঠাৎ সরিয়ে নিলে কেন?'

'বললাম তো। আমাকে তোমার যতটা দরকার, তার চেয়ে এই হসপিটালের অনেক বেশি দরকার আমাকে। জানই তো, আশিসদা নেই।'

'তুমি কিন্তু ঠিক বলছ না। আমি সব জেনে গেছি।'

'কী জেনে গেছ অর্ক?'

'তোমার সেই গায়েনোকোলজিস্ট বন্ধু জয়ন্তীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। ও সবকিছু আমায় বলে দিয়েছে। তারপর থেকে পাগলের মতো তোমায় খুঁজেছি।'

কথাগুলো বলতে বলতেই এক ঝটকায় ওকে বুকের কাছে টেনে নিল অর্ক। তারপর বলল, 'তুমি আসলে কী চেয়েছিলে সোনা? জানাজানি হয়ে গেলে আমার লন্ডনে যাওয়া আটকে যাবে? আমার ক্ষতি হবে? তাই পথের কাঁটা হতে চাওনি? বল, সত্যি কী না? এমন স্যাক্রিফাইস দেখানোর কোনও মানে আছে? তুমি ভাবলে কী করে, তোমাকে এই অবস্থায় ফেলে আমি নিজের

pathagar.net

কেরিয়ার গোছাতে লন্ডন যাব? ছিঃ।'

শেষ কথাটা এমনভাবে বলল অর্ক, শেল হয়ে বুকে বাঁধল সাঁঝেলির। অর্কর আলিঙ্গনে এমনিতেই ও দুর্বলবোধ করছিল, তার ওপর চোখটাও বিশ্বাসঘাতকতা শুরু করে দিল। চেষ্টা করেও সাঁঝেলি জলের ধারা আটকাতে পারল না। জয়ন্তীকে ও বারণ করেছিল। অর্ক চলে না-যাওয়া পর্যন্ত যেন ও কাউকে কিছু না বলে। কিন্তু জয়ন্তী কথা রাখল না। খবরটা যার কাছে বেশি আড়াল করতে চেয়েছিল, তাকেই জানিয়ে দিল। অভিমানে সাঁঝেলির আরও বেশি কান্না পেয়ে গেল। উত্তর দিতে গিয়ে হঠাৎই ও ফুঁপিয়ে ফঠল, 'একটা সামান্য মেয়ের জন্য এত বড় একটা সুযোগ কেন তুমি নষ্ট করবে অর্ক?'

আরও জোরে ওকে আঁকড়ে ধরে অর্ক বলল, ' কে বলল, তুমি সামান্য মেয়ে? আমার কাছে তুমি অসামান্য। তবে একেবার বোকা মেয়ে। তোমার সম্পর্কে প্রোজ্জ্বলদা ঠিকই বলত। বোকা না হলে ভালোবাসার মানুষকে কেউ এমন কষ্ট দিতে পারে? ভাগ্যিস নন্দিনী আমায় বলেছিল। শুভশ্রীদের বাড়িতে তোমাদের যেদিন পার্টি ছিল, সেদিন তুমি নাকি হঠাৎ ফোন পেয়ে পাম অ্যাভেনিউতে কারও বাড়িতে যাও। সেখানে নাকি তুমি

এমন কিছু শুনেছিলে, যাতে প্রচণ্ড আপসেট হয়ে পড়েছিলে। প্রথমে আমার মনে হয়েছিল, তুমি দীপিকাদির বাড়িতে গিয়েছিলে। কিন্তু ওখানে গিয়ে কথাবার্তা বলে বুঝতে পারলাম, তোমার আপ সেট হওয়ার কারণ দীপিকাদি নন। অন্য কেউ। বেশ কয়েকদিন পর, সাদার্ন অ্যাভেনিউর এক পেট্রোল পাম্পে, গাড়িতে তেল ভরতে

গিয়ে জয়ন্তীর সঙ্গে দেখা। তোমার কথা জিজ্ঞেস করতেই ও আমাকে বলল, সে কী, আপনি কি কিছুই জানেন না? পিপি-টা তো আশ্চর্য মেয়ে। জয়ন্তী তারপরই সব আমাকে বলে দেয়। তখনই জানলাম, ও পাম অ্যাভেনিউতে থাকে। তার মানে, শুভশ্রীর বাড়িতে ফোন পেয়ে সেদিন তুমি ওর বাড়িতেই গেছিলে। সেদিনই তুমি ইউরিন রিপোর্টটা পাও। আর জানতে পার, তোমার শরীরে আমার সন্তান জন্ম নিয়েছে। কেন তখনই আমাকে খবরটা জানালে না সোনা? এই বিশ্বাসটুকু আমার ওপর রাখতে পারলে না?' কথাগুলো বলতে বলতেই ওকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিল অর্ক। তারপর পরম যত্নে ডিভানের ওপর শুইয়ে দিয়ে, কপালে চুমু খেয়ে বলল, 'আজ রাতে এখানেই তোমাকে রেজিস্ট্রি বিয়ে করতে চাই সোনা। তারপর দু'জনে লেক গার্ডেন্সে গিয়ে আঙ্কল আর আন্টির আশীর্বাদ নেব। আর তুমি যদি কোনও রকম আপত্তি করে, তা হলে গলফ গ্রিনের ফ্ল্যাটে ফিরেই স্লিপিং পিলগুলো খেয়ে নেব। অ্যান্ড আই মিন ইট। তুমি কোনটা চাও, বল।' সিলিং থেকে ঝোলানো আলোটা চোখে লাগছে। চোখ বন্ধ করে উত্তর খুঁজতে লাগল সাঁঝেলি। ওই অবস্থাতেই টের পেল, অর্ক ওর চোখের জল মুছে দিচ্ছে। ওর মুখের কাছে অর্কর মুখ। গালে গরম নিঃশ্বাস, সারা গায়ে তীব্র শিহরণ অনুভব করল সাঁঝেলি। অর্কর শরীরের গন্ধটা ওকে পাগল করে দিল। পুরুষ হরিণের শরীরের গন্ধে আকৃষ্ট হয়ে বছরের বিশেষ একটা সময়ে যৌনতৃপ্তির জন্য ছুটে যায় হরিণী। আচ্ছা, মানুষেরও কি ফেরোমেন আছে? হয়তো আছে, না হলে অর্কর কাছে আত্মসমর্পণ করছে কেন সাঁঝেলি? অর্ক ওর

শরীরের ওপর উঠে এসেছে। সাঁঝেলি জানে, এর পর ঠোঁটে ভয়ঙ্কর চুমুর ঝড় নেমে আসবে। তার আগেই অর্কর ওই ভয়ঙ্কর প্রশ্নটার উত্তর দিয়ে ফেলা ভালো। চোখ না খুলেই ও বলল, 'জানি না, যাও।'

পুনশ্চ: খোলা মাঠে চাঁদোয়ার তলায় কনের সাজে বসে আছে সাঁঝেলি। অর্কর পাগলামি দেখছে। পারে বটে। রিপোর্টার তো, ওর পক্ষে সবই সম্ভব। ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে ম্যারেজ রেজিস্টার তো বটেই, অর্ক হাজির করেছে ওর সব বন্ধুকে। নন্দিনী, শুভশ্রী, মালবিকা, দেবযানী, দীপিকাদি সবাই হাজির।

বিয়েতে সাক্ষী হয়েছে নন্দিনী আর দীপিকাদি। সন্ধের সময় বিদিশাকে ডেকে অর্ক যখন বিয়ের কথাটা অ্যানাউন্স করে, তখনই অন্নপূর্ণা সামন্ত গড়িয়াহাট ছুটেছিলেন বেনারসী শাড়ি কিনে আনার জন্য। কনের সাজ সাজিয়েছেন দীপিকাদি। বাড়ি থেকে আসার সময় উনিই অর্কর জন্য কুর্তা-শেরওয়ানি কিনে এনেছেন। ওই পোশাকে অর্ককে একেবারে রাজপুত্রের মতো লাগছে।

সারা মাঠ জুড়ে রঙিন ছাতা। তার নীচে টেবল ঘিরে চারটে করে চেয়ার। সবাই হই হুল্লোড় করছে। হসপিটালের কেউ একজন রেকর্ডে শানাই বাজাতে শুরু করেছিল। পরে সাঁঝেলিই তাকে বারণ করে। পেশেন্টদের অসুবিধে হবে বলে। রাতের বেলায় ওরা বিশ্রাম নেয়। কোনও রকম আওয়াজ ওরা পছন্দ করে না। কিন্তু ওর কথা মানেনি অর্ক। লো ভল্যুমে মিউজিক চালু করে দিয়েছে। চাঁদোয়ার নীচে দশ বারো জন নাচছে। দীপিকাদিকে নাচতে দেখে খুব হাসি পাচ্ছে সাঁঝেলির। ভদ্রমহিলা পারেনও ছেলেমানুষি করতে

। অর্কর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নাচার ফাঁকে একবার ওকে টানতে এসেছিল শুভশ্রী। কিন্তু সাঁঝেলি যায়নি। নিজের শরীরের কথা ভেবে।

হসপিটালের দিকের মাঠে চাঁদের আলোর বন্যা বয়ে যাচ্ছে। আজ বোধহয় পূর্ণিমা। হঠাৎই ডান

দিকে ঘোড়ার আস্তাবলের দিকে চোখ গেল সাঁঝেলির। ও অবাক হয়ে দেখল, ফেন্সিংয়ের ধারে এসে ভিড় করেছে দশ বারোটা ঘোড়া। চাঁদের আলো ওদের পিঠ থেকে পিছলে পড়ছে। এই সময়টায় ওদের আস্তাবলের ভেতরে থাকার কথা। নাচ-গান শুনে কৌতূহলী হয়েই বোধহয় বেরিয়ে এসেছে। ওর বিয়ের সাক্ষী। কথাটা মনে হতেই আশিসদার মুখটা ভেসে উঠল সাঁঝেলির। বেঁচে থাকলে, আশিসদা ভাবতেও পারত না, ওর বিয়েটা এখানে হচ্ছে।

'কী রে বোন, ভেবেছিলি আমাকে ফাঁকি দিবি, নারে? দ্যাখ, আমি ঠিক খবর পেয়ে গেছি।'

দাদার গলা শুনে চমকে তাকাল সাঁঝেলি। আজ কালবেলায় কার মুখ দেখে ঘুম থেকে উঠেছিল কে জানে? সব কিছু যেন স্বপ্নের মতো ঘটে যাচ্ছে। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে ও বলল, 'তুমি এখানে? কার কাছে খবরটা পেলে?'

'কেন অর্ক। ওই তো সন্ধেবেলায় আমায় ফোন করে খবরটা দিল। তোর বউদিকেও সঙ্গে নিয়ে এসেছি। ও, তুই তো আবার লেটেস্ট হ্যাপেনিংগুলো কিচ্ছু জানিস না। তোর বউদির মাথা থেকে সিরিয়ালের ভূত নেমেছে। বোম্বে থেকে ও বালিগঞ্জে ফিরে এসেছে। শোন, মাকে আমি ফোন করেছিলাম। বাবাকে নিয়ে এল বলে।'

'বাবা আর মা কি আমার ওপর খুব রেগে আছে, দাদা?'

'দূর বোকা। তুই আগের মতো হাঁদাই রয়ে গেলি। রাগছিস কেন? তোকে সবাই ভালোবাসে। আরে, বাড়ি ছেড়ে তুই চলে আসার পর, ক'দিন আমাদের কী অবস্থা হয়েছিল, শুনলে তোর খারাপই লাগবে। তারপর তোর বন্ধু জয়ন্তীর কাছ থেকে সব জেনে অর্ক আমাকে সব খুলে বলল। ও তোকে কী রকম ভালোবাসে দ্যাখ। আমাকে বলল, দাদা লিলিকে ছেড়ে আমি লন্ডনে থাকতে পারব না। বিবিসি-র চাকরিটা, দাদা আমি নিচ্ছি না। আর সে কথা ও বিবিসি-কে জানিয়েও দিয়েছে। বোন, তোর কপালটা খুব ভালো রে। এমন ছেলেকে হ্যাজব্যান্ড হিসেবে পাচ্ছিস। যাক গে, এই নে কাগজপত্তর আর চাবি। রুবি হসপিটালের পেছনে আমার তৈরি একটা হাউসিং কমপ্লেক্স আছে। তার একট ডুপ্লেক্স ফ্ল্যাট অর্ক আর তোকে দেব বলে, এতদিন খালি রেখে দিয়েছিলাম। চার হাজার স্কোয়ার ফুটের, একেবারে ফার্নিশড। গোবিন্দপুর থেকে খুব কাছেই। তোকে আর গলফ গ্রিন থেকে আসতে হবে না।'

আনন্দে চোখে জল এসে গেল সাঁঝেলির। বউদির সঙ্গে কথা বলতে বলতে অর্ক সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। হঠাৎ কোত্থেকে উদয় হল শিউচরণ ওর বউকে নিয়ে। দু'জনেরই চোখমুখ ঝকঝক করছে। আরে, শিউচরণ খবর পেল কী করে? প্রশ্নটা সাঁঝেলি করার আগে শিউচরণ হাসিমুখে বলল, 'ছোট মুখে বড় কথা বলছি ম্যাডাম। সব হনুমানজির কিরপা। দুপুর বেলায় লকেটটা আপনাকে দিয়ে গেলাম। আর দেখুন, বিকাল বেলায় অর্ক স্যার এসে গেলেন।'

নিজের অজান্তেই গলায় ঝোলানো হনুমানজির লকেটটায় আঙুল ছোঁয়াল সাঁঝেলি। ভেবে রাখল, পরে মনে করে শিউচরণকে দুটো কথা জিজ্ঞেস করবে। এক, 'তোমার কাছে কি আর একটা বাড়তি লকেট আছে? থাকলে, সেটা প্লিজ অর্ক স্যারকে দিও।' দুই, 'মেহেন্দিপুরের সেই বালাজি মন্দিরে কীভাবে যাওয়া যাবে? তোমার

অর্ক স্যারকে নিয়ে যে সেখানে যেতে হবে।'